বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ
পৃথ্বীরাজ সেন

বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ

পৃথ্বীরাজ সেন

লাইব্রেরী
২২/সি কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

VAISHNABACHARYA RAMANUJ
A biography and spiritual doctrine of Ramanuj
by *Prithi Raj Sen*

প্রথম প্রকাশ :
শুভ জন্মাষ্টমী, ১৪২৫
সেপ্টেম্বর, ২০১৮

প্রকাশক :
শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ২২৪১—৫৪৬৮/৯৬৭৪৯২১৭৫৮
Website : www.girijalibrary.com
Email : info@girijalibrary.com

ISBN No. : 978-93-87194-34-2

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীসঞ্জয় মাইতি

বর্ণ সংস্থাপনায় :
বর্ণায়ন
২বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ :
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রা. লি.
কলকাতা-৭০০ ০১৬

উৎসর্গ

সারস্বত সমাজের শিরোমণি
শ্রদ্ধেয় সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন সহ
পৃথ্বীরাজ সেন

আমাদের প্রকাশনায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

- হাজার বছরের ভারতের সাধক-সাধিকা
- ভারতের ঋষি : জীবন ও সাধনা
- শিবপুরাণ
- অষ্টাদশ পুরাণ : কাহিনি সমগ্র
- উপনিষদ গল্পসমগ্র
- বাইবেল গল্পসমগ্র
- ভারততীর্থ সমগ্র
- সিদ্ধিদাতা গণেশ
- কৃষ্ণসাধিকা মীরাবাঈ
- বাংলার মাতৃসাধনা
- লালন ফকির : জীবন ও সাধনা
- ভগিনী নিবেদিতা : জীবন ও সাধনা
- জগদগুরু শঙ্করাচার্য : জীবন ও দর্শন
- মহিয়সী রানী অহল্যাবাঈ
- মহাত্মা কবীর : জীবন ও দোঁহাবলি

ভূমিকা

আজ থেকে ঠিক এক হাজার বছর আগে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের জন্ম হয়। ভগবান শ্রীরামানুজ সম্পর্কে আমরা খুব একটা অবগত নই। তার কারণ ওই মহাত্মার মতাবলম্বী এদেশে অতি বিরল। যাঁরা শ্রীরামানুজের পদানুবর্তী, তাঁদের শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। দাক্ষিণাত্যে তাঁদের প্রভাব সব থেকে বেশি। শ্রীরামানুজ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কী ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, তাঁর আগে এই ধর্মমতের কোনো প্রচলন ছিল কিনা, তাঁর প্রবর্তিত মতাবলম্বীদের শ্রীসম্প্রদায় কেন বলা হয়, ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতের সঙ্গে তাঁর দ্বৈতাদ্বৈত মতের ঐক্য আছে কিনা এসব তত্ত্ব আমরা খুব একটা জানি না। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, একবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী সভ্যতায় শ্রীরামানুজের মতো মহাত্মা পুরুষের জীবনকথা জেনে রাখা সকলেরই উচিত। বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম যখন ধ্বংসাত্মক বৈদ্যুতিন প্রভাবে পড়ে অকালে বিনষ্ট হচ্ছে তখন তাদের কাছে শ্রীরামানুজ এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বিবেচিত হতে পারেন।

শ্রীরামানুজ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মকে মহীয়ান করে তুলেছিলেন একথা অবশ্য স্বীকার্য। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। একেবারে ছোটোবেলা থেকেই রামানুজের মধ্যে অলৌকিক প্রতিভার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। অতি সহজে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষের উত্থাপিত যেকোনো বক্তব্যকে নস্যাৎ করতে পারতেন। অথচ কারো প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন না। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল তাঁর সবথেকে বড়ো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামানুজ সম্পর্কে আচার্য বিবেকানন্দ বিভিন্ন বক্তৃতার সময় নানা কথা বলেছেন। একথা স্বীকার করা উচিত যে তাঁরই আগ্রহ এবং প্রচেষ্টায় রামানুজ এবং তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈত মত অনেকের কাছে পৌঁছে গেছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাধনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ। তিনি আচার্য শ্রীরামানুজের জন্মভূমিতে দীর্ঘকাল বাস করেন। মূলগ্রন্থ ও সকলের সহায়তায় এই আচার্যের জীবন এবং দর্শন সম্বন্ধে আকরগ্রন্থ রচনা করেন। তাই আমরা যখনই শ্রীরামানুজ সম্পর্কে আলোচনা করি তখন শ্রীরামকৃষ্ণানন্দজির কথা আমাদের মনে পড়ে যায়।

এই বইটির মাধ্যমে আমি সেই পরম পুরুষ রামানুজের কর্মবহুল জীবনের নানা ঘটনাবলি সহজ—সরল ভাষায় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে তাঁর দর্শনের একটি রূপরেখা উত্থাপিত হয়েছে। এখানে আমি বিনীতভাবে একটি নিবেদন করতে চাই যে, আমি কোনো শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নই, আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে রামানুজকে কীভাবে দেখেছি তারই আনুপূর্বিক বিবরণ থাকল এই বইটির পাতায় পাতায়। সাধারণ পাঠক—পাঠিকার জন্যই এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা। তবে এই গ্রন্থটি পাঠ করে যদি তাঁরা রামানুজ বা তাঁর দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাহলে গ্রন্থকার হিসাবে নিজেকে কৃতার্থ এবং গৌরবান্বিত মনে করব।

ধন্যবাদান্তে,
পৃথ্বীরাজ সেন

শুভ জন্মাষ্টমী
১৪২৫ বঙ্গাব্দ

এক

এই গল্পের শুরু মাদ্রাজ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত শ্রীপেরামবুদুর গ্রামে। সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রামটির নাম শ্রীমহাভূতপুরী। গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই বেশি। এই গ্রামের সবথেকে বড়ো আকর্ষণ হল একটি রমণীয় বিষ্ণু মন্দির। সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন দেবতা পেরুমল। তিনি হলেন স্থল—জল—অন্তরীক্ষের রক্ষাকর্তা বিষ্ণু। বিষ্ণু সমস্ত গ্রামবাসীর প্রতি তাঁর করুণা প্রদর্শন করছেন। গ্রামবাসীরা পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বিষ্ণুর উপাসনা করে থাকেন। এই গ্রামের প্রায় সকলেই বিষ্ণুভক্ত।

মন্দির প্রাঙ্গণের অপরদিকে আছে এক দেবগৃহ। সেখানে উপবিষ্ট আছেন বেদান্ত কমল ভাস্কর, ভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য। তিনি সেবক রাজের আসন গ্রহণ করেছেন। সামনে আছে একটি বিশাল দীঘি। এর নৈসর্গিক শোভা সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে। এই স্থানে আছে নানা গাছপালা। সারাদিন সেখানে শোনা যায় পাখিদের কলকাকলি। কোথাও ফুটে ওঠে নানা পুষ্প। তাদের শোভা দেখে মন আনন্দে প্লাবিত হয়। এই মন্দির প্রাঙ্গণে এলে মনে হয় আমরা বুঝি পৃথিবীর সীমারেখা পার হয়ে ইপ্সিত স্বর্গে পৌঁছে গেছি। গ্রামবাসীরা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে দিনে অন্তত একবার এই মন্দির প্রাঙ্গণে আসেন। এখানকার সুস্নাত পরিবেশের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত করেন। আর এভাবেই দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত দুঃখ—জ্বালাযন্ত্রণা ভুলে যাবার চেষ্টা করেন।

আজ থেকে হাজার বছর আগে কেশবাচার্য নামে এক সৎ ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করতেন। সেই সময় যামুনাচার্য রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করে নম্বির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাস করতেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে। তিনি স্বইচ্ছায় ভিক্ষুকের পেশা গ্রহণ করেছিলেন। গুরুর মৃত্যুর পর যামুনাচার্য সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলীর অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, নম্রতা এবং বৈদগ্ধ সকল বৈষ্ণবের কাছে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। তিনি অসংখ্য শ্লোক এবং স্তোত্র রচনা করেছেন। তাঁর শিষ্য এবং ভক্তমণ্ডলী এই স্তোত্রগুলি কণ্ঠস্থ করতেন। মাঝেমধ্যে তিনি তাঁর মন্দ্রিত কণ্ঠস্বরে এই স্তোত্রগুলি উচ্চারণ করতেন। তখন চারপাশে এক স্বর্গীয় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হত।

মহাত্মা যামুনাচার্য জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে এমন এক পরিবেশ এবং পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন যা সকলের সর্বত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাঁর খ্যাতি দশদিকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বৈষ্ণবগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেদের পরম ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। তাঁর কোনো কোনো শিষ্য তাঁরই মতো মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। আবার অনেকে গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করা সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা বজায় রেখেছিলেন।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যামুনাচার্যকে কেন্দ্র করে ওই অঞ্চলে একটি ভক্তিকেন্দ্রিক ভাবধারার শুভ সূচনা হয়। এই যামুনাচার্য তামিল ভাষা এবং সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এক—একটি স্তোত্র—র মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ভাবনা লুকিয়ে আছে তা বিস্ময়কর। জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন যামুনাচার্য। কীভাবে আমরা এই দুঃখ—জ্বালা—যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে আরো সুন্দর এবং সুস্নাত করে তুলব, সেই বিষয় নিয়ে যামুনাচার্য যথেষ্ট গবেষণা করেন। তাঁর উদ্দেশ ছিল পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেন সৎ, শোভন, সুন্দর পথে বিচরণ করতে পারে। পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীতে নানা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোক আমাদের হৃদয়—আকাশকে ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন করে। প্রেমে ব্যর্থতা মনকে বিহ্বল করে দেয়। উচ্চাশা নামের এক সোনার হরিণকে অনুসরণ করে আমরা ছুটে যাই। শেষ পর্যন্ত আমাদের দিন কাটে হতাশার ঘন অন্ধকারে। যামুনাচার্য চেয়েছিলেন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেন এইসব অন্ধকার মুহূর্তগুলিকে পরিত্যাগ করতে পারে। জাগতিক বিষয় সমূহের প্রতি চরম নির্লিপ্তি প্রদর্শন করতে না পারলে আমরা আসল সুখের সন্ধান করতে পারব না। আমাদের সৌভাগ্য যামুনাচার্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিদগ্ধ জনমণ্ডলী এই বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যামুনাচার্যের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন পেরিয়া তিবু মাল্লাই নম্বি। তিনি যামুনাচার্যের সংস্পর্শে এসে নতুন এক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর দুই বোন—ভূদেবী বা কান্তিমতী এবং মহাদেবী বা কৃতিমতী।

পেরামবুদুর নিবাসী কেশবাচার্য কান্তিমতীকে বিবাহ করেছিলেন। কনিষ্ঠা মহাদেবীর সঙ্গে আহরম গ্রাম নিবাসী কমলনয়ন ভট্টের বিবাহ হয়। দুই বোনের বিবাহের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর শৈলপূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হন। অবশেষে মহাত্মা যামুনাচার্যের মতো এক সৎগুরুর সন্ধান পান। বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর সান্নিধ্যে পরম আনন্দে কালাতিপাত করতে থাকেন।

কেশবাচার্য ছিলেন এক যজ্ঞনিষ্ঠ ব্যক্তি। পণ্ডিতগণ তাঁকে 'সর্বক্রতু' উপাধি দিয়েছিলেন। বিয়ের পর অনেকদিন এই দম্পতি পেরামবুদুর গ্রামে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকলেন। স্বামী—স্ত্রী ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। তাঁরা কোনো জাগতিক বিষয়ের প্রতি অযথা লোভ—লালসা প্রদর্শন করতেন না। তাঁদের জীবনে কোনো দুঃখ—কষ্ট, জ্বালা—যন্ত্রণা ছিল না। কিন্তু দীর্ঘকাল দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও কোনো সন্তান না হওয়ায় ভক্ত কেশবাচার্য কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমনা হলেন। পরিশেষে যজ্ঞদ্বারা শ্রীভগবানকে তুষ্ট করার বাসনা জাগল তাঁর মনে। তিনি ভেবেছিলেন এইভাবে হয়তো ঈপ্সিত পুত্রসন্তান লাভ করতে পারবেন।

কেশবাচার্য যথেষ্ট নিষ্ঠা সহকারে যজ্ঞ সমাপন করলেন। সেদিন নিশাকালে নিদ্রিত অবস্থায় তিনি পার্থসারথিকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নে স্বয়ং ভগবান তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—হে সর্বজ্ঞ, আমি তোমার সদাচার, নিষ্ঠা এবং ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়েছি। তোমার মনোগত বেদনা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমি অনতিবিলম্বে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব। আমি জানি মানুষের মধ্যে এখন দুর্বুদ্ধি জেগেছে। মানুষ আত্ম—অহংকারী হয়ে উঠেছে। আর এভাবে অনেকে অনেক কুকর্ম করছে। অথচ মানুষ অমৃতের পুত্র। এই সরল সত্য সে ভুলে গেছে। আমি তাই তোমার পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

স্বপ্ন ভেঙে গেল। তখন মধ্যরাত। সুসুপ্তি মগ্ন মহাপৃথিবী। কেশবাচার্যের মন অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপ্লাবিত হল। তিনি পত্নীকে সব কথা খুলে বললেন। এবার শুরু হল দিন গোনার পালা।

এই অলৌকিক ঘটনার ঠিক এক বছর পর ভাগ্যবতী কান্তিমতী সর্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। ১০১৭ সালে চৈত্র মাসের দ্বাদশ দিবসে সেই পুত্র সন্তান পৃথিবীর আলো দেখেন। তিনিই হলেন ভগবান শ্রীরামানুজাচার্য। জন্মমুহূর্তে মনে হয়েছিল তিনি বোধহয় এক তরুণ তপন। তাঁর আগমনে চারপাশের অন্ধকার দূরীভূত হল। পণ্ডিতরা তাঁকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি এক বিদগ্ধ সাধক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

এই সময় ছোটোবোন মহাদেবীও এক পুত্ররত্ন প্রসব করেন। কিছুদিন বাদে তিনি তাঁর নবজাত পুত্রকে নিয়ে গেলেন বড়ো বোন কান্তিমতীর কাছে। বোনেরা একে অন্যকে আলিঙ্গন করে আনন্দিতা হলেন। ইতিমধ্যে লোকমুখে বার্তা পেয়ে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র থেকে বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ ভাগ্নেদের দর্শন করার জন্য শ্রীপেরামবুদুরে উপনীত হলেন। অনেকদিন পরে দাদাকে দেখতে পেয়ে কান্তিমতী এবং মহাদেবী পরম আনন্দ লাভ করলেন। সর্ব—সুলক্ষণ যুক্ত দুই শিশুকে দেখে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পরম প্রীত হলেন। কান্তিমতীর পুত্রের নানা দৈব লক্ষণ দর্শন করলেন তিনি। এইসময় শ্রীপেরামবুদুরে অবস্থিত আদি শেষাবতারের কথা তাঁর মনে এল। বৃহৎ পদ্মপুরাণের বত্রিশতম অধ্যায়ে, নারদপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের তেইশতম অধ্যায়ে ও বৃহৎ ভাগবতের এক হাজারতম স্তোত্রে কলিযুগে এক অনন্ত দেবতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন যে, এই শিশুই হলেন ওই লক্ষ্মণাবতার। তাই তিনি এই শিশুর নাম রাখলেন শ্রীরামানুজ। মহাদেবীর পুত্রের নামকরণ করা হল গোবিন্দ। পরবর্তীকালে মহাদেবী আর—একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'ছোটো গোবিন্দ'।

আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির বন্দনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, চৈত্র মাসে লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন। রামানুজ আচার্যের জন্মমাস এবং রাশি সুমিত্রানন্দনদ্বয়ের তুল্য। তাই আমরা

অনায়াসে বলতে পারি যে, রামানুজ ঈশ্বরের এক অবতার হিসাবেই এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন।

দেখতে দেখতে দিন কাটতে থাকে। শিশুরা তখন চার মাসের। মায়েদের কোলে চড়ে গ্রাম—গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। যথাসময়ে তাদের অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন কর্ম সুসম্পন্ন হল। একেবারে ছোটোবেলা থেকেই রামানুজ অসামান্য ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি হয়ে উঠলেন এক স্মৃতিধর মানুষ। গুরুর মুখনিঃসৃত যেকোনো অমৃতবাণী একবার শুনেই তা মনে রাখতে পারতেন। শুধু তাই নয়, যেকোনো দুরূহ পাঠের অর্থ বের করতেও পারতেন। তাই সমস্ত শিক্ষক এবং অধ্যাপক তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

ধর্মের প্রতি এক সহজাত আকাঙ্ক্ষা ছিল রামানুজের। সুযোগ পেলেই তিনি সাধুসঙ্গ করতেন। সমবয়সি বালকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগসূত্র ছিল না। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি বুঝি এক ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ।

এই সময় শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ নামে এক পরম ভাগবত বাস করতেন কাঞ্চীনগরীতে। তিনি কাঞ্চী থেকে দেবপূজার জন্য পূজামেলী গ্রামে প্রতিদিন গমন করতেন। শ্রীপেরামবুদুর ওই দুই গ্রামের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। তাই তাঁকে প্রতিদিন রামানুজের বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হত। তিনি ছিলেন জাতিতে শূদ্র। কিন্তু তাঁর প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ দেখে ব্রাহ্মণগণও তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন।

একদিন রামানুজ অধ্যাপক গৃহ থেকে বের হয়ে এসে ওই মহাত্মা পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেই পণ্ডিত ব্যক্তির মুখমণ্ডল থেকে উদ্ভাসিত জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর মধ্যে এক অলৌকিক শক্তি লুকিয়ে আছে। রামানুজ অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁকে আবেদন করলেন যে তিনি যেন সেই রাতে রামানুজের গৃহে ভিক্ষা করেন।

শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ এই বালকের দিব্যকান্তি ও ভগবৎ লক্ষণ দেখে তার আহ্বান অস্বীকার করতে পারলেন না। পরম ভাগবতকে অতিথি হিসাবে পেয়ে রামানুজের আনন্দের আর সীমা থাকল না। তিনি তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণ ভিক্ষা দান করলেন। এমনকি তাঁর পদসেবা করারও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রামানুজের করা পদসেবা নিতে অতিথি অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন— 'আমি নীচ, জাতিতে শূদ্র। আপনি ব্রাহ্মণ এবং পরম বৈষ্ণব। কোথায় আমি আপনার পদসেবা করব, তা না হয়ে আপনি কিনা দাসের সেবা করতে চাইছেন?'

শ্রীরামানুজ এই কথা শুনে দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কপাল মন্দ, তাই আপনার মতো এক মহাপুরুষের সেবার অধিকার পেলাম না। উপবীত ধারণ করলেই কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? যিনি হরিভক্তি পরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দেখুন তিরুপ্পান আলোয়ার চণ্ডাল হয়েও ব্রাহ্মণের পূজ্য হয়েছেন।'

শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ বুঝতে পারলেন যে, এই বালক হলেন এক ছদ্মবেশী ঈশ্বর। এরপর তাঁরা নানা ধরনের আলোচনায় মগ্ন হলেন। সেই রাতে তিনি রামানুজের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। সেইদিন থেকে একে অন্যকে অলৌকিক সখ্যের বাঁধনে বেঁধে ফেলেন।

বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গ রামানুজের সঙ্গে লক্ষ্মণের চারিত্রিক সাদৃশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যা আমাদের একেবারে অবাক করে দেয়। লক্ষ্মণের কর্তব্যপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, রামভক্তির একনিষ্ঠতা এবং কর্মপরায়ণতা অতুলনীয়। তিনি তাঁর হৃদয় সিংহাসনে রামচন্দ্রকে এক ঈশ্বর হিসাবে স্থাপন করেছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর ধ্যান—জ্ঞান সাধনায় আসীন ছিলেন। সদা সর্বদা তিনি তাঁর মনের দর্পণে প্রিয় দাদা রামচন্দ্রের মুখচ্ছবি দর্শন করতেন। তাই লক্ষ্মণ যা কিছু লোভ—লালসাকে পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন। রামায়ণের পাতায় পাতায় তাঁর এই পবিত্র চরিত্রের নানা গল্প লিপিবদ্ধ হয়েছে। যখন মায়াময় স্বর্ণমৃগ জনক নন্দিনীকে মোহিত করেছিল, এমনকি সর্বকল্যাণ গুণ সমন্বিত শ্রীরামচন্দ্রকেও বিমোহিত করেছিল, তখন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ বলেছিলেন, হে পুরুষ ব্যাঘ্র, আমার মনে হয় এই মৃগ রাক্ষস মারীচ ছাড়া আর কেউ নয়। রাজারা যখন

অরণ্য অভ্যন্তরে মৃগয়া করতে যায়, তখন এই পাপরূপী নিশাচর নানা রূপ ধারণ করে তাদের প্রলোভিত করে। এই যে মায়ামৃগ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এটা সেই মায়াবীর মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। হে রামচন্দ্র, আপনি অবগত আছেন যে, পৃথিবীতে এমন স্বর্ণপ্রভা বিশিষ্ট মৃগ কখনো দেখা যায় না। তাই এটি যে মায়া তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মণের মুখনিঃসৃত এই শব্দাবলি শ্রবণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি কত প্রাজ্ঞ এবং বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। রাবণ বধের পর দেবগণের সঙ্গে পিতা দশরথ এসে তাঁকে আশীর্বাদ এবং প্রশংসা করেছিলেন। দশরথ বলেছিলেন—হে বৎস, তুমি বৈদেহী সীতার সঙ্গে এই রামচন্দ্রের সেবা করেছ। এর ফলে তুমি ধর্ম এবং যশ উভয়ই প্রাপ্ত হয়েছ।

এর পাশাপাশি যদি আমরা রামানুজের চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ ছিল শ্রীযুক্ত নারায়ণের সেবা। যখন তামসিক প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে অহংকারে মদমত্ত সমাজপতিরা নানা ধরনের বিভাজন এনেছিলেন, যখন তথাকথিত শূদ্র সমাজকে দেবালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত না, তখন রামানুজ বিষ্ণুর প্রতি তাঁর অকৃপণ শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। তিনি জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে নারায়ণের অঙ্কে শ্রী—কে উপবিষ্ট করিয়েছিলেন। তাঁর এই সাধনার ফলে শ্রীহীন ভারতে আবার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিকাশ হয়। শ্রী—র সঙ্গে রামায়ণের নিত্য সম্বন্ধ প্রমাণ করে তিনি আদি কবি বাল্মীকির অভিপ্রায়কেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আদি কবি বলেছিলেন—হে ঈশ্বর, ধর্ম এবং শ্রী তোমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রামানুজ চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারব যে তিনি লক্ষ্মণের সার্থক উত্তরসাধক হিসাবে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের আগমনের মধ্যে কয়েক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু পূর্বসূরির সমস্ত চারিত্রিক গরিমা এবং বৈশিষ্ট্যকে রামানুজ আত্মস্থ করেন।

দুই

দেখতে দেখতে রামানুজের বয়স হল ষোল। কেশবাচার্য ভাবলেন এবার পুত্রকে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র দিতে হবে। তখনকার দিনে এই বয়সেই ছেলেদের বিয়ে দেবার রীতি ছিল। তিনি এক সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার সন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে শুভদিনে, শুভলগ্নে রামানুজের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হল। নববধূর নাম জমাম্বা। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে পিতামাতা, আত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলেন। দীন দরিদ্রগণ প্রচুর আহার পেয়ে অতি আনন্দিত হলেন। এক সপ্তাহ ধরে আনন্দ অনুষ্ঠান চলতে লাগল। নববধূর মুখ দর্শন করে দেবী কান্তিমতী এবং কেশবাচার্য পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

এইভাবে একমাস অতিবাহিত হল। রামানুজ তাঁর নব বিবাহিতা বধূর সঙ্গে সুখে, শান্তিতে, আনন্দে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুখ এবং দুঃখ হল একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। অবশেষে রামানুজের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল ঘন কালো মেঘ। পিতা বৃদ্ধ কেশবাচার্য সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর মানবলীলা সাঙ্গ করলেন। আনন্দের মুহূর্তগুলি যেন কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কান্তিমতী পতিশোকে হলেন অধীরা। আত্মীয়দের সহযোগিতায় রামানুজ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন। যথাসময়ে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পন্ন হল।

পিতাহীন রামানুজও বেশ কিছুদিন শোকে অধীর হয়ে রইলেন। তিনি প্রজ্ঞাবলে ধীরে ধীরে নিজেকে শোক—সন্তপ্ত অবস্থা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেন। বাইরে শোকের প্রকাশ করলেন না। স্থির চিত্তে জননীকেও সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

এরপর বেশ কিছুদিন রামানুজ শ্রীপেরামবুদুরেই অবস্থান করলেন। কিন্তু এই পিতৃস্মৃতি বিজড়িত স্থানে তিনি এবং তাঁর জননী কোনোমতেই শান্তিতে থাকতে পারলেন না। ফলে তাঁরা স্থান ত্যাগ করে কাঞ্চীপুরে চলে যাওয়াই মনস্থ করলেন। রামানুজ এরপর কাঞ্চীপুরে একটি আবাসবাটী তৈরি করলেন। সেখানে গিয়ে

সপরিবারে বসবাস করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল। আমরা জানি সময়ই সবকিছুর জ্বালা—যন্ত্রণার উপশম করে দেয়। শোকাবেগ শান্ত হল।

এই সময় কাঞ্চী নগরীতে যাদবপ্রকাশ নামে এক সুবিখ্যাত অধ্যাপক বসবাস করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রামানুজকে তাঁর শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন। নব শিষ্যের রূপলাবণ্য এবং তার মুখমণ্ডলে প্রতিভার ছটা দেখে যাদবপ্রকাশ খুবই খুশি হয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রামানুজ তাঁর প্রধান শিষ্য হিসাবে মর্যাদা লাভ করলেন। রামানুজও এই গুরুকে লাভ করে খুবই খুশি হয়েছিলেন। সর্বশাস্ত্রে গুরুর অনায়াস সাধ্যতা তাঁকে খুবই বিমোহিত করল। সময় এবং সুযোগ পেলেই গুরু ও শিষ্য যেকোনো বিষয় নিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় করতেন। তবে রামানুজ কিন্তু যাদবপ্রকাশের সমস্ত ভাবকে মানতে পারেননি। রামানুজ ছিলেন তাত্ত্বিক মননের অধিকারী। মাঝে মাঝে গুরুর সঙ্গে তর্ক—বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেন। এই বিষয়টি যাদবপ্রকাশ পছন্দ করতে পারতেন না। তাঁর অন্য শিষ্যরা তাঁকে ভগবান জ্ঞানে সেবাযত্ন করতেন। অথচ রামানুজ কিনা এভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছে! এর ফলে রামানুজের প্রতি তাঁর মনে বৈরী ভাবের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে তা থেকেই নানা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতে থাকে।

যাদবপ্রসাদ নানা ধরনের তথ্য উত্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। ঈশ্বরের সাকার রূপটি স্বীকার করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সর্বশক্তিমান এক মহাত্মা বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছেন। তিনি হলেন সৎ—চিত—আনন্দ ঘন সত্তা। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্যের মতো তিনি বিরাটকে মায়া বা রজ্জুতে সর্প এমন কথা বলতেন না। জগৎ তাঁর কাছে অলীক বলে প্রতিভাত হত না। তিনি বিশ্বাস করতেন জগৎ হল ঈশ্বরের স্বরূপ যা নিত্য পরিবর্তনশীল।

রামানুজকে আমরা এই জাতীয় মতবাদের ধারক বা বাহক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। তাই যাদবীয় সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করলেন না। তবে গুরুর গৌরব রক্ষা করার জন্য তিনি কখনোই বিরুদ্ধাচরণ করতেন না।

একদিন পাঠ পরিসমাপ্তির পর শিষ্যরা দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে ব্যস্ত ছিলেন, যাদবপ্রকাশ রামানুজকে তাঁর অঙ্গে তৈলমর্দন করতে আদেশ দিলেন। তখন এক শিষ্য একটি বিষয়ে জানার জন্য গুরুকে প্রশ্ন করলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠখণ্ডের সপ্তম মন্ত্রে একটি বাক্য আছে। সেই বাক্যটির অর্থ ওই শিষ্য বুঝতে পারছেন না। যাদব শঙ্করাচার্যের অর্থানুসারে বাক্যের অর্থ নিরূপণ করলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা শুনে রামানুজের চোখ থেকে অশ্রু যাদবের উরুদেশে পতিত হল। জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য এই অশ্রুধারার স্পর্শে যাদব ওপরদিকে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এই অশ্রু হল প্রিয় শিষ্য রামানুজের চোখের জল।

তিনি সবিস্ময়ে প্রিয়তম শিষ্যকে দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন। রামনুজ বললেন—'হে ভগবন, আপনার মতো এক মহানুভবের কাছ থেকে এই বিষাদী ব্যাখ্যা শুনে আমি মর্মাহত হয়েছি। সর্বকল্যাণ গুণসম্পন্ন সচ্চিদাময় বিগ্রহ ভগবানের সঙ্গে বানরের তুলনা করা কতদূর অসম্ভব ও পাপজনক তা কি আপনি জানেন না? আপনি এক প্রাজ্ঞ মহাপুরুষ, আপনি কেন এমন বিকৃত অর্থ বলছেন?'

যাদবপ্রকাশ ভাবতেও পারেননি যে এভাবে রামানুজ তাঁকে সরাসরি আক্রমণ করবেন। তিনি বললেন, 'বৎস, তোমার অহংকারে আমি মর্মাহত হলাম। তুমি কি এই বিষয়টির উত্তম ব্যাখ্যা দিতে পারবে?'

রামানুজ বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে সবই সম্ভব।'

যাদবপ্রকাশ হয়তো ভেবেছিলেন যে রামানুজ বোধহয় এই শব্দবন্ধের ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। তাই তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার নতুন অর্থ তুমি বলো, আমি শুনব, তুমি দেখছি শঙ্করাচার্যের ওপর উঠতে চাও।'

বিনীতভাবে রামানুজ আবার বললেন, 'ভগবান, আপনার আশীর্বাদে সবই সম্ভব হতে পারে।' শেষ পর্যন্ত তিনি ওই শব্দবন্ধের অন্য একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। ওই ব্যাখ্যা শুনে যাদব অবাক হয়ে যান। যাদব স্বীকার করেছিলেন যে, রামানুজের মধ্যে এক অলৌকিক পাণ্ডিত্য লুকিয়ে আছে।

এই ঘটনার পর থেকে যাদবপ্রকাশ রামানুজকে দ্বৈতবাদী ভক্ত বলে স্বীকার করলেন। তাঁদের মধ্যে তখন থেকেই নানা বিতর্কের সূত্রপাত হয়। রামানুজ সদাসর্বদা যাদবপ্রকাশের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতেন। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে যাদবপ্রকাশ তাঁর এই তরুণ শিষ্যের জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারতেন না।

একদিন তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি অংশের ব্যাখ্যা যাদবপ্রকাশ দিচ্ছিলেন। তিনি ব্রহ্মকে সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ বলে উল্লেখ করলেন। রামানুজ এই কথার প্রতিবাদ করে বললেন, ব্রহ্ম সত্যধর্ম বিশিষ্ট, তিনি অসত্যধর্ম বিশিষ্ট নন। জ্ঞানই তাঁর ধর্ম, অজ্ঞান নন, তিনি অনন্ত। তিনি সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত গুণের অধিকারী। এই গুণগুলিকে তাঁর স্বরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এগুলি তাঁর, কিন্তু তিনি নন। যেমন এই দেহ আমার, আমি দেহ নই।

এই ব্যাখ্যা শুনে অধ্যাপক খুবই রেগে গেলেন। তিনি সরোষে বললেন, 'ওহে ধৃষ্ট বালক, তুমি যদি আমার ব্যাখ্যা শুনতে না চাও, তাহলে কেন এখানে আসো? তুমি বাড়ি গিয়ে নতুন টোল খুলে ফেলো।'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তিনি আবার বললেন, 'তোমার ব্যাখ্যা আচার্য শঙ্করের মতানুযায়ী নয়, অন্য কোনো গুরুরও মতানুযায়ী নয়। তাই এর পরে আর আমার সামনে এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ কোর না।'

রামানুজ স্বভাবতই নম্র প্রকৃতির ছিলেন। তিনি সর্বজনসমক্ষে কখনো তাঁর গুরুকে অপমান করতে চাননি। পাঠ অভ্যাসকালে মৌনাবলম্বনের চেষ্টাই করতেন। প্রতিবাদ করা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু যখন বুঝতে পারতেন যে অধ্যাপকের ব্যাখ্যায় সত্যের অপলাপ হচ্ছে, তখন তার প্রতিবাদ করতেই হত। যাদবপ্রকাশ তাঁর প্রতিবাদগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে রামানুজের ওপর তাঁর এক ধরনের ভয় জন্মালো। তিনি ভাবলেন হয়তো এই বালক এককালে অদ্বৈত মত খণ্ডন করে দ্বৈত মত স্থাপন করবে। এর হাত থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়? সনাতন অদ্বৈতবাদ রক্ষার জন্য একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তিনি যে অদ্বৈত মতের প্রতি প্রীতিবশত এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা নয়, প্রবল ঈর্ষাই তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল।

যাদবপ্রকাশের এই আচরণকে আমরা কখনোই সমর্থন করতে পারি না। তখন থেকে যাদবপ্রকাশ এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করলেন। তাঁর অভিপ্রায় হল যে করে হোক রামানুজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

ধীরে ধীরে রামানুজের জনপ্রিয়তা কাঞ্চীপুরে পরিব্যাপ্ত হল। রামানুজ কিন্তু কখনো প্রচারের আলোয় আসতে চাননি। এমনকি তখনো তিনি যাদবপ্রকাশকে তাঁর গুরু হিসাবে সম্মান প্রদর্শন করে চলতেন।

একদিন যাদবপ্রকাশ তাঁর অন্য শিষ্যদের ডাকলেন। তিনি বললেন, ''দ্যাখো, তোমরা সকলে আমার ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের কোনো দোষ খুঁজে পাও না। কিন্তু ওই ধৃষ্ট রামানুজ যখন—তখন আমার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে। সে বুদ্ধিমান এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, কিন্তু তার মন দ্বৈত পাষণ্ডতায় পরিপূর্ণ। তার হাত থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তোমরাই তা আমাকে জানাও।'

একজন শিষ্য বলল, তাকে এখানে না আসতে দিলেই হয়। একজন প্রতিবাদ করে বলল, তাহলে রামানুজ এক টোল খুলে দ্বৈতবাদ প্রচার করবে। এর মধ্যেই সে এক সুবিস্তৃত টীকা লিখেছে। এই টীকার মাধ্যমে সে অদ্বৈতমতকে খণ্ডন করেছে।

রামানুজ সেইসময় সত্যি সত্যি এক বিশাল ভাষ্য রচনা করে বিদগ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এইভাবেই কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলল। অবশেষে সকলে এক ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিল যে, রামানুজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই হীন কাজ কীভাবে করা হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিল।

রামানুজকে অজ্ঞাতসারে হত্যা করা খুব একটা সহজ নয়। এই ব্যাপারে মন্ত্রণা চলতে লাগল। শেষপর্যন্ত যাদবপ্রকাশ বললেন, ''চল, আমরা সকলে কলুষবিনাশিনী গঙ্গায় অবগাহন করে সমস্ত মালিন্য দূর করার জন্য তীর্থযাত্রা করি। তোমরা রামানুজের কাছে গিয়ে আমার এই অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করো। যাতে সে আমাদের

সঙ্গে আসে সে বিষয়ে যত্নবান হও। কারণ তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ হল ওই পাষণ্ডের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। পথে চলতে চলতে তাকে হত্যা করে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের হাত থেকে সকলে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারব। আর এইভাবেই দ্বৈতবাদের কণ্ঠকেও উৎপাটিত করা সম্ভব হবে।

শিষ্যেরা গুরুর এই পরিকল্পনা শুনে খুবই খুশি হল। তারা রামানুজের কাছে গিয়ে ভাগীরথী স্নানের প্রলোভন দেখাতে লাগল।

আমরা আগেই জানিয়েছি যে, রামানুজের মাসতুতো ভাই ছিলেন গোবিন্দ। তিনি রামানুজকে খুবই ভালোবাসতেন। শ্রীপেরামবুদুর পরিত্যাগ করে আচার্য পরিবার যখন কাঞ্চীপুরে চলে আসেন, তখন গোবিন্দ সেখানে আসেন। তিনি রামানুজ পরিবারের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। রামানুজ এবং গোবিন্দ ছিলেন সমবয়সি। তাঁদের মানসিক পরিকাঠামোর মধ্যেও ছিল অনেক সাদৃশ্য। তাঁরা উভয়ই জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্লিপ্তি প্রদর্শন করতেন। গোবিন্দও যাদবপ্রকাশের শিষ্য হলেন। তাঁরা একসঙ্গে অধ্যয়ন মণ্ডপে প্রবেশ করতেন। পাঠ অভ্যাস করে বাড়িতে ফিরে আসতেন। অবশেষে রামানুজ ভাগীরথী স্নানে সম্মত হলেন। গোবিন্দ এই তীর্থযাত্রায় রামানুজের সঙ্গী হলেন।

রামানুজ তাঁর তীর্থযাত্রার কথা মায়ের কাছে ঘোষণা করলেন। কান্তিমতী ছিলেন এক অতি ধর্মশীলা মহিলা। রামানুজকে তিনি নিজের প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। পুত্রবিরহ অসহ্য হলেও কান্তিমতী পুত্রের এই সৎকর্ম অনুষ্ঠানে বাধা দেননি। অবশেষে শুভদিনে শুভক্ষণে যাদবপ্রকাশ তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে নিয়ে তীর্থ দর্শনে এগিয়ে চললেন। তাঁদের দক্ষিণদেশ থেকে আর্যাবর্ত অভিমুখে যেতে হবে। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হত। পথে নানারকম ভয় ছিল। কোথাও দস্যুরা দল বেঁধে অপেক্ষা করত। অসহায় তীর্থযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাদের অনেককে শারীরিকভাবে আঘাত করত। যা কিছু টাকা পয়সা কাছে থাকত তা সবই লুণ্ঠন করে চলে যেত। এছাড়া গভীর অরণ্যে হিংস্র জন্তুর বসবাস। কত তীর্থযাত্রীই জন্তু জানোয়ারদের আক্রমণে প্রাণ দিয়েছেন। সব বাধা অতিক্রম করে যাদবপ্রকাশ এবং তাঁর শিষ্যরা এগিয়ে চললেন।

কিছুদিন পরে তাঁরা বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের কাছে ওণ্ডারণ্যে পৌঁছলেন। এখানে মানুষজনের বসবাস নেই বললেই চলে। যাদবপ্রকাশ বুঝতে পারলেন যে এখানেই রামানুজকে হত্যা করতে হবে। তাহলে আর ধরা পড়ার কোনো ভয় থাকবে না। তিনি তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্যদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে শুরু করলেন। যাদবপ্রকাশ আর এক মুহূর্তও দেরি করতে চাইছেন না। পরবর্তীকালে হয়তো তিনি আর এমন সুযোগ পাবেন না।

গোবিন্দ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিলেন। অথচ সরল প্রকৃতির রামানুজ এই বিষয়ে কিছুই জানতে পারেননি। তাঁর মন ছিল বিশুদ্ধ এবং নির্মল। তিনি জ্ঞানত কখনো কারো সম্বন্ধে খারাপ চিন্তা করতে পারতেন না।

একদিন রামানুজ এবং গোবিন্দ পথের পাশে এক সরোবরে গেলেন। এই সময় রামানুজকে একা পেয়ে যাদবপ্রকাশের ওই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা বললেন। গোবিন্দ বললেন—এই দুর্বৃত্তরা এই নির্জন অরণ্যে তোমাকে বধ করবে। তুমি এখনই এই স্থান পরিত্যাগ করো। আমি একথা বিশেষভাবে জানতে পেরেছি। আমি বলছি, আমার কথা শোনো, তুমি আর ওই দুর্বৃত্ত অধ্যাপককে বিশ্বাস কোর না।

এই বলে গোবিন্দ যাদবপ্রকাশের অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে সামনে এগিয়ে গেলেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি অবাক হলেন, দেখলেন শিষ্যদের মধ্যে রামানুজ নেই। তখন সকলে রামানুজের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হল। কিন্তু সেই বিশাল অরণ্যে কোথাও রামানুজকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁরা রামানুজের নাম ধরে ডাকতে থাকলেন। কোথাও সাড়া পাওয়া গেল না। যাদবপ্রকাশ বুঝতে পারলেন যে কোনো হিংস্র জন্তু রামানুজকে হত্যা করেছে। যাক, তাহলে পথের কাঁটা দূর হল।

গোবিন্দ নিজের ভ্রাতৃ—বিয়োগের দুঃখের ভাব প্রকাশ করলেন। যাদবপ্রকাশ তাঁর মুখ—নিঃসৃত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সকলের হৃদয়কে শান্ত করলেন। বিশেষ করে তিনি শোকাবিভূত গোবিন্দকে বললেন—এই পৃথিবীতে আমরা কেউ কারো নই। মানুষ দুদিনের জন্য ধরাধামে আসে, আবার তাকে অনন্তলোকে চলে যেতে হয়।

গুরু যাদবপ্রকাশ মনে মনে খুবই আশ্বস্ত হলেন। তাঁকে আর রামানুজকে হত্যা করার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হল না। আনন্দঘন চিত্তে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তিন

গোবিন্দর কাছ থেকে এই ভয়ংকর খবর শুনে রামানুজের মনে হল চারপাশ বুঝি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়েছে। যে গুরুকে তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, সেই যাদবপ্রকাশ কিনা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন! শেষ পর্যন্ত রামানুজ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন।

তখন মধ্যদিন। ১৮ বছর বয়সের যুবক সেই নির্জন অরণ্যে একলা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এখন কী করবেন তা ভেবে উঠতে পারছেন না। একবার ভাবলেন চিৎকার করে গোবিন্দকে ডাকেন। কিন্তু তা হলে তাঁর অস্তিত্বের কথা অন্য শিষ্যরা জানতে পারবে।

তখন এক আশ্চর্য শক্তি রামানুজের সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করল। রামানুজের মনে হল স্থল—জল—অন্তরীক্ষে অবিসংবাদিত রক্ষাকর্তা স্বয়ং নারায়ণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। রামানুজ হারানো শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি দক্ষিণদিকে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। একবারও পিছন দিকে তাকালেন না। রামানুজ অতি বেগে পদচালনা করছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যেকোনো সময়ে যাদবপ্রকাশের শিষ্যরা তাকে অনুসন্ধান করতে বের হবে। যদি একবার যাদবপ্রকাশ তার সন্ধান পান, তাহলে আর রক্ষা নেই।

নারায়ণের নাম করে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সেখানে মেঘেরা আকাশ ছুঁয়েছে। মধ্যদিনেও সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারছে না। সহসা রামানুজের কানে তাঁর নাম শ্রুত হল। তিনি যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। ভয়ে, বিস্ময়ে, হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল বুঝি তাঁর। রামানুজ বুঝতে পারলেন যাদবপ্রকাশের ইঙ্গিতে শিষ্যরা তাঁরই অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তিনি ঘন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন। অবশেষে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে চলৎশক্তিহীন হলে গাছের নীচে বসে পড়লেন। বসাও কষ্টকর মনে হল। তিনি শুয়ে পড়লেন। নিদ্রার আলিঙ্গনে সংসারের সবকিছু ভুলে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর রামানুজের ঘুম ভাঙল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সূর্য তখন অস্তাচলের পথে। এতক্ষণ কেটে গেল! কিন্তু রামানুজের ক্ষুধা তেমন জাগ্রত হয়নি। নিদ্রা তাঁর ক্লান্তিকে দূর করে দিয়েছে। তিনি ত্রিতাপহারী হরিকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে স্বয়ং নারায়ণ রক্ষাকর্তা হিসাবে তাঁকে এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন।

হাত—মুখ ধুতে হবে, কাছে পিঠে কোনো জলাশয় আছে কিনা এসব কথাই ভাবতে লাগলেন রামানুজ। হঠাৎ দেখলেন এক ব্যাধদম্পতি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাধপত্নী এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'আহা, তুমি কি পথ হারিয়ে এই নির্জন বনে একাকি বসে আছো? তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান। তোমার উপবীত দেখে আমি তা বুঝতে পারছি। বলো বাবা, তুমি কোথায় থাকো?'

রামানুজ বললেন, আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে। আমি দক্ষিণদেশের কাঞ্চীপুরের বাসিন্দা। এই শহরের নাম শুনেছ কি? একথা শুনে ব্যাধ বলল, এই দস্যুবহুল ভয়ংকর অরণ্যে তুমি এলে কী করে? এখানে দিনের বেলাও কেউ প্রবেশ করতে সাহস করে না। এখানে হিংস্র জন্তুরা ঘুরে বেড়ায়। কাঞ্চীপুর আমি জানি। আমরাও সেদিকেই যাচ্ছি। এই ভয়ংকর দেশে তোমাকে একা দেখে তোমার কাছে ছুটে এলাম। রামানুজ বললেন, তোমাদের জন্মভূমি কোথায়? তোমরা কেন কাঞ্চীপুর অভিমুখে যাত্রা করছ?

ব্যাধ বলল, বিন্ধ্যাচলের কাছে এক বন্যপল্লিতে আমাদের জন্ম। আমি সারাজীবন ধরে ব্যাধের নৃশংস পেশা বহন করে চলেছি। একটির পর একটি পশুকে হত্যা করছি। এই কথা ভেবে আমি ভীষণ কষ্টে আছি। তাই আমি আর আমার পত্নী তীর্থদর্শনে বেরিয়েছি। কাঞ্চীপুর থেকে রামেশ্বর যাব। ভালো হল পথে তোমার মতো এক সৎ ব্রাহ্মণকে সঙ্গী হিসাবে পেলাম। তুমি কি পথভ্রান্ত? তুমি ভয় পেয়ো না। মনে রেখো ঈশ্বর সদা সর্বদা আমাদের পাশে পাশেই থাকেন। তিনিই আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য।

ওই ব্যাধের দিকে তাকিয়ে রামানুজ প্রথমে কিছুটা ভয় পেয়েছিলেন। ব্যাধের গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, তার লোহিত লোচন। কিন্তু ওই ব্যাধের মুখমণ্ডলে এক অলৌকিক স্নেহের অভিব্যক্তি। ব্যাধকে দেখে রামানুজের মনে হল, স্বয়ং ঈশ্বর বুঝি ব্যাধরূপে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ব্যাধদম্পতিকে অনুসরণ করতে সম্মত হলেন।

ব্যাধ বলল, চলো আমরা এই অরণ্যদেশ পার হয়ে এক নদীর তীরে পৌঁছে যাই। সেখানেই আজ নিশিযাপন করতে হবে।

কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর তাঁরা এক নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। বন থেকে কাঠ এনে ব্যাধ আগুন জ্বালল। তারপর রামানুজকে বিশ্রাম করতে বলল। নিজেও পাশে পত্নীর সঙ্গে বিশ্রাম করতে লাগল। ব্যাধপত্নী তার স্বামীকে সম্বোধন করে বলল, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি তৃষ্ণাতুর, এখানে জল কোথায় পাওয়া যাবে?

ব্যাধ বলল, রাত্রি এসে গেছে। এখন আর এই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কাল সকালেই আমরা এক কূপের কাছে পৌঁছে যাব। সেখানকার নির্মল জলে তুমি তোমার তৃষ্ণা নিবারণ কোর।

স্বামীর একথা শুনে পত্নী সম্মত হল। মধ্যরাতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। রামানুজ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁর কেবলই মনে হল এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বুঝি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই পুরুষ তাঁর দিকে করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সারাজীবন ধরে রামানুজ যে ঈশ্বরের সাধনা করেছেন সেই বিষ্ণু যে ব্যাধরূপে তাঁকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, রামানুজ এই বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তাঁর চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেল। আকাশ ভরা তারা, নীচে শয়ন করেছেন রামানুজ। পাশে নিদ্রিত ব্যাধদম্পতি। তিনি উঠে বসলেন। যতদূর চোখ যায় শুধু ঘন গাছপালা। সময় বুঝি এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে। রামানুজ গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নশ্বর জীবনের জ্বালা—যন্ত্রণা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন। তাঁর মনে হল সুমিষ্ট, সুশীতল বাতাস বুঝি তাঁর সমস্ত স্নায়ুপুঞ্জকে শান্ত করেছে। তিনি আবার ভূমিশয্যায় শয়ন করলেন। অনতিবিলম্বে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলেন। জাগতিক জীবনের সকল দুঃখ—কষ্ট, জ্বালা—যন্ত্রণাকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেলেন রামানুজ।

চার

নিশার অবসানে এল সকাল। পূর্ব আকাশ উদ্ভাসিত হল সূর্যের আলোকশিখায়। রামানুজের ঘুম ভাঙল। তিনি ব্যাধদম্পতিকে অনুসরণ করে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। একটু পরেই পৌঁছে গেলেন একটি কূপের কাছে। সিঁড়ি দিয়ে অবরোহণ করলেন। কূপের জলে তৃষ্ণা নিবারণ হল তাঁর। মনে হল জীবনের সমস্ত গ্লানি বুঝি দূর হয়ে গেল। দু—হাতে জল এনে ব্যাধপত্নীর তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। তিনবার এইভাবে জল দিলেন। তবুও ব্যাধপত্নীর তৃষ্ণা নিবারণ হল না। রামানুজ চতুর্থবার কূপে অবরোহণ করলেন। জল সংগ্রহ করে ওপরে এলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোথাও ব্যাধদম্পতির চিহ্নমাত্র নেই! এইটুকু সময়ের মধ্যে তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল?

রামানুজ কী করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মুখে কোনো কথা নেই। একটু পরেই সহসা তাঁর মনে হল স্বয়ং লক্ষ্মী—নারায়ণ বুঝি ব্যাধদম্পতি হিসাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেলেন। এভাবে তাঁরা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। হয়েছিলেন তাঁর পথ প্রদর্শক। তিনি একটু

দূরে একটি মন্দির চূড়া এবং বেশ কয়েকটি অট্টালিকা দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি একটি শহরে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু এটি কোনো নগরী? এখানে কি তিনি আগে কখনো এসেছেন?

চলতিপথে এক পথিককে দেখা গেল। রামানুজ বললেন—মহাশয় এটি কোনো নগরী?

পথিক এমন প্রশ্ন শুনে ঈষৎ বিস্মিত হলেন। তিনি রামানুজের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি এ দেশের মানুষ। কিন্তু এমন বিদেশির মতো আচরণ করছেন কেন? এই নগরটি হল বিখ্যাত কাঞ্চীনগরী। আপনাকে তো আমি চিনতে পেরেছি, আপনি তো এই কাঞ্চীনগরীরই বাসিন্দা। যাদবপ্রকাশের শিষ্য। তাহলে? এই যে কূপ আপনি সামনে দেখছেন, এই কূপের জল হল অতি পবিত্র। এর পাশে একটি বহু প্রাচীন শালবৃক্ষ আছে বলে একে শালকূপ বলা হয়। অনেক দূর থেকে মানুষজন এই কূপের জল পান করার জন্য এখানে আসেন। এই জল ত্রিতাপনাশক।

এই কথা বলে পথিক আপন গন্তব্য পথে চলে গেলেন। রামানুজ সুপ্তোত্থিতের মতো কিছুই তখন স্থির করতে পারলেন না। আবার তিনি সেই ব্যাধদম্পতিকে স্মরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসিক জড়তা দূর হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, লক্ষ্মী—নারায়ণের করুণার ফলেই তিনি মৃত্যুর গহন অন্ধকার থেকে জীবনের আলোকিত উপত্যকায় পা রেখেছেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বিষ্ণুর উদ্দেশে একটির পর একটি স্তোত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। তাঁর চোখ থেকে নির্গত হতে থাকল আনন্দের অশ্রুধারা।

শ্রীরামানুজ তখন আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে শালকূপটিকে বারবার প্রদক্ষিণ করছেন। তাঁর মনে ছিল দৃঢ় আশা যে ব্যাধদম্পতি অন্তত একবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবেন। দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। কয়েকজন স্ত্রীলোক কলসী নিয়ে কূপের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এই স্থান থেকে কাঞ্চীপুরের দূরত্ব এক মাইল হবে। পূর্ব, উত্তর এবং পশ্চিম দিকে ঘন অরণ্য। সেখানে লোক চলাচল বিশেষ চোখে পড়ে না। রামানুজ আবার ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে থাকলেন। তিনি সুমধুর স্তবে ঈশ্বরের বন্দনা করে বললেন—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙঘ্রয়ে।।

কুন্তীর মতো তিনি এই বলে ভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা করলেন,

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদগুরো
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্।।
জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুতত শ্রীভিরেধমনেমদঃপুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।
নমোহকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ।।

অর্থাৎ 'হে জগদগুরু, আপনার প্রসাদে আমি সমস্ত বিপদকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। আপনাকে একবার দেখলে আর পুর্নজন্ম লাভ করতে হয় না। যে সমস্ত ব্যক্তি ধনবান এবং ঐশ্বর্যবান, যারা উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা আপনার নাম গ্রহণ করতে পারে না। কারণ তাদের মনের মধ্যে এক ধরনের মিথ্যা অহংবোধের জন্ম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি দরিদ্র, তিনি সদা সর্বদা আপনাকে স্মরণ করেন, তিনিই আপনার প্রকৃত ভক্ত। আপনি ধর্ম, অর্থ ও কামের অতীত হয়ে স্বীয় আত্মাতেই পরম গতি লাভ করে থাকেন। আপনার মধ্যে কামনা বাসনার কোনো আবেগ নেই। আপনি শান্ত সমাহিত। নিখিল জীবের মুক্তিদাতা। আমি সদাসর্বদা আপনাকে বন্দনা করি।'

এবার তাঁকে কাঞ্চীনগরীর দিকে যেতে হবে। কারণ তাঁর মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

দীর্ঘদিন পুত্রের মুখদর্শন করেননি বলে মাতা কান্তিমতী বিষণ্ণ হৃদয়ে রোদন করছিলেন। হঠাৎ প্রিয়তম পুত্রকে দেখে তিনি আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন এ কি বাস্তব না কি কল্পনা? রামানুজ তাঁর পায়ে প্রণাম নিবেদন করে বললেন—মা এই আমি এসেছি, তোমরা সব ভালো আছো তো?

কতদিন পরে তিনি নিজের পুত্রের মুখনিঃসৃত এই মধুর শব্দাবলি শ্রবণ করলেন। তখন তাঁর মনের সমস্ত সন্দেহ দূর হল। তিনি পুত্রকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুই এত তাড়াতাড়ি একা ফিরে এলি কী করে? গোবিন্দ কোথায়? লোক মুখে শুনেছি গঙ্গাস্নান করে ফিরতে প্রায় ছ মাস সময় লাগে। তুই কি পথ থেকে ফিরে এসেছিস?

রামানুজ শান্তমনে প্রশ্নগুলি শ্রবণ করলেন। তারপর সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ মায়ের কাছে উত্থাপন করলেন। যাদবপ্রকাশের ওই দূরভিসন্ধির কথা শুনে কান্তিমতী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেই পারছেন না যে যাদবপ্রকাশের মতো এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এমন হীন মনের অধিকারী। ঈশ্বরের অশেষ অনুগ্রহে তাঁর পুত্র প্রাণ ফিরে পেয়েছে। একথা স্মরণ করে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন। নারায়ণের ভোগ রন্ধন করতে হবে, অনেকটা সময় চলে গেছে। তিনি দ্রুত পাকশালার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কী রান্না করবেন তা স্থির করতে পারছেন না। চুল্লির কাছে গিয়ে দেখলেন এক টুকরোও কাঠ অবশিষ্ট নেই। দুদিন হল কাঠ ফুরিয়ে গেছে। যেহেতু রামানুজ বাড়িতে নেই আর নববধূমাতা পিত্রালয়ে বাস করছেন, তাই নিজের জন্য আর রান্না করেন না তিনি। ফলমূল খেয়ে কোনোরকমে ক্ষুধার নিবৃত্তি করেন। কাঠের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। আজ সকাল থেকে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে রামানুজের জন্য তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর কিছুই মনে ছিল না। এইসময় কনিষ্ঠা বোন কৃতিমতী পুত্রবধূকে নিয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, দিদি, ভালো আছো তো? দাসী মারফৎ জানতে পারলাম পুত্র বিরহে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছ। সবসময় কান্নাকাটি করছ। তাই তোমায় দেখতে এলাম। তুমি তো বিষ্ণুর একান্ত অনুগ্রাহী। তবে এমনভাবে কাঁদছ কেন? ঈশ্বর তোমাকে সকল দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করবেন। কত লোক গঙ্গা স্নান করে নির্বিঘ্নে ফিরে আসে। রামানুজ সঠিক সময়ে এখানে চলে আসবে। তার জন্য বৃথা চিন্তা কোর না। রামানুজ আর গোবিন্দ না আসা পর্যন্ত আমি তোমার কাছেই থাকব। তাই পুত্রবধূকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। দাসী গেছে কাঠ এবং অন্যান্য জিনিস আনতে।

বোনকে পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। হঠাৎ রামানুজ সেখানে প্রবেশ করলেন। রামানুজকে দেখে কৃতিমতীর আনন্দ বুঝি আর ধরে না। রামানুজ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। তিনি বললেন—বৎস, চিরজীবী হও। তিনি পুত্র গোবিন্দের কথা জানতে চাইলে রামানুজ সমস্ত ঘটনা বললেন।

দাসী নানা ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে চলে এল। দুই বোন পাকশালায় প্রবেশ করে নারায়ণের ভোগ রান্না করতে লাগলেন। সেই ভোগ নারায়ণকে নিবেদন করা হল। রামানুজ দেখলেন কাঞ্চীপূর্ণ তাঁর আগমন বার্তা শুনে তাঁকে দেখার জন্য চলে এসেছেন। কাঞ্চীপূর্ণকে দেখে রামানুজের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে দেখা মাত্র অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। রামানুজ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। রামানুজকে কাঞ্চীপূর্ণ বললেন এভাবে আমাকে প্রণাম করবেন না। আমি শূদ্র আর আপনি ব্রাহ্মণ।

তখন রামানুজ বলেছিলেন—মহাত্মা আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মতো এক বিশিষ্ট মানুষের সাক্ষাৎ পেলাম। আমার একান্ত অনুরোধ আজ দ্বি—প্রহরে আপনি এখানেই প্রসাদ গ্রহণ করুন। সবই প্রস্তুত আছে।

রামানুজের এই আন্তরিক আবেদনে কাঞ্চীপূর্ণ সাড়া দিলেন। সেদিন রামানুজের গৃহে যে আনন্দ উৎসব হয়েছিল, ভাষায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যদিও গোবিন্দ না থাকাতে কৃতিমতীর মন কিছুটা বিষণ্ণ ছিল,

কিন্তু রামানুজকে দেখে তাঁর পুত্রের অনুপস্থিতি কোথায় হারিয়ে গেল। তিনি বিশ্বাস করলেন মানুষের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে মানুষ সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করতে পারে না।

পাঁচ

রামানুজ এখন স্বগৃহে অবস্থান করে শাস্ত্রপাঠ করেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বেশকিছু শিষ্য এবং ছাত্র এসেছে। দূর—দূরান্ত থেকে অনেকে তাঁর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির কথা জেনেছেন। তাঁরা প্রায়শই রামানুজের সঙ্গে দেখা করতে চান। রামানুজ শান্তভাবে তাঁদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন।

দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল। শিষ্যদের নিয়ে যাদবপ্রকাশ কাঞ্চীপুরে প্রবেশ করলেন। গোবিন্দ ছাড়া অন্য শিষ্যরা তাঁর সঙ্গেই এসেছেন। গোবিন্দের জীবনে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে। যখন রামানুজ অরণ্যের মধ্যে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন দুঃখিত চিত্তে তিনি সকলের সঙ্গে কাশীধামের উদ্দেশে যাত্রা করেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা ভারতের এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেখানে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করে জীবন সার্থক করেন। প্রায় পনেরো দিন যাদবপ্রকাশ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কাশীধামে অতিবাহিত করেছিলেন।

একদিন প্রত্যুষে গোবিন্দ জলের মধ্যে এক সুন্দর বাণলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। এই বাণলিঙ্গটি দেখে যাদবপ্রকাশ আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যান। তিনি গোবিন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন—হে প্রিয় শিষ্য, পার্বতী—পতি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি এই অনর্থ লিঙ্গ রূপে তোমার কাছে এসেছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা তুমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান সহকারে এই লিঙ্গের পূজা করবে। তবে তুমি ভক্তি এবং মুক্তি সবই লাভ করবে।

গুরুর মুখ—নিঃসৃত এই অমৃত বাণী শ্রবণ করে গোবিন্দের সমস্ত শরীরে এক আশ্চর্য শিহরণের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন থেকেই তিনি মনেপ্রাণে শিবভক্ত হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে তাঁর ভক্তির মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কালহস্তীর কাছে এসে তিনি গুরু এবং সতীর্থদের উদ্দেশ করে বলেন, আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল দেবাদিদেব মহাদেবের সেবায় অতিবাহিত করতে চাই। এই স্থানটি অত্যন্ত মনোরম। এর প্রাকৃতিক শোভা অসাধারণ। আমি এখানেই থাকব। আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। আপনারা অনুগ্রহ করে কাঞ্চীপুরে ফিরে গিয়ে আমার মা এবং মাসির কাছে এই সংবাদ জানাবেন।

গোবিন্দ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। নিকটবর্তী মঙ্গল গ্রামে তিনি পৌঁছে গেলেন। সেখানে একটি বাড়ি কিনলেন। পরম শ্রদ্ধা সহকারে ইষ্টদেবকে বেদির ওপর স্থাপন করলেন। দেবতার চরণে জীবনের সবকিছু অর্পণ করলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা এভাবেই তিনি একদিন মহামুক্তির পথ খুঁজে নেবেন।

যাদবপ্রকাশের মুখ থেকে পুত্রের এই সংবাদ শুনে কৃতিমতী আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যান। যদি তিনি অতি সাধারণ রমণী হতেন তাহলে পুত্র অদর্শনে কাতর হতেন। কিন্তু কৃতিমতী ছিলেন অনন্যা বৈশিষ্ট্য সম্পন্না এক মহীয়সী নারী। তিনি জানতেন যে জীবনে ঈশ্বর ভক্তি হল সব থেকে বড়ো। তাই গোবিন্দ যে শেষ পর্যন্ত শিবের অশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন, এই সংবাদ শুনে তাঁর দু—চোখে আনন্দের অশ্রুধারা উঠে আসে। তিনি দিদির কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন। পৌঁছে গেলেন মঙ্গল গ্রামে। সেখানে সন্তানের সঙ্গে দেখা হল। সন্তানকে আশীর্বাদ করে আবার দিদির কাছে ফিরে এলেন।

যাদবপ্রকাশ আবার অধ্যাপনার কাজ শুরু করেছেন। রামানুজকে দেখে তাঁর মনে এক ধরনের ভীতি বিহ্বলতার সঞ্চরণ ঘটে যায়। তিনি অনুমান করলেন রামানুজ হয়তো এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সবকিছু অবগত আছেন। ইতিমধ্যে হয়তো অনেকের কাছে যাদবপ্রকাশের ওই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই অঞ্চলে রামানুজের অনুগামীর সংখ্যা অসংখ্য। তারা যদি যাদবপ্রকাশকে একযোগে আক্রমণ করে তাহলে কী হবে? কিন্তু যাদবপ্রকাশ তাঁর মনের এই ভাব সকলের সামনে প্রকাশ করলেন না। তিনি রামানুজকে উদ্দেশ করে বললেন, বৎস, তুমি যে জীবিত আছো এই সংবাদ পেয়ে আমি যে কী আনন্দ পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তোমাকে খোঁজার জন্য আমরা যে কি প্রাণপাত করেছিলাম তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

রামানুজ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, এ সবই আপনার অনুগ্রহ।

রামানুজের একান্ত অনুরোধে তাঁর মা এবং মাসী ওই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা কাউকে বলেননি। এটাই হল রামানুজের চরিত্রের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যাদবপ্রকাশ এক বিদগ্ধ পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন অত্যন্ত সংকীর্ণমনা। যে ব্যক্তি দু—পক্ষের মতামত শান্তভাবে গ্রহণ করতে না পারেন, তার বিদ্যার অহংকার করা উচিত নয়। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাঁরা নানা মত প্রকাশ করবেন এটাই হল স্বাভাবিক। আমাদের উচিত শান্ত চিত্তে সেই মত শ্রবণ করা এবং সম্ভব হলে তা আবার খণ্ডন করা। যাদবপ্রকাশ কিন্তু এমন করতেন না। পক্ষান্তরে রামানুজ ছিলেন সহমর্মিতা ও সহানুভূতির চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য। রামানুজকে এমন আচরণ করতে দেখে যাদবপ্রকাশ মনে মনে খুবই লজ্জা পেয়েছিলেন। তিনি সস্নেহে রামানুজের উদ্দেশে বললেন—কাল থেকে তুমি আবার আমার গৃহে এসে অবস্থান করো। আশা করি ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

পুরনো অভিমান ভুলে গিয়ে রামানুজ আবার যাদবপ্রকাশের শিক্ষাঙ্গনে পৌঁছে গেলেন। শুরু হল তাঁর পাঠ্যাভ্যাস।

কিছুদিন কেটে যাবার পর যামুনাচার্য কাঞ্চীপুরে এলেন। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন শিষ্য এবং ভক্ত ছিলেন। তিনি দেখলেন যে রামানুজের কাঁধের ওপর হাত রেখে যাদবপ্রকাশ সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন। যামুনাচার্য রামানুজের সাত্ত্বিকপ্রভা এবং ঐশী সত্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি রামানুজের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তিনি জানতে পারেন যে এই যুবক 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' মন্ত্রের ব্যাখ্যার রচয়িতা। এই কথা শুনে রামানুজের প্রতি তাঁর ভক্তি এবং ভালোবাসা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু শুষ্ক তার্কিক যাদব কেন রামানুজের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন। এই বিষয়টি তাঁর ভালো লাগল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুকে উদ্দেশ করে বললেন যাঁর প্রত্যল্প প্রসাদ পেলে বধির শ্রবণ করতে পারে, খঞ্জ সবেগে ধাবমান হয় এবং জিহ্বাহীনের বাক্যস্ফূরণ ঘটে, যাঁর আশীর্বাদে অন্ধও চক্ষুষ্মান হয় এবং বন্ধ্যা সন্তান উৎপাদন করতে পারে, আমি সেই মহা শক্তিশালী বরদদেবের শরণাপন্ন হই। হে ঈশ্বর, রামানুজের ওপর আপনার কৃপা বর্ষণ করুন। যে করে হোক তাঁকে স্বীয় মতে আনতে হবে। নাহলে তাঁর বৌদ্ধিক বিভা ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাবে। যাদবপ্রকাশের মতো এক শুষ্ক তার্কিকের সংস্পর্শে বেশিদিন থাকলে রামনুজের ঐশী শক্তি মলিন হবে।

যামুনাচার্য বারবার ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছে হল ভবিষ্যতে সুযোগ হলে রামানুজের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করবেন। এইভাবে নিজের মনকে তিনি প্রবোধ দিলেন। তারপর শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

যাদবপ্রকাশ বেদান্ত ছাড়া তন্ত্র এবং মন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মন্ত্র সাধনা তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করেছেন। তিনি বিশাদগ্রস্ত এবং ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে পারতেন। তাঁর মন্ত্র ছিল অমোঘ, তাঁর মন্ত্রের প্রভাবে পিশাচেরা দূরে সরে যেত।

কাঞ্চীপুরের রাজকুমারী ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হলেন। রাজা নিজ কন্যাকে এই অবস্থায় দেখে অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। মেয়ের মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেছে। মেয়ের মুখ থেকে এমনই সব কুবাক্য নির্গত হচ্ছে যা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোনো এক সত্তা তাকে গ্রাস করে রেখেছে। এখন কী উপায়?

উদ্বিগ্ন রাজা দেশ—বিদেশে খবর পাঠালেন। অনেক বিখ্যাত চিকিৎসক রাজকুমারীর চিকিৎসার জন্য এলেন। কিন্তু কেউই রাজকুমারীর রোগ নির্মূল করতে পারলেন না। অবশেষে ডাক পড়ল বেদান্তচার্য যাদবপ্রকাশের। যাদবপ্রকাশ ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্তা রাজকুমারীকে দেখলেন। যাদবপ্রকাশকে দেখা মাত্র ব্রহ্মরাক্ষস চিৎকার করে বলে ওঠে যাদব, এখানে তোমার মন্ত্র কোনো কাজ করবে না। তুমি সকলের সামনে পরাজয়ের তেতো স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আমি এখনো বলছি, যদি অপমানের হাত থেকে মুক্তি চাও তাহলে অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করো।

যাদবপ্রকাশ এমন কথায় স্বাভাবিকভাবেই কর্ণপাত করলেন না। তিনি নানা ধরনের মন্ত্র প্রয়োগ করতে থাকলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, এর আগে এইসব মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু এবার তাঁর মন্ত্র কোনোভাবেই কাজ করছে না। ব্রহ্মরাক্ষস আবার যাদবপ্রকাশকে বলল—কেন মিথ্যা কষ্ট করছ? তোমার ক্ষমতা আমার থেকে অনেক কম। তুমি আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। যদি সত্যি সত্যি রাজকুমারীর মুক্তি চাও, তাহলে তোমার যে শিষ্য সবথেকে অল্পবয়স্ক, যার আছে বিস্তৃত ললাট এবং আয়ত চক্ষু, সেই রামানুজকে তুমি অবিলম্বে এখানে নিয়ে এসো। মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার নিবিড় অন্ধকার যেমন সূর্যালোকে অপসৃত হয়, ঠিক সেইভাবে রামানুজ এলে আমিও অপসৃত হবো।

ব্রহ্মরাক্ষসের মুখে এই কথা শুনে যাদবপ্রকাশ খুবই কষ্ট পেলেন। তবুও যা সত্য তাকে তো স্বীকার করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে রামানুজকে আনা হল। রামানুজ অনতিবিলম্বে ব্রহ্মরাক্ষসকে রাজকুমারীর দেহ থেকে অপসৃত করলেন। রাক্ষস বলল আপনি কৃপা করে আমার মস্তকে আপনার পদযুগল স্থাপন করুন। নাহলে আমি এই স্থান ত্যাগ করে যাব না।

যাদবপ্রকাশের আদেশে রামানুজ রাজকুমারীর মাথায় নিজের দুটি পা স্থাপন করলেন। তারপর বললেন, অনেকদিন ধরে তুমি রাজতনয়াকে কষ্ট দিয়েছ। আমার আদেশ অবিলম্বে এই স্থান ছেড়ে চলে যাও। আর তুমি যে সত্যি সত্যি এই স্থান ত্যাগ করেছ তার কিছু নিদর্শন রেখে যাও।

ব্রহ্মরাক্ষস বলল, এই আমি পরিত্যাগ করছি। নিদর্শন স্বরূপ ওই অশ্বত্থ গাছের শাখা এখনই ভেঙে পড়বে।

দেখতে দেখতে অশ্বত্থ গাছের শাখা ভেঙে পড়ল। উপস্থিত সকলে রামানুজের আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি দেখে একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। রাজকুমারীকে দেখে মনে হল তিনি বোধহয় এতক্ষণ ঘুমঘোরে ছিলেন। সংজ্ঞা লাভ করার পর চারপাশে এতজন মানুষ দেখে হলেন লজ্জাশীলা। সখীদের সঙ্গে অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন।

কাঞ্চীরাজকন্যার আরোগ্যবার্তা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামানুজের পদদ্বয় স্পর্শ করলেন। সমস্ত চোল রাজ্যে রামানুজের নাম বিখ্যাত হয়ে গেল।

এইভাবেই রামানুজ প্রমাণ করেছিলেন যে, ইচ্ছা থাকলে যে কোনো দুরূহ কার্য সম্পাদন করা যায়। যাদবপ্রকাশের কাছে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আবার রামানুজ তাঁর কিছু ভুলত্রুটি বুঝতে পারলেন। অন্য শিষ্যরা যাদবপ্রকাশের বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হন। কিন্তু তিনি মাঝেমধ্যে এমন ভাষ্য দান করেন যা উচিত নয়। এই বোধ ওই সব শিষ্যদের নেই। একদিন যাদবপ্রকাশ ছান্দোগ্য এবং কঠোপনিষদ থেকে দুটি মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মিতা সহকারে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করেন। পাঠ শেষ হবার পর রামানুজ এই সম্পর্কে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করে বললেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এর অর্থ নিখিল জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ। এ জগৎ ব্রহ্ম থেকে জন্মেছে একথা সত্য। ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে। আবার তা ব্রহ্মেই বিলীন হয়। তাই এই জগৎকে আমরা ব্রহ্মময় বলতে পারি। যেমন মাছ জলে জীবন ধারণ করে এবং জলেই তার প্রাণ লয় হয়। তাই মাছকে আমরা জলময় বলব, কিন্তু মাছ আর জলের মধ্যে পার্থক্য আছে। জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের কথা আপনি কেন বলছেন না?

এই ব্যাখ্যা সংগত কারণে যাদবপ্রকাশের মনঃপুত হয়নি। তিনি বললেন, রামানুজ, তোমার যদি মনে হয় এখানে এসে তোমার কোনো লাভ হবে না তাহলে কাল থেকে আর আমার এখানে এসো না। রামানুজ দুঃখিত চিত্তে গুরুর পদস্পর্শ করে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। ভবিষ্যতে আর কখনো তিনি যাদবপ্রকাশের শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করেননি।

ছয়

রামানুজ পরদিন নিজ গৃহে বসে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। কাঞ্চীপূর্ণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রামানুজের আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা থাকল না। তিনি বললেন— হে মহাত্মা, আমার কি

সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম। করুণাময় বরদারাজের স্নেহের জন্যই এমন ঘটনা ঘটেছে। আমি এক অজ্ঞ বালক, সংসার অরণ্যে শ্বাপদ পশুদের সামনে অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে স্বয়ং বিষ্ণু আপনাকে আমার পথপ্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছেন। আপনি হয়তো শুনেছেন যে যাদবপ্রকাশের সান্নিধ্য আমি হয়তো আর লাভ করতে পারব না। কিন্তু এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে এটি হল ঈশ্বরের অভিপ্রায়। আমি যাতে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারি তাই তিনি এমন প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করেছেন। আপনি আমার গুরু, অনুগ্রহ করে আমাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করুন।

রামানুজের এই কথা শুনে কাঞ্চীপূর্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন—বৎস রামানুজ, আমি শূদ্র এবং মূর্খ, তুমি সৎ বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি মহা পণ্ডিত। তুমি কেন আমার এমন বন্দনা করছ? আমি তোমার থেকে বয়সে বড়ো কিন্তু তুমি হলে জ্ঞানকৃষ্ণ। শাস্ত্রে আমার কোনো পারদর্শিতা নেই বলে আমি ঈশ্বরের সেবা করে জীবনের দিনগুলো কাটাতে চাই। সত্যি তুমি আমার গুরু আর আমি হলাম তোমার দাস।

রামানুজ বললেন, হে পণ্ডিত, শাস্ত্র আলোচনা করে জানা যায় যে ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁর সেবা করাই উচিত। আপনি সেই বিষয়টি যথার্থ জ্ঞাত হয়েছেন। যদি আমরা শুধু পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ করি তাহলে ঈশ্বর কখনো আমাদের ওপর সদয় হন না। অন্য পণ্ডিতরা চন্দন ভারবাহী গর্ধবের মতো বিচরণ করছেন। আপনি আমায় পরিত্যাগ করবেন না। আজ থেকে আমি আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় নিলাম।

এই বলে রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের পায়ের ওপর পড়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁকে ভূমি থেকে উত্থাপিত করে আলিঙ্গন করে বললেন, বৎস, তোমার ভগবৎ ভক্তি দেখে আমি আজ কৃতার্থ হয়েছি। তুমি আজ থেকে এক কলসী শালকূপের জল বরদারাজের অর্চনার্থে আনয়ন করবে। আমার মনে হয় হস্তিগিরিপতি বোধহয় তোমার মনোগত বাসনা পূর্ণ করবেন।

কাঞ্চীপূর্ণের এই পরামর্শ অনুসারে রামানুজ তখন থেকে প্রতিদিন এক কলস জল বহন করে মন্দিরে নিয়ে যেতেন।

কাঞ্চীপূর্ণ হলেন এক বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর জন্ম হয়েছিল পুনামেদীতে। বাল্যকাল থেকেই তিনি বরদারাজের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। বরদারাজকে তিনি তাঁর স্ত্রী—পুত্র পরিবার বলে গণ্য করতেন। কীসে বরদারাজের সুখ সম্পাদন হতে পারে সেদিকে নজর রাখতেন। গ্রীষ্মকালে সদাসর্বদা বরদারাজকে পাখার বাতাস করতেন। কোথায় উত্তম পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে বা কোথায় সুপক্ক ফল আছে তা অন্বেষণ করতেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে বরদারাজের নিত্য দাস হিসাবে গণ্য করতেন। কাঞ্চীনিবাসীরা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন।

কাঞ্চীপূর্ণের স্বভাবের আর—একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তিনি সদা হাস্যময়, জীবনে কাউকে কটূবাক্য বলেননি। কাউকে ভর্ৎসনা করেননি। তিনি সকলের কথা মন দিয়ে শ্রবণ করতেন। বিরুদ্ধ মতবাদীকেও কোনোভাবে ছোটো করতেন না। তাই সকলেই বলতেন তিনি সাক্ষাৎ বরদারাজ।

অবশ্য কয়েকজন শাস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁকে উন্মাদ বা ভণ্ড বলে মন্তব্য করতেন। যাদবপ্রকাশ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

রামানুজের সঙ্গে দেখা হবার পর বৃদ্ধ যামুনাচার্য তাঁরই শুভকামনা করতেন। যাতে রামানুজের জীবনে কোনো সমস্যা না আসে সেজন্য তিনি শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা করেন। তাঁর মনোগত বাসনা ছিল রামানুজ যেন যাদবের শিষ্যত্ব ছেড়ে বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করেন। রামানুজের কল্যাণ কামনা করে তিনি অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত বেশ কয়েকটি স্তোত্র রচনা করেন। এই স্তোত্রগুলি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারব অলংকার শাস্ত্র এবং সাহিত্য শাস্ত্রে তাঁর কতখানি ব্যুৎপত্তি ছিল। আজও হাজার হাজার মানুষ পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে এই স্তোত্রগুলি পাঠ করে অনির্বচনীয় আনন্দ সাগরে অবগাহন করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন।

দেখতে দেখতে আরো কিছুদিন কেটে গেল। যামুনাচার্য অসুস্থ হলেন। শিষ্যরা তাঁর শয্যার চারপাশে উপস্থিত থেকে দিবারাত্র পরিশ্রম করে তাঁর সেবা শুশ্রষা করতে লাগলেন। এইসময়ও যামুনাচার্য একাধিক শাস্ত্রবাক্য বিশ্লেষণ করতে থাকেন। তিনি জানতেন এই পৃথিবীতে আমরা কেউই চিরকালের জন্য আসিনি। একদিন আমাদের সকলকে মহামৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইতিবাচক কাজে লাগানো দরকার। তাই একদিন ঈশ্বর মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, যেমন ফুলের সার হল মধু এবং গাভীর সার ঘৃত, তেমনই ত্রিলোকেশ্বর নারায়ণ, তাঁকে লাভ করলে আমরা চতুর্বর্গ লাভ করতে পারব।

একাধিক শিষ্য তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন থাকতেন। একজন শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করলেন—গুরুদেব, আপনি বলেছেন বাক্য এবং মনের অতীত হচ্ছেন নারায়ণ। তাহলে কীভাবে আমরা তাঁর সেবা করব? কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর চরণ বন্দনা করলে, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করবেন? এই কথা শুনে রোগাক্রান্ত যামুনাচার্য একটু হাসলেন। তারপর বললেন ভক্তের সেবা করলে ভগবানের সেবা করা হয়। ভক্তের কোনো কুল জাত নেই। তিনি হলেন ঈশ্বরের চলিষ্ণু বিগ্রহ। তোমরা সকলে সাধারণ মানুষের সেবা করবে, তাহলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে। চণ্ডাল কুলোৎভব তিরুপ্পানের কথা কি মনে নেই তোমাদের? তাঁর মতো ঈশ্বর অনুগত প্রাণ থাকা দরকার।

যামুনাচার্য আরো বললেন, শ্রেষ্ঠ ভক্তরা নিষ্ঠা ভক্তি সহকারে নারায়ণ এবং অন্যান্য দেবতার সেবা করে থাকেন। তিরুপ্পান আলোয়ার সারাজীবন শ্রীরঙ্গনাথের সেবা করেছেন। কাঞ্চীপূর্ণ বরদারাজের সেবায় নিবেদিত। তাঁরা সকলে মহাপুরুষ। তাঁদের পন্থা অনুসরণ করতে হবে। তারপর তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য তিরুবরাঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, রঙ্গনাথ ভক্ত তিরুপ্পান আলোয়ার আমার একমাত্র আশ্রয়। এই মুহূর্তে তাঁর কথা খুবই মনে হচ্ছে আমার। আমার কেবলই মনে হচ্ছে তিনি বোধহয় আমার ভবপারের কর্ণধার হবেন।

একথা শুনে তিরুবরাঙ্গ শোকসাগরে নিমজ্জিত হলেন। আপন ধীশক্তিবলে তিনি বুঝতে পারলেন যে আর বেশিদিন এই মহান ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অবস্থান করবেন না। তিনি বললেন, আপনি কি শরীর ত্যাগ করার বাসনা করেছেন? যামুনাচার্য বললেন, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই শরীর ত্যাগ করতে হয়, তাহলে তোমার মতো মহাপুরুষের তাতে ব্যথা পাবার কোনো কারণ নেই। মনে রাখবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা কিছু ঘটে তা পরম মঙ্গলজনক। অহংকারকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে বলি হিসাবে সমর্পণ করবে। অহংকার সর্বনাশের কারণ, একথা মনে রেখো। নিরহংকারী সকল সুখের মূল। নিরহংকারী পুরুষকে কখনো কোনো কর্ম বেঁধে রাখতে পারে না। যখন যে কাজ করবে, ফলের আশা করবে না। একটা কথা মনে রাখবে, তা হল, তোমার সমস্ত কাজের অন্তরালে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিরাজ করছেন।

দেখতে দেখতে আরো বেশ কিছুদিন কেটে গেল। শিষ্যরা এবার বুঝতে পারছেন অনতিবিলম্বে যামুনাচার্য দেহত্যাগ করবেন। একজন শিষ্য কাতর কণ্ঠস্বরে বললেন, হে প্রভু, আপনার অদর্শনে আমরা কার আশ্রয়ে অবস্থান করব? কে আমাদের এমন মধুর ভাষায় আশ্বস্ত করবেন?

এই কথা বলে তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। যামুনাচার্য বললেন—বৎস তোমরা কেউ উদ্বিগ্ন হয়ো না। শ্রীরঙ্গনাথ সদাসর্বদা তোমাদের পাশে থাকবেন। তিনি এতকাল তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও দেবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সর্বদা তাঁকে দর্শন করবে, মাঝে মধ্যে তিরুপতিতে গিয়ে বালাজিকে দেখে এসো আর কাঞ্চীপুরের বরদারাজকে দর্শন করবে। শ্রীরঙ্গম হল নারায়ণের ধাম, তিরুপতি নারায়ণের চরম শ্লোক এবং কাঞ্চীপুর তারকমন্ত্র।

মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে দগ্ধ করা হবে, নাকি সমাধিস্থ করা হবে এই বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু এই প্রশ্নের সংগত জবাব তাঁরা যামুনাচার্যের কাছ থেকে তখন পাননি। কারণ তখন যামুনাচার্য এক মহাসমাধিমগ্ন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত শরীর তখন একেবারে স্থির, অতি মন্দ ছন্দে নিঃশ্বাস

বাহিত হচ্ছে। উপস্থিত শিষ্যরা বুঝতে পারলেন এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি একদিন মহাসমাধিতে নিমগ্ন হবেন। সেই নিদ্রা আর ভাঙবে না।

পরদিন অনেকে এসে তাঁর পাশে বসলেন। চারিদিক জনাকীর্ণ হয়ে গেল। যামুনাচার্য বুঝতে পারলেন, উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁর মুখ নিঃসৃত অমৃত ভাষণ শুনতে চাইছে। তিনি বললেন, আমার অবর্তমানে তোমরা আত্মহত্যার সংকল্প ত্যাগ করবে। যে শরীর তোমরা দিতে পারবে না, তাকে হনন করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তোমাদের ওপর ঈশ্বরের অবিরাম স্নেহ আছে, তাই তিনি সদাসর্বদা তোমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ, ঈশ্বরের পাদপদ্মে সর্বদা কুসুম অঞ্জলি প্রদান করবে। গুরুর প্রদর্শিত মার্গে বিচরণ করবে। ভক্ত সেবার দ্বারা অহংকারকে নাশ করার চেষ্টা করবে।

এই যাত্রায় যামুনাচার্য সুস্থ হয়ে উঠলেন। শ্রীরঙ্গনাথের উৎসবে যোগ দিলেন। শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করলেন। আবার মঠে ফিরে এসে ধারাবাহিক ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। একদিন তিনি শাস্ত্রের রহস্য ব্যাখ্যা করছেন, এমন সময় কাঞ্চীপুর থেকে দুজন ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা লোকমুখে যামুনাচার্যের পীড়ার সংবাদ শুনেছিলেন, তাই তাঁকে দর্শন করার জন্য এসেছেন। তাঁদের দেখে যামুনাচার্য খুবই খুশি হলেন। রামানুজের সমাচার জানতে চাইলেন। এক ব্রাহ্মণ বললেন রামানুজ যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করেছেন। তিনি নিজেই শাস্ত্র আলোচনা করছেন। কাঞ্চীপূর্ণের নির্দেশ অনুসারে প্রতিদিন শালকূপ থেকে ঘট পূর্ণ করে জল আনেন।

এই কথা শুনে যামুনাচার্য খুবই আনন্দিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আটটি প্রণামশ্লোক রচনা করলেন। তারপর তাঁর প্রিয় শিষ্য মহাপূর্ণকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি রামানুজকে এখানে নিয়ে এসো। আমি জানি রামানুজের মধ্যে ঈশ্বর মহিমা লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর মনে সেই চেতনা আসেনি।

এই কথা শুনে মহাপূর্ণ কাঞ্চীপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

দু—চারদিন পরে যামুনাচার্য আবার অসুস্থ হলেন। শিষ্যরা আবার তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এবার তাঁর পীড়া যথেষ্ট বেড়ে গেল। এই অবস্থায় তিনি একদিন স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। রঙ্গনাথজিউকে দর্শন করলেন। প্রসাদ গ্রহণ করে মঠে ফিরে এলেন। শিষ্যমণ্ডলী মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করলেন। তিনি তাঁর গৃহস্থ ভক্তদের আনবার জন্য কয়েকজনকে পাঠালেন। ভক্তেরা মঠে উপস্থিত হলেন। তখন যামুনাচার্য বললেন, আমি যদি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত কোনো অন্যায় কাজ করে থাকি তাহলে তোমরা আমাকে ক্ষমা করবে।

সমবেত দর্শক এবং শিষ্যমণ্ডলী তাঁর মুখ—নিঃসৃত এই শব্দগুলি শুনে খুবই অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন এবার হয়তো যামুনাচার্য পৃথিবীকে বিদায় জানাবার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছেন।

যামুনাচার্য শিষ্যদের হাতে ঈশ্বর সেবার ভার অর্পণ করে বললেন— তোমরা প্রতিদিন নিয়মিত শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজির সেবা করবে। তাঁর প্রসাদী পুষ্প গ্রহণ করবে। তাহলে আর তোমাদের কোনো দুঃখ কষ্টের অধীন হতে হবে না। গুরুর প্রতি অটল ভক্তি বজায় রাখবে। অতিথিকে সেবা করবে।

গৃহস্থ ভক্তরা মঠ ছেড়ে নিজ নিজ গৃহের উদ্দেশে রওনা হলেন। যামুনাচার্য পদ্মাসনে উপবিষ্ট হলেন। সমস্ত চিন্তাকে এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করলেন। শিষ্যরা বুঝতে পারলেন যে তাঁর শেষ সময় সমাগত। তাঁরা সুমধুর স্বরে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লাগলেন। মৃদু মৃদু বাদ্যধ্বনির শব্দ শোনা গেল। বংশীর ধ্বনি সেই সংকীর্তনকে আরো সুমধুর করে তুলল। হঠাৎ এক আলোর জ্যোতি এসে যামুনাচার্যের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে দিল। অলৌকিক এবং ঐশ্বরিক বিভা তাঁর তনুবাহারে প্রস্ফুটিত হল। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখা দিল মৌন নীরবতা। সকলেই এই মহান মুহূর্তটির মাধুর্য অনুভব করলেন। ধীরে ধীরে যামুনাচার্য তাঁর মনকে হৃদয় থেকে ভ্রূ মধ্যে উত্থাপিত করলেন। তাঁর চোখ দিয়ে প্রবাহিত হল আনন্দের অশ্রু। সমস্ত শরীরে দেখা

দিল রোমাঞ্চ। অবশেষে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করলেন। সংকীর্তন থেমে গেল। শিষ্যরা উচ্চস্বরে রোদন করে উঠলেন। অনেকে এই শোক সংবরণ করতে না পেরে সাময়িক ভাবে সংজ্ঞা হারালেন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর শিষ্যদের শোক, আবেগ কিছুটা কমে এল। তাঁরা যামুনাচার্যের পুত্র পূর্ণকে সঙ্গে নিয়ে অন্তিমকর্ম সম্পাদনের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন।

এদিকে গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে প্রিয় শিষ্য মহাপূর্ণ কাঞ্চীপুর অভিমুখে পথে ছিলেন। তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সমস্ত দিন পথে পথে এগিয়ে চলছেন, রাতে কোনো এক গৃহস্থ কুটিরে বিশ্রাম নিতেন। কখনো কোনো বড়ো মানুষের অলিন্দে নিশি যাপন করতেন। দেখতে দেখতে চারটি দিন কেটে গেল। অবশেষে মহাপূর্ণ কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হলেন। বরদারাজকে দর্শন করলেন। তাঁর সঙ্গে মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের দেখা হল।

তখন সন্ধ্যা সমাগত। কাঞ্চীপূর্ণ মহাপূর্ণের মুখ থেকে তাঁর আগমনের কারণ জানতে পারলেন। সেই রাতে তাঁকে ওই আশ্রমে থাকতে অনুরোধ করলেন। সারারাত তাঁরা নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। মহাপূর্ণ শাস্ত্রের এক—একটি ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ পরম উল্লাস সহকারে তা ব্যক্ত করেন। অবশেষে প্রভাত হল। কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে মহাপূর্ণ এগিয়ে চললেন শালকূপের দিকে।

দূর থেকে কলসী কাঁধে রামানুজকে দেখা গেল। কাঞ্চীপূর্ণ বললেন, আমাকে এখন মন্দিরে যেতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি। আপনি রামানুজের কাছে গিয়ে আপনার বক্তব্য তাঁকে খুলে বলুন।

এই কথা বলে কাঞ্চীপূর্ণ সেখান থেকে চলে গেলেন। মহাপূর্ণ রামানুজকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, এই ব্যক্তি হলেন অনন্ত জ্ঞানের আধার। রামানুজকে দেখামাত্র তাঁর মুখ থেকে অসাধারণ সব স্তোত্র নিঃসৃত হতে লাগল।

ধীরে ধীরে রামানুজ আরো কাছে এলেন। মহাপূর্ণ তখনো বিহ্বল চিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে ভগবানের অশেষ বৈশিষ্ট্য বন্দনাসূচক শ্লোক উচ্চারণ করলেন।

তিনি যামুন রচিত আরো কয়েকটি শ্লোক পাঠ করলেন। যেতে যেতে এই শ্লোক শুনে রামানুজের গতি রুদ্ধ হল। তিনি মন দিয়ে ওই শ্লোকসমূহ শ্রবণ করতে লাগলেন। তারপর সেই বৃদ্ধ মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব অতুলনীয় শ্লোকের রচয়িতা কে? হয়তো তাঁকে আমি চিনি না, কিন্তু যাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত এই শব্দরাজি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম।

এক—একটি শ্লোকের মাধ্যমে তিনি বৈষ্ণবধর্মের এক—একটি বিষয়কে উদ্ভাসিত করেছেন। অনুগ্রহ করে বলুন, কি তার পরিচয়? আর আপনার পবিত্র শ্রীমুখ থেকে আজ প্রভাতে এই শ্লোক শোনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাই আপনাকেও আমি আমার প্রণাম নিবেদন করছি।

মহাপূর্ণ বললেন, এই শ্লোকসমূহ আমার প্রভু যামুনাচার্য কর্তৃক বিরচিত।

যামুনাচার্যের নাম শুনে রামানুজ আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করলেন, শুনেছিলাম তিনি পীড়াগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি এখন ভালো আছেন তো? আপনি কতদিন তাঁর সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত?

মহাপূর্ণ বললেন, আমি কিছুদিন আগেই তাঁর মঠে ছিলাম। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই তখন তিনি আরোগ্য লাভ করেছিলেন।

রামানুজ বললেন, আপনি এখানে কেন এসেছেন? আজ আপনি কোথায় ভিক্ষা করবেন? যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে আমার গৃহে ভিক্ষা করে আমায় কৃতার্থ করুন। এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

মহাপূর্ণ বললেন, যার জন্য মহর্ষি যামুনামুনি সদা সর্বদা চিন্তিত তাঁর থেকে কৃতার্থ আর কে আছেন? হে মহাত্মা, আমার প্রভুর আদেশেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

রামানুজ একথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, আমার মতো এক ক্ষুদ্রতর জীবকে সেই দেবতুল্য মহাপুরুষ স্মরণ করেছেন, এতে আমি ধন্য। আমার জন্ম সার্থক।

আমি কি তাঁর স্মরণের যোগ্য। কী অভিপ্রায়ে তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন তা খুলে বলবেন কি?

মহাপূর্ণ বললেন, আমার প্রভু আপনাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেইজন্যই তিনি আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। তাঁর শরীর নানা ব্যাধির আক্রমণে ক্রমশ জীর্ণ হচ্ছে। অবশ্য এখন তিনি একটু ভালো আছেন। তাই যদি তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে কালবিলম্ব না করে আমার সঙ্গে মঠ অভিমুখে যাত্রা করুন।

স্বয়ং যামুনাচার্য তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী, এই অভাবনীয় খবর শুনে রামানুজের আনন্দ দশ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হল। তিনি বললেন, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমি এই জলপূর্ণ কলসীটি মন্দিরে রেখে শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশে যাত্রা করব।

এই কথা বলে রামানুজ অতি দ্রুত মন্দির অভিমুখে গমন করলেন। মহাপূর্ণ এই আচরণ দেখে অবাক হলেন। যামুনাচার্যের প্রতি রামানুজের ওই অচলাভক্তির উৎস কোথায়? এমন শুদ্ধভক্তের সঙ্গে বাক্যালাপ করে তিনি নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করলেন। তিনি আবার যামুনাচার্য বিরচিত একটি স্তোত্র পাঠ করলেন। এই স্তোত্রের মাধ্যমে যামুনাচার্য বিষ্ণুর উপাসনা করেছেন। বিষ্ণুকে তিনি জগতের স্রষ্টা বা পালক রূপে বর্ণনা করেছেন।

রামানুজ সেখানে এলেন। তিনি যাত্রার জন্য তৈরি। মহাপূর্ণ প্রশ্ন করলেন বাড়িতে খবর দেবেন না? আপনার অবর্তমানে সাংসারিক কাজকর্ম ব্যাহত না হয় সেই বন্দোবস্ত করা উচিত।

রামানুজ বললেন আগে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের আজ্ঞাপালন, তারপর গৃহধর্ম। আমার মন যামুনাচার্যকে দর্শন করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। অনুগ্রহ করে আর বিলম্ব করবেন না। আমার কেবলই মনে হচ্ছে এখনই যাত্রা না করলে বড়ো দেরি হয়ে যাবে।

একথা শুনে খুব আনন্দ পেলেন মহাপূর্ণ। তিনি রামানুজকে আলিঙ্গন করে তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শন করলেন। তাঁরা মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অতি দ্রুত গন্তব্যস্থানের দিকে এগোতে থাকলেন। দিবাভাগে কোনো গৃহস্থের ভবনে ভিক্ষা করতেন। রাতে কারো অলিন্দে বিশ্রাম করতেন। চারদিন পরে তাঁরা কাবেরী তীরে অবস্থিত শ্রীশিরোপল্লিতে উপনীত হলেন। কালবিলম্ব না করে পরপারে এলেন। তারপর শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজিউর মন্দিরের নিকটবর্তী মঠের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেখানে গিয়ে অনেক মানুষকে দেখতে পেলেন। তাদের দেখে মহাপূর্ণ অবাক হয়ে গেলেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন এত মানুষের আগমনের কারণ কি?

একজন বললেন আর কী বলব, আজ পৃথিবী তার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নকে হারিয়েছে। মহাত্মা যামুনাচার্য মহাপ্রয়াত হয়েছেন।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রামানুজ শোকে অচেতন হলেন। তিনি সজোরে ভূতলে পড়ে গেলেন। মহাপূর্ণ তাঁর ললাটে করাঘাত করে বলতে লাগলেন, হে প্রভু, আপনি আপনার দাসকে কেন এভাবে বঞ্চিত করলেন? তাই কি আমাকে ছলনা করে কাঞ্চীপুরে পাঠিয়েছিলেন?

তিনি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে ধৈর্য লাভ করে সঙ্গাহীন রামানুজের দিকে তাকালেন। তখন জল এনে রামানুজের সমস্ত শরীরে সিঞ্চন করলেন। ধীরে ধীরে রামানুজের চৈতন্য ফিরে এল। মহাপূর্ণ বললেন, বৎস, জন্মিলে মরণ অনিবার্য। এই হল শাস্ত্রবাক্য। যা ভবিতব্য তা আমরা খণ্ডন করব কেমন করে? সবই নারায়ণের ইচ্ছা। যে মহাপুরুষের জন্য আমরা শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছি, তাঁর বাক্য অনুসারে ঈশ্বরের কাজই মঙ্গলময়, তিনি সর্বদা আমাদের ঈশ্বরের অনুগামী হতে বলেছেন। তিনি এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমাদের উচিত নয় তাঁর উপদেশের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা। চলুন সমাধিগর্ভে অদৃশ্য হওয়ার আগে সেই পবিত্র বিগ্রহকে শেষবারের মতো দর্শন করি।

রামানুজ এখন অনেকটা ধৈর্য লাভ করেছেন। তিনি মহাপূর্ণকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তাঁরা সশিষ্য আচার্য যামুনাচার্যের সেই মন্দিরের পাশে পৌঁছোলেন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি বুঝি এক দীর্ঘ নিদ্রায়

অভিভূত। কোনো এক পবিত্র পুরুষের হস্তস্পর্শে এই নিদ্রা ভেঙ্গে যাবে। মহাপূর্ণ গুরুর পদপ্রান্তে পড়ে তাঁর নয়নজলে পা দু—খানি ধুয়ে দিলেন। রামানুজ তখন বোধহয় কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। বাকরুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবহমান ঘটনাবলি তাঁর চিত্তে কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারছে না। শুধু তাঁর চোখ থেকে অবিরল ধারায় নির্গত হচ্ছে লবণাক্ত অশ্রু।

কিছুক্ষণ পরে তাঁদের শোকাবেগ কিছুটা প্রশমিত হল। রামানুজ স্থির চোখে সেই পরম পবিত্র বিগ্রহের শরীর দর্শন করতে থাকলেন। তিনি দেখলেন চির নিদ্রিতের মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় অভিব্যক্তি। মৃত্যুর তামসিক ছায়া সেই শরীরকে স্পর্শ করতে পারেনি। মৃত্যুর সাধ্য কি তাঁকে আঘাত করে? রামানুজ অনেকক্ষণ অনিমেষ নয়নে সদ্যপ্রয়াত যামুনাচার্যের মুখের পানে তাকিয়ে ছিলেন। তখন সেখানে সীমাহীন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। উপস্থিত জনমণ্ডলী একেবারে বাকরুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন সদ্যপ্রয়াত যামুনাচার্য এবং তাঁর জীবিত শিষ্য রামানুজের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে রামানুজ জানতে চাইলেন, দেখছি মহর্ষির ডান হাতের তিনটি আঙুল মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখনো কি এমনই থাকত?

শিষ্যরা বললেন, না, তাঁর আঙুলগুলি সাধারণ আঙুলের মতোই সহজভাবে থাকত। এখন এমনভাবে কেন জড়িয়ে আছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

এই কথা শুনে রামানুজ বললেন, আমি জানি কীভাবে এই আঙুলগুলি খুলে দিতে হবে। তিনি এক—একটি স্তোত্র উচ্চারণ করলেন। আর এক—একটি আঙুলও খুলে যেতে থাকল। চোখের সামনে এমন অভাবিত ঘটনা দেখে উপস্থিত জনমণ্ডলী একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে অদূর ভবিষ্যতে এই তরুণ রামানুজই যামুনাচার্যের স্থান অধিকার করবেন। এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকল না।

সমাধিগর্ভে দেহ স্থাপিত করতে হবে। তার আগেই রামানুজ কাঞ্চীপুরের দিকে যাত্রা করলেন। যামুনাচার্যের শিষ্যরা তাঁকে শ্রীরঙ্গনাজিউকে দর্শন করতে বললেন। কিন্তু অভিমান ভরে রামানুজ তাঁদের ওই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন না। ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন—হে ভগবান, আমার অভীষ্ঠ পূর্ণ করলেন না। যিনি আমার হৃদয়—সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেবতাকে চিরকালের জন্য হরণ করলেন, সেই নিষ্ঠুর ভগবানের মুখ আমি আর অবলোকন করব না।

এই কথা বলে কারো দিকে দিকপাত না করে তিনি স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করলেন। সেইদিন থেকেই তাঁর মুখমণ্ডলের হাসির রেখা চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি সদাসর্বদা শোকসাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় থাকতেন।

অনেকটা পথ পার হয়ে রামানুজ কাঞ্চীপুরে এসে উপস্থিত হলেন। মনে হল ওই ঘটনা বুঝি তাঁকে প্রাপ্তবয়স্কের গাম্ভীর্য দিয়েছে। বেশিরভাগ সময় নির্জনে একাকি অতিবাহিত করতেন। সহধর্মিণীর সঙ্গে আর আগের মতো হাস্যরসে মেতে উঠতে পারতেন না। সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্তায় মোহিত হয়ে থাকতেন। শুধু কাঞ্চীপূর্ণ এলে তিনি কিছুটা সময় ঐশ্বরীয় আনন্দের স্বাদ পেতেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, যামুনাচার্যের মহাপ্রয়াণ তাঁর হৃদজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করল। হয়তো এটাই ঈশ্বরের বিধান। নাহলে মহাপণ্ডিত এক মনীষীর জন্ম হবে কেমন করে? কেমন করে আমরা সেই রামানুজকে দেখব যিনি বেদান্ত দর্শনের এক নতুন ভাষ্য রচনা করে হাজার হাজার মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবেন।

ওই শোকাবহ ঘটনার ছ—মাস আগে রামানুজকে আর—এক ভয়ংকর দুঃখ পেতে হয়। যে মাতা কান্তিমতী তাঁর পুত্র ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারতেন না, তিনি স্বর্গারোহন করলেন। এই ঘটনাও রামানুজকে শোকসাগরে পতিত করেছিল। ধীরে ধীরে সময় কাটতে থাকে। রামানুজ পত্নী জমাম্বাই এখন

সংসারের কর্ত্রী। তিনি ছিলেন পরমাসুন্দরী। সর্বদা নিজের রূপলাবণ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কীভাবে যৌবনকে চিরকাল ধরে রাখা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন। অবশ্য তিনি রামানুজকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন।

কাঞ্চীমঠ থেকে ফিরে আসার পর রামানুজ সংসার কর্মে আর আগের মতো উৎসাহ প্রদর্শন করতে পারছিলেন না। এই বিষয়টি জমাম্বা লক্ষ করেন। জমাম্বা পতির এই নির্লিপ্ততাকে যথেষ্ট অশ্রদ্ধা করতেন। তিনি হয়তো এক সাধারণ পুরুষকে তাঁর স্বামী হিসাবে প্রার্থনা করেছিলেন। অথচ ভাগ্যদোষে তাঁকে কিনা রামানুজের মতো এক মানুষের জীবনসঙ্গিনী হতে হল। তবে জমাম্বা তাঁর দৈনন্দিন কার্যকলাপে এই বিরহের বিষয়টি কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। তাঁর হৃদয়ে অশান্তির আগুন জ্বললেও মুখের কথায় তা জানতে দিতেন না।

তখন রামানুজ বেশিরভাগ সময় থাকতেন মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের কাছে। রামানুজকে দেখে মনে হত পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ বোধহয় তাঁকে আশ্রয় করেছে। কাঞ্চীপূর্ণ তরুণ শিষ্যের মনোগত এই ব্যথার বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি বারবার রামানুজকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, 'মনে রেখো এই পৃথিবীতে আমরা কেউই চিরকালের জন্য আসিনি। আমরা একদিন এই পৃথিবীতে থাকব না। কিন্তু আমাদের কীর্তি থেকে যাবে। বরদারাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো। যেমন তুমি প্রতিদিন নিয়ম করে তাঁর সেবার জন্য জল আনছ, সেই কাজ চালিয়ে যাও। একমাত্র বরদারাজই তোমাকে তোমার শোকসাগর থেকে উদ্ধার করতে পারে।

এই পৃথিবীতে আমরা সবাই নির্দিষ্ট কাজের জন্য আসি। সেই কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার এক মুহূর্ত আমরা এখানে থাকতে পারি না। যামুনাচার্য ছিলেন এক মহান ব্যক্তি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। এখন তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। তিনি বিষ্ণুর কাছে পৌঁছে গেছেন। সেখানে গিয়ে নিত্যশান্তি লাভ করছেন। মনে রেখো তুমি তাঁর সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা কিন্তু এখনো পালন করা সম্ভব হয়নি। আশা করি আমার কথার অর্থ তুমি অনুধাবন করতে পারছ।

এই কথা শুনে রামানুজের মনোজগতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রামানুজ করজোড়ে বললেন, অনুগ্রহ করে আপনি আমায় শিষ্য হিসাবে স্বীকার করুন। আমি যেন আপনার সান্নিধ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বঞ্চিত না হই।

এই কথা বলে রামানুজ তাঁর চরণে প্রণত হলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি এমন ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তুমি ব্রাহ্মণ আর আমি শূদ্র, আমি কি তোমাকে আমার শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি? আমাদের শাস্ত্রে এই বিষয়ে নিয়মনীতি বড়ো কঠোর। সেই নিয়ম কখনো অমান্য করা উচিত নয়। তাহলে শাস্ত্রকে অমান্য করা হবে। শাস্ত্রে পরিষ্কার লেখা আছে জন্মসূত্রে একজন শূদ্র কখনো ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দান করতে পারবে না। তুমি যেন ভবিষ্যতে আর কখনো আমার সামনে এইভাবে প্রণিপাত কোর না। আমি জানি নারায়ণ তোমার জন্য এক উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করবেন। সেদিন আগতপ্রায়। তার জন্য এখন থেকে এত চিন্তা করে কী লাভ?

এই কথা বলে কাঞ্চীপূর্ণ মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলেন।

আর কাঞ্চীপূর্ণের এই প্রত্যাখ্যান রামানুজকে আরো বেশি চিন্তিত করে তুলল। রামানুজ মনে মনে ভাবলেন আমাকে কেন তিনি শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন না? আমি কি তাঁর শিষ্য হবার যোগ্য নই? আমি আজ থেকে তাঁর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে আত্মাকে পবিত্র করব। যে মানুষটি সারাজীবন তাঁর স্মৃতিসত্তার ভবিষ্যতের সঙ্গে বরদারাজকে সংযুক্ত করেছেন, বরদারাজের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো কিছু যিনি চিন্তা করতে পারেন না তাঁর জাতিকূল বলে কিছু হয় কি? জন্মসূত্রে মানুষ শূদ্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হতে পারে, কিন্তু কর্মসূত্রে আমরা তো ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতেই পারি।

এই কথা মনে করে রামানুজ সেদিন সন্ধ্যাবেলা কাঞ্চীপূর্ণের কাছে গেলেন। অনেক অনুনয় করে পরদিন তাঁকে নিজগৃহে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। কাঞ্চীপূর্ণ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমার মতো এক পরম ভক্তের অন্ন গ্রহণ করব। এতো আমার পরম সৌভাগ্য। শ্রীরামানুজ

গৃহে প্রত্যাবর্তন করে গৃহিণীকে সব কথা খুলে বললেন। তিনি মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণকে আগামীকাল নিমন্ত্রণ করেছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে জমাম্বা স্নান করে রান্নাশালে গিয়ে রান্না করতে শুরু করলেন। বেলা এক প্রহরের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে ফেললেন। রামানুজ তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এখনই কাঞ্চীপূর্ণকে নিয়ে আসতে হবে। তিনি তাঁর আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বরদারাজ সেবক কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের মনোগত বাসনার কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন এক মহান সাধক। তিনি যেকোনো মানুষের মনের ইচ্ছা জানতে পারতেন। তিনি অন্য পথ দিয়ে রামানুজের ভবনে উপনীত হলেন। জমাম্বাকে সম্বোধন করে বললেন—মা, আজকে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি মন্দিরে যেতে হবে। তোমার যা কিছু রান্না হয়েছে তাই আমাকে অর্পণ করো। আমি আর কালবিলম্ব করতে পারছি না। তোমার স্বামী কোথায়? জমাম্বা এই কথা শুনে বললেন—মহাত্মা, তিনি আপনার অন্বেষণেই গমন করেছেন। অনুগ্রহ করে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। যদি তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ না হয় তাহলে তিনি খুবই কষ্ট পাবেন।

কাঞ্চীপূর্ণ বললেন—না মা, আমি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না। আমি আমার প্রভুর সেবায় কখনো অবহেলা করিনি। আজও করব না।

জমাম্বা একথা শুনে খুবই চিন্তিত হলেন। পাছে অভ্যাগত কোনো কিছু আহার না করে চলে যান তাই তিনি যা কিছু রান্না হয়েছিল তাই পরিবেশন করলেন। বহু সমাদরে কাঞ্চীপূর্ণকে ভোজন করালেন। আহার শেষ হল। কাঞ্চীপূর্ণ স্বয়ং তাঁর উচ্ছিষ্ট দূরে নিক্ষেপ করলেন। তিনি স্থানটি পরিষ্কার করলেন। মুখশুদ্ধি করলেন। জমাম্বাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। গৃহিণী আহার্যের বাকিটুকু এক শূদ্রকে দিয়ে বাসনপত্র পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর রান্নাশাল সংস্কার করলেন। স্নান করে পরিশুদ্ধ হয়ে আবার রামানুজের জন্য রান্না করতে শুরু করলেন।

বেচারি রামানুজ এসব ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে না পেয়ে ব্যথিত মনে বাড়িতে ফিরে এলেন। বাড়িতে এসে দেখলেন তাঁর গৃহিণী আবার স্নান করে রান্নার কাজ শুরু করেছেন। যা কিছু রান্না হয়েছিল তার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। এবার রামানুজ বুঝতে পারলেন যে তাঁর অবর্তমানে কাঞ্চীপূর্ণ তাঁর গৃহে এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গেছেন। তবুও বিস্মিত হয়ে স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, কাঞ্চীপূর্ণ কি এসেছিলেন? তুমি আবার রান্না করছ কেন? সকাল থেকে এত পরিশ্রম করে এতসব পদ রান্না করলে সেগুলো কোথায়?

জমাম্বা বললেন—মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ এসেছিলেন। আমি তাঁকে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি মন্দিরে যাবেন বলে আর দেরি করতে রাজি হলেন না। শেষপর্যন্ত আমি তোমার অপেক্ষা না করে যা রান্না করেছিলাম তা তাঁকেই পরিবেশন করেছি। ভোজন সমাপ্তির পর তিনি স্বয়ং সমস্ত স্থান পরিষ্কার করলেন। যেটুকু ব্যঞ্জন অবশিষ্ট ছিল তা শূদ্র প্রতিবেশীদের দিয়েছি। আবার স্নান করে তোমার জন্য রান্না করছি। শূদ্রের ভুক্তাবশিষ্ট কি তোমাকে দেওয়া যায়?

রামানুজ সমস্ত বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—তোমার বিচারবুদ্ধি কবে হবে? তুমি মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করলে? আমার অদৃষ্টে সেই মহাপুরুষের প্রসাদ পাওয়া হল না। আমি নিতান্তই ভাগ্যহীন।

এই কথা বলে তিনি তাঁর মস্তকে কড়াঘাত করতে লাগলেন। গৃহত্যাগ করে সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষতলে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন। মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয়ই তার কোনো পাপ আছে তা না হলে এমন অঘটন ঘটবে কেমন করে? পরমুহূর্তে আর—একটি চিন্তা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করল। তিনি কাঞ্চীপূর্ণের ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হলেন। কাঞ্চীপূর্ণ কীভাবে তাঁর মনোগত বাসনার কথা আগে থেকে জানতে পারলেন?

কাঞ্চীপূর্ণ বরদারাজকে পূজা করতে করতে বললেন—প্রভু, এ তোমার কি ব্যবহার? আমি তোমার এবং তোমার ভক্তের দাস্য করে সারাজীবন অতিবাহিত করব? না হলে তুমি কেন আমাকে এক মহাপুরুষ করে

তুললে? রামানুজের অবতার শ্রীমান রামানুজ আমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে? আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনের জন্য সে আমাকে নিমন্ত্রণ করে? কোথায় আমি তোমাকে এবং তোমার ভক্তদের পুজো করে অনন্য সৌভাগ্য লাভ করব, আর সে কি না আমাকেই পুজো করতে চাইছে? অনুমতি করো, আমি তিরুপতিতে গিয়ে তোমার বালাজি রূপ দর্শন করি।

বরদরাজ আজ্ঞা দিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তিরুপতিতে পৌঁছে বালাজির সেবায় ছয় মাস অতিবাহিত করলেন। পরে একদিন নারায়ণ তাঁকে বললেন, কাঞ্চীপুরে গ্রীষ্মকালে খুব কষ্ট ভোগ করছি। তুমি সেখানে গিয়ে আমার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করো।

এই কথা শুনে কাঞ্চীপূর্ণ আবার কাঞ্চীপুরে ফিরে এলেন।

এসে গেল তৈলস্নান দিবস। দাক্ষিণাত্যবাসীরা প্রতি সপ্তাহে একদিন আপাতমস্তক তৈলসিক্ত হয়ে ঈষদোষ্ণ জলে স্নান করে। এই দিনটিকেই তৈলস্নান দিবস বলা হয়। সেদিন রামানুজের অঙ্গে এক শূদ্র তৈল মর্দন করতে এসেছিল। তাঁকে দেখে রামানুজের মনে অশেষ করুণার সঞ্চারণ ঘটল। তিনি গৃহিণীকে বললেন, যদি কালকের কিছু অন্ন থাকে তাহলে এই দরিদ্র দাসকে দাও, একে দেখে মনে হচ্ছে গত তিন—চারদিন এ বোধহয় কিছুই আহার করতে পারেনি।

গৃহিণী উত্তর করলেন, কোনো অন্ন আর নেই। এত সকালে খাবার কোথায় পাব?

এই কথা বলে তিনি স্নান করার জন্য গমন করলেন। রামানুজ তাঁর স্ত্রীর বাক্যে সন্দেহ প্রকাশ করে রন্ধনশালায় প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যথেষ্ট অন্ন রয়েছে। তিনি সেই অন্ন দাসকে দিয়ে তৈল মর্দন করতে অনুমতি দিলেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর হৃদয় সদাসর্বদা উদ্বিগ্ন থাকত।

কাঞ্চীপূর্ণ তিরুপতি থেকে ফিরে এসেছেন শুনে রামানুজ তাঁকে দেখার জন্য মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলেন। অনেকদিন পরে প্রিয় গুরুকে দেখে তাঁর মনে আনন্দের আর কোনো সীমা ছিল না। একে অন্যকে দেখে কুশল বিনিময় করলেন। তাঁরা দুজন শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হলেন। তারপর রামানুজ বরদসেবককে বললেন—মহাত্মা, কয়েকটি সন্দেহ আমার হৃদয়কে সদাসর্বদা উদ্বেলিত করে। আপনি আমার সেই সন্দেহ দূর করুন। তা নাহলে আমি শান্তি লাভ করতে পারব না। আমার মনে যে জ্বালা—যন্ত্রণা সে—কথা আমি আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব?

কাঞ্চীপূর্ণ বললেন, তোমার কোনো চিন্তা নেই, তোমার মনে কী চিন্তা আছে তা আমাকে নিবেদন করো। আমি বরদারাজের কাছে সব কথা পৌঁছে দেবো।

পরের দিন রামানুজ আবার কাঞ্চীপূর্ণের কাছে এলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বললেন—বৎস, গত রাতে তোমার সম্পর্কে বরদারাজ নানা কথা বলেছেন। এসো আমি সংক্ষেপে সেই কথাগুলি তোমার সামনে উদ্ঘাটিত করি।

এই কথা শুনে রামানুজ খুবই আনন্দ পেলেন। তাঁর মতো একজন সেবককে বরদারাজ মনে রেখেছেন এতেই তিনি খুশি হয়েছেন। সেইদিন কাঞ্চীপূর্ণ মারফত বরদারাজ ছয়টি বাণী প্রচার করেছিলেন। যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সর্বকলুষতা থেকে মুক্ত করতে চাই তাহলে এই বাণীগুলি আমাদের সদা—সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। বরদারাজ বলেছিলেন— (১) আমিই জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ পরব্রহ্ম। (২) হে মহামতে, জীব এবং ঈশ্বর ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। (৩) মুমূক্ষু ব্যক্তিগণের ভাগবৎ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই একমাত্র মুক্তির কারণ। বরদারাজ আরো বলেছিলেন, (৪) আমার ভক্তগণ অন্তিম সময়ে আমাকে স্মরণ করতে না পারলেও তাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ যাঁরা সারাজীবন ধরে বরদারাজের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করেছেন, তাঁরা মোক্ষ লাভ করবেন। বরদারাজের পঞ্চম বক্তব্য ছিল দেহত্যাগ হলে আমার ভক্তরা পরম্পদ প্রাপ্ত হবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বলেছিলেন, মানুষের উচিত সর্বগুণসম্পন্ন, মহাত্মা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করা।

এই ছটি আদেশ তিনি রামানুজকে বলতে বলেছিলেন।

এ কথাগুলি শুনে রামানুজের মনে এক আশ্চর্য ভাবের সঞ্চারণ ঘটে যায়। স্থান—কাল ভুলে তিনি পাগলের মতো আচরণ করতে থাকেন। তিনি অতি দ্রুত বরদারাজের মন্দির অভিমুখে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে বরদারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা নিবেদন করলেন। যে ছটি সন্দেহ তাঁর মনের মধ্যে ছিল, তা এখন একেবারে শেষ হয়ে গেল। তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে কিন্তু এই ব্যাপারগুলি সম্পর্কে কিছুই বলেননি। যেহেতু কাঞ্চীপূর্ণ এক মহাত্মা পুরুষ তাই তিনি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে প্রণাম করার জন্য এগিয়ে গেলেন। কাঞ্চীপূর্ণের কোনো নিষেধ তিনি শুনলেন না। তারপর নিজে প্রত্যাগমন না করে শ্রীরঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে মহাপূর্ণের কাছে দীক্ষা নিতে হবে। এটাই ছিল তাঁর একমাত্র অঙ্গীকার।

দশ

যামুনাচার্যের মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গমের মঠ আর আগের মতো শাস্ত্র আলোচনায় মুখরিত হয় না। যামুনাচার্য যেভাবে ছোটো ছোটো উদাহরণের মাধ্যমে শাস্ত্রের এক—একটি গূঢ় রহস্য ভক্ত সমক্ষে উত্থাপিত করতেন এখন আর কোনো বক্তা তেমন করতে পারেন না। এখন এই মঠের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন তিরুবরাঙ্গ। তিনি হলেন পরম ভাগবৎ। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর অসীম ব্যুৎপত্তি। কিন্তু শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তিনি খুব একটা উৎসাহ বোধ করেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় তাঁর ঈশ্বর আরাধনায়। সহজ সরল এই পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে সকলেই আসতে চান। তিনি কাউকে কোনো আদেশ করতে পারেন না। বরং নিজে অন্যের আদেশ পালনে তৎপর হয়ে ওঠেন।

এই মঠে বিবাহিত এবং অবিবাহিত দু—ধরনের ভক্তগণই থাকতে পারতেন। বিবাহিত ভক্তদের স্ত্রীগণ নিজ নিজ গৃহে অধিষ্ঠান করতেন। সময় ও সুযোগ মতো তাঁরা মঠে এসে নিজেদের স্বামীদের সান্নিধ্য লাভ করতেন। মঠের ভক্তগণ সারাদিন ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। সেখানে ঈশ্বর বিষয়ক নানা সংগীত পরিবেশিত হত। সন্ধ্যা সমাগমে একে একে অনেকগুলি প্রদীপশিখা জ্বলে উঠত। মঠাধ্যক্ষ স্বয়ং আরতি বন্দনায় অংশ নিতেন। ভক্তি গদগদ চিত্তে তাঁকে এভাবে আরতি করতে দেখে উপস্থিত জনমণ্ডলীর চোখে লবণাক্ত অশ্রুধারা নির্গত হত।

যে বৌদ্ধিক ব্যাখ্যার জন্য শ্রীরঙ্গম মঠের খ্যাতি দূর—দূরান্তে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, এখন আর সেইভাবে ব্যাখ্যা করার মতো কোনো মানুষ নেই। দেখতে দেখতে একটি বছর অতিবাহিত হল। একদিন তিরুবরাঙ্গ তাঁর ভক্তদের মিলিত করে বললেন—বন্ধুগণ, আমাদের প্রাণপুরুষ মহাত্মা যামুন মুনি পরম পদে লীন হবার পর একবছর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি পরলোক প্রাপ্তির পর আর আমরা সেই সুমধুর ভাষায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আর শ্রবণ করতে পারছি না। সেই মহাপুরুষ আমার মতো এক ক্ষুদ্র দাসের ওপর তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কিন্তু আমার মতো এক হীনবল ব্যক্তির পক্ষে এই জাতীয় শাস্ত্র আলোচনা করা কখনোই সম্ভব নয়। তোমাদের মনে থাকতে পারে যে মহামুনি দেহত্যাগের আগে কাঞ্চীপুরের রামানুজকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি মহাপূর্ণকে কাঞ্চীপুরে পাঠিয়েছিলেন। আমার মনে হয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব পণ্ডিতপ্রবর মহাপুরুষকেই এই দায়িত্ব দিতে হবে। তোমরা মনে রেখো তিনি কিন্তু আমাদের পরম প্রিয় গুরুদেবের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে পঞ্চসংস্কার যুক্ত করে দীক্ষা দান করে এখানে আনতে হবে। তিনি যামুন মুনির মতো সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করবেন। সমাধিস্থলে তাঁর প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং মুনিবরের মুষ্টি মোচনের দৃশ্য এখন আমি স্পষ্ট অবলোকন করতে পারি। রামানুজ যেভাবে এক—একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে মুনিবরের অঙ্গুলি প্রসারিত করেছিলেন, সেই ঘটনা আমি এই জীবনে কখনো ভুলব না।

সমবেত ভক্তমণ্ডলী তাঁর এই কথায় সন্তুষ্টি প্রদান করলেন। সকলে তাঁর মত অনুমোদন করলেন। শ্রীরঙ্গমে রামানুজকে দীক্ষা দেবার জন্য কাকে পাঠানো যায়? শেষপর্যন্ত সকলে মিলে স্থির করলেন মহাপূর্ণকেই এই মহাদায়িত্ব প্রদান করতে হবে। মহাপূর্ণ কাঞ্চীপুরে গিয়ে রামানুজকে দীক্ষা দিয়ে শ্রীরঙ্গমে নিয়ে আসবেন।

মঠাধ্যক্ষ বললেন, যদি আপাতত রামানুজ কাঞ্চীপুরের বসবাস ত্যাগ করতে রাজি না হন তাহলে তাঁকে এখানে আসতে অনুরোধ কোরো না। তবে আমার বিশ্বাস শ্রীরঙ্গনাথের একান্ত ইচ্ছায় তাঁকে এখানে আসতেই হবে। হয়তো আজ তিনি আসবেন না। কিন্তু আগামীকাল তাঁর মত পরিবর্তিত হবেই। তুমি তাঁকে তামিল প্রবন্ধ অধ্যয়ন করে তাঁকে বিশেষ পারদর্শী কোরো। আমার মনে হয় এজন্য তোমাকে অন্তত একবছর কাঞ্চীপুরে থাকতে হবে। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি তোমার অনুগামিনী সহধর্মিণীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে একটা কথা, রামানুজ কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। তিনি যদি জানতে পারেন যে তাঁকে এখানে আনবার জন্য আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি, তাহলে তিনি কখনোই এখানে আসবেন না। তুমি মহাপণ্ডিত, তুমি এর আগে অনেক দুরূহ কার্য সমাধান করেছ। তোমার বিবেক, বুদ্ধি এবং ধৈর্যের ওপর আমাদের অশেষ আস্থা আছে।

এইভাবে তিনি সেখানে উপবিষ্ট মহাপূর্ণকে সস্ত্রীক কাঞ্চীপুরে যাবার জন্য আদেশ করলেন। মহাপূর্ণ এই আদেশ অনুসারে কাঞ্চীপুরের অভিমুখে গমন করলেন।

ধীরে ধীরে দিন দুই কেটে গেল। তারা মদুরান্তক নগরে উপনীত হলেন। সেখানে এক বিশাল শ্রীবিষ্ণু মন্দিরের অবস্থান। মন্দিরের সামনে একটি সুবৃহৎ সরোবর। সেই সরোবরের তীরে তিনি যখন সস্ত্রীক বিশ্রাম করছিলেন, তখন অবাক হয়ে দেখলেন যে, রামানুজ স্বয়ং এসে তাঁর পাদবন্দনা করছেন। কী আশ্চর্য, এই রামানুজকে আনবার জন্যই তিনি মঠ ত্যাগ করে কাঞ্চীপুর অভিমুখে গমন করেছেন! রামানুজকে এক মুহূর্ত দেখবার জন্য সদাসর্বদা তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়। আর স্বয়ং রামানুজ কিনা তাঁর সান্নিধ্যেই আছেন! তিনি সঙ্গে সঙ্গে রামানুজকে গাঢ় আলিঙ্গন করে বললেন, বৎস আমি ভাবিনি আজ তোমাকে এখানে দেখতে পাব। সবই শ্রীরঙ্গমের কৃপা। তুমি কেন এখানে এসেছ?

রামানুজ বললেন, সত্যিই নারায়ণের আদেশে এইসব ঘটনা ঘটে যায়। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। আমি আপনার এই শ্রীপাদপদ্ম লক্ষ্য করে কাঞ্চীপুর ত্যাগ করেছি। বিধাতা অল্প আয়াসেই আমাদের মিলন ঘটিয়ে দিলেন। শ্রীকাঞ্চীপূর্ণের মুখ দিয়ে সাক্ষাৎ বরদারাজ আপনাকেই আমার গুরু হিসাবে স্থির করেছেন। এতদিন পর্যন্ত আমার মনে যে অস্থির ভাব ছিল তা সকলই দূরীভূত হয়েছে। আপনি অবিলম্বে আমাকে শাস্ত্রসম্মত প্রথা অনুসারে দীক্ষা দান করুন।

মহাপূর্ণ বললেন, চলো আমরা সবাই কাঞ্চীপুরে গিয়ে বরদারাজের কাছে এই শুভ পূর্ণকর্মশোভিত কর্ম সুসম্পন্ন করি।

রামানুজ বললেন, মহাত্মা আমি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে রাজি নই। দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে মৃত্যুর কোনো সময়—অসময় জ্ঞান নেই। মানুষ নিদ্রিত হউক বা ভোজন করুক, পথেই গমন করুক, যুবক হোক বা বালক হোক মৃত্যু সকল অবস্থাতেই তাকে নিজের বশে নিয়ে আসে।

আমি আপনার সঙ্গে কত আশা করে যামুন মুনিকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিধাতা আমার সেই আশা পূর্ণ করেননি। এখন তাঁকে বিশ্বাস কী? আপনি এই মুহূর্তে আমাকে আপনার পদতলে আশ্রয় দিন। তা না হলে হয়তো বড়ো দেরি হয়ে যাবে।

মহাপূর্ণ রামানুজের এই বৈরাগ্যপূর্ণ কথা শুনে অবাক হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে রামানুজ কতবড়ো পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বিষ্ণু মন্দিরের সন্নিকটস্থ ওই সরোবরের তীরে অবস্থিত এক বহু শাখা—প্রশাখা বিশিষ্ট বকুল তরুর নীচে বসে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করলেন। তার মধ্যে দুটি আয়েষী মুদ্রা স্থাপন করলেন। একটি চক্র চিহ্নিত এবং অপরটি শঙ্খ চিহ্নিত। এই মুদ্রা দুটি উত্তপ্ত হল। মহাপূর্ণ তখন উপযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে চক্র চিহ্নিত মুদ্রার দ্বারা রামানুজের দক্ষিণ বাহুমূল এবং শঙ্খ চিহ্নিতের দ্বারা তাঁর বাম বাহুমূল অঙ্কিত করলেন। পরবর্তীকালে তিনি যামুনাচার্যের শ্রীচরণে ধ্যান করে তাঁর দক্ষিণ কর্ণে বৈষ্ণবমন্ত্র অর্পণ করলেন। সেই মুহূর্তে রামানুজের সমস্ত সত্তায় এক আশ্চর্য আলোড়নের জন্ম হল। রামানুজের মনে হল স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সব বুঝি একাকার হয়ে গেছে। জল—স্থল—অন্তরীক্ষ জুড়ে শুধু শ্রীবিষ্ণুরই নামগান ধ্বনিত হচ্ছে। এইভাবে দীক্ষিত হয়ে শ্রীবিষ্ণুর বন্দনা করে রামানুজ গুরু এবং গুরুপত্নীর সঙ্গে কাঞ্চীপুর অভিমুখে গমন করলেন।

কাঞ্চীপূর্ণের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে গেছে যে, মহাপূর্ণ কাঞ্চীপুরে এসেছেন। তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হলেন। রামানুজের অনুরোধে মহাপূর্ণ তাঁর পত্নী জমাম্বাকেও শঙ্খ এবং চক্র দ্বারা অঙ্কিত করেছিলেন। এইভাবে পতি এবং পত্নী দুজনেই মহাপূর্ণের সেবক হিসাবে পরিগণিত হলেন। শাস্ত্রসম্মত উপায়ে দীক্ষিত হয়ে তাঁরা মহাপূর্ণের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করলেন। রামানুজ তাঁর গৃহের অর্ধাংশ মহাপূর্ণের আবাসবাটি হিসাবে প্রদান করলেন। মহাপূর্ণের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি হাসিমুখে বহন করতে লাগলেন। তখন থেকে প্রতিদিন প্রাতঃকাল থেকে তিনি মহাপূর্ণের পদপ্রান্তে বসে তামিল প্রবন্ধ পাঠ করতে লাগলেন। তামিল প্রবন্ধমালার মধ্যে শাস্ত্রের নানা আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। ওই প্রবন্ধগুলি পাঠ করতে করতে রামানুজের বৌদ্ধিক সত্তা আরো চেতনসমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এতদিন পর্যন্ত শাস্ত্রের যে দুরূহ এবং গূঢ় বিষয়গুলি তিনি আয়ত্ত করতে পারছিলেন না, এখন সবই করতে পারলেন। রামানুজের সমস্ত তনুবাহার থেকে এক আশ্চর্য জ্যোতিপ্রভা নির্গত হত। তা দেখে উপস্থিত জনমণ্ডলী একেবারে অবাক হয়ে যেতেন। রামানুজ যে স্বয়ং ঈশ্বরের সেবক এবং দাস এই বিষয়টি তাঁদের মনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হল।

এগারো

দেখতে দেখতে ছ—টা মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। একদিন মহাপূর্ণ এবং রামানুজ উভয়ই গৃহ থেকে বাইরে বের হয়েছেন। জমাম্বা স্নান সমাপন করে রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত। কলসী নিয়ে নিকটবর্তী কূপে গেলেন জল আনতে। মহাপূর্ণের স্ত্রীও রান্নার জল আনবার জন্য কলসী নিয়ে সেই একই কূপে গিয়েছিলেন।

তাঁরা নিজেদের কলসী কূপে নিক্ষেপ করলেন। কলসী পূর্ণ হলে দড়ি দ্বারা তা উত্তোলন করতে লাগলেন। এইসময় মহাপূর্ণ—ভার্জার কলসী থেকে কয়েক বিন্দু জল জমাম্বার কলসীতে পতিত হল। চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখে তিনি গুরুপত্নীকে কঠিন কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনার অসাবধানতায় আমার এক কলসী জল নষ্ট হয়ে গেল। আপনি গুরুপত্নী বলে কি সবসময় এইভাবে আমাদের ওপর অত্যাচার করবেন?

এই কথা শুনে মহাপূর্ণের স্ত্রী খুবই লজ্জিত হলেন। তিনি ছিলেন শান্ত স্বভাবের এবং সুশীলা প্রকৃতির। তাঁকে কেউ কখনো কারো প্রতি কটু বাক্য প্রদর্শন করতে দেখেনি। তিনি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাঁর মনে এই ঘটনা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল। সামান্য কারণে তাঁকে আজ এতখানি অপমানিতা এবং লাঞ্ছিতা হতে হল। বাড়িতে ফিরে এসে কলসী মাটিতে রেখে নীরবে কাঁদতে লাগলেন।

কিছু পরে মহাপূর্ণ সেখানে এসে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর পত্নীকে এইভাবে ক্রন্দন করতে দেখে খুবই অবাক হলেন। এর আগে কখনো তিনি তাঁর পত্নীকে কাঁদতে দেখেননি। তাঁর পত্নী সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে সম্পাদন করেন। মহাপূর্ণর কাছে তিনি সব কথা খুলে বললেন। তখন মহাপূর্ণ বললেন, ঈশ্বরের আর ইচ্ছা নয় যে আমরা এখানে অবস্থান করি। তাই তিনি জমাম্বার মুখ দিয়ে তোমাকে এত রূঢ় কথা শুনিয়েছেন। জীবনের কোনো ঘটনায় কখনো দুঃখ প্রকাশ করবে না। জেনে রাখবে আমাদের সমস্ত ঘটনাবলি এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভগবান যা করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য করেন। চলো আমরা আর কালবিলম্ব না করে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনের জন্য গমন করি। কতদিন হয়ে গেল তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি পুজো করিনি। হয়তো সেইজন্যই তিনি এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করলেন যাতে আমরা কাঞ্চীপুর ত্যাগ করতে পারি।

ওই মহাপুরুষ তাঁর পত্নীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। রামানুজের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করলেন না। আসলে যে মুহূর্তে তাঁর মনে শ্রীরঙ্গনাথের পাদপদ্মের কথা এসেছে, তিনি জগৎ সংসারের সবকিছু ভুলে গেছেন। এমনই ঈশ্বরপ্রাণ ছিলেন ওই মহাত্মা মানুষটি।

দীক্ষিত হবার পর রামানুজের সকল মনোকষ্ট এক লহমায় দূরীভূত হয়ে যায়। তারপর থেকে আমরা অন্য এক রামানুজকে দেখতে পেলাম। এই রামানুজ সংসারের বিষয়গুলির প্রতি সদাসর্বদা চরম নির্লিপ্তি প্রকাশ করেন। শাস্ত্র আলোচনায় মগ্ন থাকতে ভালোবাসেন। সন্ন্যাস সঙ্গে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন। পঞ্চ সংস্কারকে

বারবার অনুসরণ করেন। যজ্ঞ, অঙ্কন, ঊর্ধ্বপুন্ড্র, মন্ত্র এবং দাস্যনাম—এই পাঁচটি হল একজন সাধকের পক্ষে অবশ্য পালনীয় পাঁচটি সংস্কার। রামানুজ শাস্ত্র নিয়ম অনুসারে ধারাবাহিকভাবে এই সংস্কারগুলিকে পালন করলেন। মহাপূর্ণের মতো এক মহাত্মা মানুষের আশীর্বাদ তাঁর মস্তকে স্থাপিত হয়েছে, তাই নিজেকে বিশ্বের সবথেকে সুখী মানুষ বলে ভাবেন। ঈশ্বরের অসীম এবং অপার অনুগ্রহে এমন ঘটনা ঘটে গেছে। রামানুজ সদা সর্বদা শান্তভাবে থাকতেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে যেতেন। তিনি কখনো কারো প্রতি সামান্যতম ঈর্ষা পোষণ করতেন না। কখনো কেউ তাঁকে রূঢ় বাক্য বলতে শোনেননি। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি বুঝি চলমান এক ঈশ্বর।

গুরুকে ঈশ্বরের তুল্য বলে ভক্তি করতেন রামানুজ। গুরুর ভূক্তাবশিষ্ট গ্রহণ না করে কখনো আহার সমাপন করতেন না। সকালে উঠে আগে গুরুকে প্রণাম নিবেদন করতেন। তারপর সেই মহাত্মার পদপ্রান্তে বসে পরম ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে তামিল প্রবন্ধমালা আত্মস্থ করার চেষ্টা করতেন। ছ—মাসের মধ্যেই তিনি বিশাল সাহিত্য সমুদ্রে অবগাহন করলেন। পড়ে ফেললেন পোইহে রচিত একশত স্তোত্র। প্রতিটি স্তোত্রের টীকা কণ্ঠস্থ করলেন। পূদত্ত রচিত একশত স্তোত্র তাঁর মনে রইল। পে—র লেখা একশতটি পরিচ্ছেদ পাঠ করলেন। এর পাশাপাশি তিনি পেরিয়া আলোয়ার রচিত ৪৭৩টি প্রবন্ধমালা পড়ে ফেললেন। অন্ডাল, কূলশেখর, তিরু মড়িশি, তিরুপ্পান, নম্মা আলোয়ার প্রমুখের লেখা প্রায় চার হাজার ভক্তিরসে পরিপূর্ণ শ্লোক মহাপূর্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করলেন। এই সব শ্লোক তামিল অধ্যাত্ম সাহিত্যকে এক অন্য মর্যাদা এবং ব্যঞ্জনা দিয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম আদিম ভাষা হল তামিল ভাষা। এই ভাষাটি আজও জীবন্ত আছে। তামিলনাড়ুর বাসিন্দারা তাঁদের এই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্য যথেষ্ট গৌরববোধ করে থাকেন। রামানুজ এই তামিল সাহিত্য—সমুদ্রে অবগাহন করে অনাস্বাদিত আনন্দ লাভ করলেন। এই সমস্ত শ্লোকমালাকে তামিল ভাষায় তিরুবাই—মুড়ি বলে। রামানুজ দীর্ঘ প্রয়াসে এই শাস্ত্রটি সমাপ্ত করেছেন। তাঁর মনে অনেকদিন একটি সুপ্ত বাসনা ছিল, শাস্ত্রপাঠ সমাপনান্তে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দেবেন। মহাপূর্ণ দিনের পর দিন তাঁকে যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন তা অকল্পনীয়। মহাপূর্ণ প্রতিটি শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনুগত ছাত্রের মতো রামানুজ তা শ্রবণ করে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। আজ সেই গুরুদক্ষিণার পবিত্র মুহূর্তটি উপস্থিত। তাই রামানুজ বাজারে গিয়ে ফল, ফুল, নববস্ত্র প্রভৃতি কিনেছেন। তিনি আজ গুরুদম্পতিকে ষোড়শ উপাচারে পুজো করবেন আর এভাবেই তাঁর মনোগত বাসনা চরিতার্থ করবেন। এমন সংকল্প করে অতি দ্রুত গৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু গুরুগৃহে প্রবেশ করে অবাক হয়ে দেখলেন যে সেখানে মহাপূর্ণ অথবা তাঁর স্ত্রী কেউই নেই। তিনি চারপাশ পর্যবেক্ষণ করলেন, অবশেষে এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, মহাপূর্ণ তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশে গমন করেছেন।

এমন গমনের কারণ কী তা জানতে ইচ্ছা হল রামানুজের। তিনি পত্নীর কাছে গিয়ে সবিশেষ জানতে চাইলেন। পত্নী বললেন, আজ সকালে কূপে জল আনতে গিয়ে গুরুপত্নীর সঙ্গে আমার কলহ হয়েছিল। আমি তোমার গুরুপত্নীকে উদ্দেশ করে কোনো কটূবাক্য বলিনি। কিন্তু তাতে তাঁদের এত ক্রোধ হল যে তাঁরা এই দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন। আমরা জানি একজন সন্ন্যাসী সদাসর্বদা ক্রোধকে দমন করেন। তিনি কী ধরনের সাধু? সাধারণ মানুষের মতো এত ক্রোধ থাকলে কি চলে?

এই কথা শুনে রামানুজ সমস্ত বিষয় বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করলেন। তিনি বললেন, তোমার মুখদর্শন করলেও পাপ হয়। এই কথা বলে ফল, বস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে বরদারাজের অর্চনা করার জন্য তাঁর মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলেন।

একটু পরে এক শীর্ণ কলেবর ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ রামানুজ—গৃহিণীর কাছে কিঞ্চিৎ অর্থ ভিক্ষা করলেন। চুল্লির উত্তাপে জমাম্বার সমস্ত শরীরে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছিল। তাই ভিক্ষুকের প্রার্থনা তাঁর মোটেই ভালো লাগল না। তিনি চিৎকার করে বললেন, অন্য কোথাও যাও, এখানে কে তোমাকে অন্ন দেবে? জমাম্বার অতি রূঢ় বাক্যে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অপমানিত হলেন।

ব্রাহ্মণ দুঃখিত মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বরদারাজের মন্দিরের দিকে গমন করলেন। পথের পাশে মন্দিরটিতে ফিরে আসা রামানুজের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি ব্রাহ্মণের শীর্ণ কলেবর দর্শন করে বুঝতে পারলেন যে এই ব্রাহ্মণ কয়েকদিন অভুক্ত অবস্থায় আছেন। তিনি শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন, মহারাজ আপনার নিশ্চয়ই আহার হয়নি?

বিপ্র বললেন, আমি আপনার গৃহে অতিথি হিসাবে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার স্ত্রী আমাকে অন্ন দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছি। জানি না আজ সারাদিন কোথাও অন্ন পাব কি না।

রামানুজ বললেন, না, আপনাকে ফিরতে হবে না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনার হাতে নানা ধরনের ফল তুলে দেবো। শুধু তাই নয়, একটি নতুন বস্ত্রও আপনাকে দেবো। তা নিয়ে আপনি আমার পত্নীর হাতে দেবেন। তাকে বলবেন যে তার পিতার কাছ থেকে আপনি আসছেন। তাহলে আমার পত্নী আপনাকে যথেষ্ট সমাদর করে মধ্যাহ্নভোজন করাবেন।

রামানুজ দোকান থেকে সেইসব কিনে ওই ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন। আর নিজের শ্বশুরের নাম লিখে একখানি চিঠি পাঠালেন—বৎস, আমার দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ অতি শীঘ্রই সুসম্পন্ন হবে। তাই তুমি জমাম্বাকে এই লোকের সঙ্গে আমার ভবনে পাঠিয়ে দাও। আর যদি তোমার হাতে তেমন কোনো কাজ না থাকে তাহলে তুমিও এখানে এসো। জমাম্বা না এলে আমাকে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। কারণ বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম ঘটবে। তোমার বৃদ্ধা শাশুড়িমাতার পক্ষে তাদের আপ্যায়ন করা সম্ভব হবে না।

এই পত্রটি তিনি ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন। তারপর ব্রাহ্মণকে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। ব্রাহ্মণ রামানুজের কথামতো জমাম্বার কাছে হাজির হলেন। বললেন, আপনার পিতা আমায় পাঠিয়েছেন।

জমাম্বা এই কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হলেন। সন্ন্যাসীর জন্য উপযুক্ত তামাক কিনে দিলেন। এবার রামানুজ ঘরে ফিরে এলেন। অতি বিনীতভাবে চিঠিখানা জমাম্বা রামানুজের হাতে অর্পণ করে বললেন, আমার পিতা তোমাকে এই পত্র দিয়েছেন।

রামানুজ পত্রখানি পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমার কাজ আছে, আমি গেলে কাজের ক্ষতি হবে। তুমি খাওয়া—দাওয়া করে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ি চলে যাও। কাজ শেষ হলে আমিও যাবার চেষ্টা করব। তুমি গিয়ে আমার শ্বশুর ও শাশুড়িকে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করবে।

খাওয়া শেষ হল। জমাম্বা রামানুজকে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি বাপের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। রামানুজ গৃহত্যাগ করে মন্দির অভিমুখে চললেন। পথে যেতে যেতে রামানুজ অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে বার বার উচ্চারণ করলেন যে অনেক কষ্টে ওই পাপিষ্ঠা রমণীর কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছি। হে নারায়ণ, এই জীবনে আমাকে যেন আর কখনো তার মুখদর্শন করতে না হয়। এখন থেকে আপনিই হবেন আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

কিছুক্ষণ বাদে বরদারাজের কাছে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর বললেন, হে নাথ, আজ থেকে আমি সদাসর্বদা শুধু আপনার পূজা করব। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।

তারপর তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করলেন। হাতে একটি দণ্ড নিলেন। বরদারাজের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে মন্দিরের সামনে অনন্ত সরোবর তীরে পৌঁছে গেলেন। স্নান করলেন। তারপর আগুন জ্বেলে তার মধ্যে সমস্ত এষণা আহূতি দিলেন। এই সময় কাঞ্চীপূর্ণ তাঁকে যাতিরাজ বলে সম্বোধন করেছিলেন। রামানুজ মনোগত সমস্ত কামনা বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে শ্রীদণ্ড গ্রহণ করলেন। অরুণ বসনধারী যাতিরাজকে দেখে মনে হল তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল বুঝি সহস্র সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়েছে। সেদিন আমরা এক নতুন রামানুজকে পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করতে দেখলাম। যে রামানুজ শাস্ত্রের এক নবব্যাখ্যা হাজার হাজার তৃষ্ণাতুর

মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। ভবিষ্যতে যিনি হবেন ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তার আকাশে এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা।

বারো

এইভাবে স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। অনেকে বলে থাকেন তাঁর মতো এক মহান মানুষের পক্ষে এমন কাজ করা অনুচিত হয়েছে। এই তর্ক—বিতর্কের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলতে হবে যে রামানুজ মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর এই আলোকিত জীবন যেন হাজার হাজার মানুষের মনের মলিনতা দূর করতে পারে। এই মহৎ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য তিনি যদি সত্য কথা স্ত্রীকে উত্থাপিত করতেন, তাহলে এক অনর্থ কলহ দেখা দিত। এমন সাংসারিক অশান্তি হত যার পরিপ্রেক্ষিতে রামানুজ হয়তো সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প পালন করতে পারতেন না। সর্বসাধারণের হিতার্থে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্ব ইতিহাসে তাঁর মতো এমন অনেক মহান পুরুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা এইভাবে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা বলব। একসময় তিনি তাঁর সাধনার মাধ্যমে সমগ্র ভারতে ভক্তিমার্গের এক নতুন দিশা এনে দেন। তিনিও যখন গৃহত্যাগ করেন তখন সেই কথা তাঁর স্ত্রীকে জানাননি। তিনি তাঁর জননী শচীদেবীকে এই অভিপ্রায়ের কথা জানিয়েছিলেন। যদিও তাঁর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন এক পতিভক্তিপ্রাণা নারী। পতির সুখই নিজের সুখ বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে নবদ্বীপের নিমাই সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবনের ওপর আলোকপাত করলেও একই ঘটনা দেখতে পাই। তিনি মধ্যরাতে নিদ্রিতা স্ত্রী এবং নিদ্রিত শিশুপুত্রকে ফেলে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেন।

এর পাশাপাশি যদি আমরা জমাম্বার কথা ভাবি তাহলে দেখব তিনি কিন্তু সেই ধরনের পতিপরায়ণা ছিলেন না। বেশ কয়েকবার তিনি স্বামীর আদেশ শিরোধার্য করেননি। তাই জমাম্বাকে ছলনা করে রামানুজ যে গৃহত্যাগ করলেন তাঁর এই কাজের মধ্যে আমরা নিন্দার কোনো কিছু দেখছি না।

রামানুজ কোন সম্প্রদায়ের অনুবর্তী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গবেষকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি অদ্বৈত সম্প্রদায়ের অনুবর্তন করেননি। বাল্যকাল থেকেই এই বিষয় নিয়ে গুরু যাদবপ্রকাশের সঙ্গে মতপার্থক্য হত। তিনি একাধিকবার যাদবপ্রকাশ প্রদত্ত ব্যাখ্যা ভাষ্যের বিরোধিতা করেছেন। তা নিয়ে অনেক অনভিপ্রেত ঘটনাও ঘটে গেছে। আবার তিনি শ্রীশঙ্কর সম্প্রদায়ভূক্ত কোনো সন্ন্যাসীকেও তাঁর গুরু হিসাবে বরণ করেননি। বরং বলা যেতে পারে সাক্ষাৎ সনাতন বরদারাজই ছিলেন তাঁর গুরু। রামানুজ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। তিনি সংসারে বাস করেও সংসারের প্রতিটি বস্তুর প্রতি চরম নির্লিপ্তি প্রদর্শন করতে পারতেন। সদাসর্বদা গুরুর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাই তাঁর পক্ষে সাংসারিক ক্রিয়াকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। সংসার ত্যাগ করেই তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের বার্তা গ্রামবাসীদের কানে পৌঁছে গেল। তাদের মধ্যে অনেকে রামানুজের এই সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। যুবতি ভার্যা গৃহে থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করলেন? ভোগপরায়ণ মানুষ তাঁর এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। অনেকে তাঁকে একজন হঠকারী বলে চিহ্নিত করলেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে এক অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা করলেন। তাঁকে দেখার জন্য গ্রাম গ্রামান্তর থেকে অসংখ্য মানুষ এসে ভিড় করতে লাগলেন।

মঠবাসীরা তাঁকে অধ্যক্ষ পদে বরণ করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বৈদগ্ধ্য সম্পর্কে সকলেই অবগত ছিলেন। তবে কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন একথা সত্য। বেশির ভাগ আশ্রমিকই কিন্তু তাঁকে সাদরে গুরু বলে স্বীকার করে নেন। একে একে তাঁর কাছে এসে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা নেন। এলেন দাশরথি নামে তাঁর এক ভাগ্নে। তিনি ছিলেন বেদ—বেদান্ত বিশারদ। বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্র অনর্গল উচ্চারণ করতে

পারতেন। হরির প্রতি ছিল তাঁর অকৃপণ ভালোবাসা এবং ভক্তি। পরবর্তীকালে তাঁর দ্বিতীয় শিষ্য হলেন কুরেশ নামে এক মহানুভব যুবক। তিনিও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। যা একবার শ্রবণ করতেন, সেই বাক্যগুলি তাঁর হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকত। মুখে মুখে অসংখ্য শ্লোক উচ্চারণ করতে পারতেন। এই দুই শিষ্যের সঙ্গে রামানুজ শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁর মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করে সুখসাগরে অবগাহন করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করতেন। রামানুজ সহজ, সরল উদাহরণের মাধ্যমে শাস্ত্রের একটি দুরূহ বিষয়কে প্রাঞ্জল ভাবে ও ভাষায় উত্থাপন করতেন। তিনি অযথা পাণ্ডিত্য কখনো প্রদর্শন করতেন না। রামানুজ চেয়েছিলেন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা যেন নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে যায়। সৌভাগ্যের বিষয় শাস্ত্র বিষয়টিকে কয়েকজন কুচক্রী মানুষ কুক্ষিগত রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা এর মাধ্যমে নিজেদের জীবন ও জীবিকা পরিচালনার চেষ্টা করেন। অথচ শাস্ত্র হল এক বিশাল সমুদ্রের মতো। সমুদ্রে যেমন যেকোনো সম্প্রদায়ের মানুষ অবগাহন করার সুযোগ পান, শাস্ত্র—সমুদ্রেও এইভাবে সকলকে স্নান করার অধিকার দিতে হবে—এটাই ছিল পরম ভক্ত রামানুজের ব্যক্তিগত অভিমত। তদানীন্তন পরিপ্রেক্ষিত বিচারে তাঁর ওই আচরণকে বৈপ্লবিক বলা যেতে পারে। তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ছিলেন। শুধুমাত্র জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এই সম্মাননাকে তাঁদের অনেকে কুকাজে ব্যবহার করতেন। আত্মঅহংকারী হয়ে অব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার চালাতেন। নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য নানা অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকতেন। ধর্মকে সামনে রেখে অর্থের পাহাড় বানাবার চেষ্টা করতেন। সৌভাগ্যের বিষয় রামানুজ কিন্তু এসব কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ভক্ত তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে মঠের সামনে অপেক্ষা করতেন। রামানুজ আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক স্বর্গীয় পরিমণ্ডল রচিত হত।

একদিন যাদবপ্রকাশের বৃদ্ধা জননী বরদারাজকে দর্শন করতে এলেন। তিনি শিষ্য সমন্বিত রামানুজকে দেখে মুগ্ধ হলেন। রামানুজের পাণ্ডিত্য তাঁকে একেবারে অবাক করে দেয়। তিনি ভাবলেন যদি তাঁর সন্তান এই মহান মানুষটির শিষ্যত্ব স্বীকার করেন তাহলে পরম শান্তি লাভ হবে। যাদবপ্রকাশ রামানুজের মতো এক বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি নানা অন্যায় আচরণ করেছেন। তখন হয়তো তাঁর মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছিল। তিনি রামানুজকে হত্যা করার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই পাপ কাজ তাঁকে অন্ধকারে পতিত করেছে। তাঁর জননী পুত্রের ওইসব অনৈতিক কাজ সম্পর্কে সবকিছুই জানতে পেরেছিলেন। প্রবীণ সন্ন্যাসীর বিগ্রহ অবলোকন করে বৃদ্ধার মনে হল তিনি বোধহয় বরদারাজের দ্বিতীয় মূর্তি। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে করেই হোক যাদবপ্রকাশকে এই নবীন মহাত্মা পুরুষের কাছে নিয়ে আসতে হবে।

বাড়িতে ফিরে নিজের সন্তানের কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন। যাদব নিজে নিজের শিষ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারবেন কি? এই কথা ভেবে মাতৃবাক্য উপেক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখন তাঁর মনে দেখা দিয়েছে নানা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং সংশয়। তিনি কোথাও গিয়ে শান্তি পাচ্ছেন না। পথে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, আমার মন এখন নানা কারণে অশান্ত হয়ে উঠেছে। আপনি শ্রীবরদারাজের পরম ভক্ত, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি কি বলতে পারেন কোন পন্থা অবলম্বন করলে আমার মনের এই অশান্তভাব দূরীভূত হবে?

কাঞ্চীপূর্ণ যাদবপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, আপনি এখন শান্ত মনে বাড়ি যান। কাল প্রভুর কাছ থেকে সব তথ্য জেনে আপনাকে বলব।

পরদিন সকালে কাঞ্চীপূর্ণের মুখ থেকে রামানুজের অসাধারণ মহত্ত্ব এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা কথা শুনলেন যাদবপ্রকাশ। যাদবপ্রকাশ বুঝতে পারলেন এখনই তাঁকে মঠে গিয়ে রামানুজকে দর্শন করতে হবে। রামানুজের সঙ্গে শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তারপর ভাবলেন এই বিষয়ের এতখানি বিশ্বাস রাখা কি উচিত? আসলে তখনো যাদবপ্রকাশ দ্বিধাদ্বন্দ্বের জগৎ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কিন্তু

কাঞ্চীপূর্ণ কেন রামানুজের কথা বলছেন? শুধু তাই নয়, গতরাতে স্বপ্নে তিনি রামানুজের মুখচ্ছবি দেখেছিলেন।

খাওয়া—দাওয়া শেষ করে যাদবপ্রকাশ মঠে এলেন। রামানুজের শরীর থেকে নির্গত অসাধারণ জ্যোতিপ্রভা দেখে আরো একবার চমকিত ও অভিভূত হলেন। কিন্তু যাকে একসময় তিনি শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পদপ্রান্তে বসা কি সহজ কথা?

যাদবপ্রকাশকে দেখে রামানুজ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আসন গ্রহণ করতে বললেন। রামানুজের এই ব্যবহারে যাদবপ্রকাশ আরো একটু বেশি অবাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে যাদবপ্রকাশ বললেন—বৎস, আমি তোমার পাণ্ডিত্য এবং বিনয়ে পরম প্রীত হয়েছি। তুমি হলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার বিভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান তৈরি হয়েছে। আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করব, তুমি কি তার উত্তর দেবে? আমি দেখছি তুমি পদ্ম এবং চক্র ধারণ করেছ। তোমার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই সমীচীন বলে মনে হয়। তুমি কি তার স্বপক্ষে কোনো শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাতে পারো?

রামানুজ বললেন, এই কুরনাথ মেধাবী, তিনি সমুদয় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করেছেন। আপনার মনের যা কিছু দ্বিধা তা এঁর কাছে ব্যাখ্যা করুন। তিনি অনায়াসে আপনাকে প্রমাণ দিতে পারবেন। যাদব কুরনাথের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর কুরনাথ বলতে থাকলেন—মহাশয় সামবেদের প্রমাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ স্বয়ং শ্রীভগবানই বলেছেন, সামবেদই হল সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বেদ। তাই সামবেদের প্রমাণ আপনার সামনে উপস্থিত করছি।

সামবেদে লেখা আছে সেই নরশ্রেষ্ঠগণ ভবসাগর পার হবার জন্য বাহুমূলে বিষ্ণুর পবিত্র পদ্ম এবং চক্র চিহ্ন ধারণ করেছিলেন। কেউ কেউ আবার এ সমস্ত চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেন।

শাস্ত্রে লেখা আছে অগ্নি হল পরম পবিত্র। তিনি সহস্রদল পদ্মের মতো শোভাশালী। আবার পদ্ম চক্রাকার যন্ত্রতুল্য, অগ্নিদগ্ধ সুতরাং লোহিত উক্ত যন্ত্র প্রয়োগে যাঁর দেহ উত্তপ্ত হয়েছে। তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করার অধিকার প্রাপ্ত হন।

যাঁরা চক্রাঙ্কিত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করেছেন, আমরাও তাঁদের মতো বিষ্ণুর চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয়ে ইহলোক এবং পরলোকে পরম সৌভাগ্য লাভ করব।

ব্রাহ্মণরা বিশেষত বৈষ্ণবরা উপবীতের মতো শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন দেহে ধারণ করবেন।

শাস্ত্রে আরো বলা আছে, যে ব্যক্তি আত্মহিতের জন্য হরিপদাকার মধ্যচ্ছিদ্র অর্থাৎ মধ্যস্থলে অবকাশ যুক্ত ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি পরমাত্মার পরম প্রিয় হিসাবে পরিগণিত হন।

এরপর তিনি একটির পর একটি স্তোত্র উচ্চারণ করে তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে লাগলেন। যাদবপ্রকাশ তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। কুরনাথ কখনো বেদের শ্লোক উচ্চারণ করছেন কখনো পুরাণের গল্প শোনাচ্ছেন। তাঁর মুখ থেকে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মতো এই শ্লোকগুলি নির্ঝরিত হচ্ছে। যাদবপ্রকাশ ভাবতে পারেননি যে পৃথিবীতে এমন বিদগ্ধ পণ্ডিত থাকতে পারেন। এই কুরনাথ যে মহাত্মার শিষ্য সেই রামানুজের পদমূলে তখন যাদবপ্রকাশ পতিত হলেন। তারপর ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন, হে রামানুজ, তুমি সত্যিই রাঘবের অনুজ। আমি অজ্ঞানের অহংকারে মত্ত হয়ে বারবার তোমাকে অপমান করার চেষ্টা করেছি। তোমার প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করেছি। তুমি আমার অপরাধ মার্জনা করো। তুমি আমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করো। গুরু হয়েও আজ আমি তোমার শিষ্যত্ব বরণ করতে চাই।

রামানুজ যাদবপ্রকাশের এহেন আচরণে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেই পারেননি যে যাদবপ্রকাশের মতো এক আত্মঅহংকারী মানুষ তাঁর পদতলে এইভাবে নিজেকে নিবেদন করবেন। তিনি যাদবপ্রকাশকে ভূমি হতে উত্তোলিত করলেন। গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। তাঁর হৃদয়ের সমস্ত অশান্তির মূলকে বিনষ্ট করলেন। সেই মুহূর্তে যাদবপ্রকাশের মনে হল তিনি বুঝি এক সুশীতল প্রান্তরে এসে উপনীত

হয়েছেন। সেখানে সবকিছু আনন্দময় এবং আলোকময়। সেখানে আত্মঅহমিকা বলে কোনো বোধ থাকে না। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে নিজেকে এক করার বাসনা জাগে মনের মধ্যে।

মায়ের আদেশ নিয়ে যাদবপ্রকাশ সেদিনই তাঁর পুরোনো শিষ্যের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করলেন। তিনি ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করলেন। নাম গ্রহণ করলেন। পঞ্চ—সংস্কারে সংস্কৃত হলেন। অরুণ বস্ত্র ধারণ করলেন। তাঁর নতুন নাম হল গোবিন্দ দাস। ভক্তিমার্গের প্রতি তাঁর যে দ্বেষ ছিল তা এখন উৎপাটিত হল। বিদ্যাভিমান কোথায় হারিয়ে গেল। মনে হল তিনি বোধহয় আজ এক নবজন্ম লাভ করলেন।

এতদিন পর্যন্ত তিনি শুধু তার্কিক ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত ছিলেন। এখন তাঁর মধ্যে ভক্তিভাবের সঞ্চরণ ঘটে গেল। এতদিন নিজেকেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলে ভাবতেন, আজ সেই ভাবনা কোথায় হারিয়ে গেল। পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনই জীবনের আসল উদ্দেশ্য— এমন এক মনোভাবের জন্ম হল তাঁর। রামানুজকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবতার হিসাবে স্বীকার করতে আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকল না যাদবপ্রকাশের মনের মধ্যে।

যাদবপ্রকাশের এহেন পরিবর্তন দেখে রামানুজ বললেন—মহাত্মা, আপনার মন নির্মল হয়ে গেছে। আগে আপনি বৈষ্ণবদের নিন্দা করেছেন, আর এখন আপনি বৈষ্ণবধর্মের সার বস্তুগুলি অধ্যয়নের চেষ্টা করুন। তাহলেই আপনি এক অন্য জগতে পৌঁছে যেতে পারবেন।

যাদবপ্রকাশ সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। কিছুদিন বাদে 'যতিধর্মসমুচ্চয়' নামে এক অতুলনীয় গ্রন্থ লিখে শ্রীরামানুজের পাদপদ্মে অর্পণ করেছিলেন। তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। বোধহয় আর বেশিদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন না।

শেষ পর্যন্ত যাদবপ্রকাশের মহাপ্রয়াণের দিন এগিয়ে এলো। তিনি মানবলীলা সংবরণপূর্বক পরম পদ লাভ করলেন। রামানুজ তাঁর প্রাক্তন গুরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শন করলেন। যে মানুষটি একদা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন, সেই মানুষটিকে রামানুজ কখনো ঘৃণা করতে পারেননি। এটাই হল তাঁর চরিত্রের মহত্ত এবং বৈশিষ্ট্য।

তেরো

আমরা আগেই বলেছি যামুনাচার্য মহাপ্রয়াত হবার পর শ্রীরঙ্গমের মঠ শ্রীহীন হয়ে পড়ে। যতদিন ওই মহাত্মা জীবিত ছিলেন, সন্ধ্যা সমাগমে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে চারিপাশ বন্দিত এবং অনুরণিত করতেন। যদিও মহাপূর্ণ এবং বররঙ্গ হলেন তাঁর উপযুক্ত শিষ্য, কিন্তু তাঁরা কেউই যামুনাচার্যের মতো সুপণ্ডিত এবং সর্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন না। শ্রীরঙ্গমের ভক্ত এবং শিষ্যরা এই অবস্থায় নিরতিশয় দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তাঁরা বারবার যামুনাচার্যের মতো এক সর্বশাস্ত্র সর্বজ্ঞ মহাত্মা পুরুষের অভাব অনুভব করছিলেন। কিন্তু এই অভাব যে একদিন পূর্ণ হবে সেই সম্পর্কে তাঁদের মনে আশা ছিল। গুরু তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে বারবার রামানুজের প্রশংসা করেছেন। রামানুজ যে একজন অবতার, মনুষ্যদেহে জন্ম নিয়েছেন— একথাও তাঁর শিষ্যদের বলেছেন। রামানুজকে সসম্মানে নিয়ে আসার জন্য মহাপূর্ণকে পাঠানো হয়েছিল। মহাপূর্ণ বেশ কিছুদিন রামানুজের গৃহে বাস করেন। তাঁর সান্নিধ্যে রামানুজ তামিল প্রবন্ধমালায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

এখন মহাপূর্ণ স্ত্রীকে নিয়ে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি আসার সময় রামানুজকে সঙ্গে আনবেন। কিন্তু একটি অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তাঁকে সহসা রামানুজ আলয় ত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে লোকমুখে তাঁর কাছে সেই সুসংবাদ পৌঁছে গেল—শ্রীরামানুজ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছেন। এই কথা শুনে মহাপূর্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মহাপূর্ণ জানতেন যে একদিন রামানুজ সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হবেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হবে সেকথা স্বপ্নেও ভাবেননি। শ্রীরামানুজকে প্রত্যক্ষ করে মহাপূর্ণের মতো এক প্রাজ্ঞ পুরুষ বুঝতে পেরেছিলেন যে রামানুজের

শরীরে সন্ন্যাস গ্রহণের সর্বলক্ষণ বিদ্যমান। কিছুদিনের জন্য তাঁকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। তিনি কখনোই চার দেওয়ালের মধ্যে স্বীয় আত্মাকে বন্দি রাখবেন না। নীল আকাশের সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক স্থাপন করবেন। হয়ে উঠবেন যথার্থ বিশ্বপ্রেমিক।

এই কথা শ্রবণ করা মাত্র তিনি শ্রীরঙ্গনাথের কাছে গিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করলেন—হে শরণাগত পালক, আপনি সকলেরই পূর্ণতা সম্পাদন করে থাকেন। আপনি রামানুজকে আপনার নিকট আনয়ন করে আমাদের এই অভাব পূর্ণ করুন।

তারপর ঈশ্বর তাঁকে আদেশ করেছিলেন—বৎস মহাপূর্ণ, তুমি বররঙ্গকে শ্রীমৎ বরদারাজের কাছে পাঠাও। তিনি সংগীতপ্রিয়। বররঙ্গের গানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইবেন। বররঙ্গ যেন শ্রীরামানুজকে ভিক্ষা চায়। তাঁর অনুমতি ছাড়া শ্রীরামানুচার্য তাঁকে কখনো পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

মহাপূর্ণ স্বপ্নের দ্বারা সত্যাদৃষ্ট হলেন। বররঙ্গকে অনতিবিলম্বে কাঞ্চীপুরের উদ্দেশে পাঠালেন। কাঞ্চীপুরে পৌঁছে বররঙ্গ বরদারাজকে সংগীতদ্বারা সন্তুষ্ট করলেন। বররঙ্গ ছিলেন অসাধারণ কণ্ঠ মাধুর্যের অধিকারী। একটির পর একটি সংগীত পরিবেশন করে স্বর্গীয় পরিমণ্ডলের সূচনা করেন। শেষপর্যন্ত বরদারাজ তাঁর সংগীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরদান করতে চাইলেন। গায়ক বর হিসাবে রামানুজকে চাইলেন। তিলকপতি প্রিয় ভক্তের বিরহ সহ্য করতে পারবেন না—তা সত্ত্বেও বররঙ্গের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন।

বররঙ্গ রামানুজকে নিয়ে এলেন শ্রীরঙ্গনাথের পাদমূলে। রামানুজকে দেখে মঠবাসী বৈষ্ণবগণ আনন্দে আত্মহারা হলেন। অনেকে রামানুজের নামে জয়ধ্বনিও করতে লাগলেন। তাঁদের মনে হল স্বয়ং যামুনাচার্য বুঝি অন্য বেশ ধারণ করে তাঁদের সামনে এসে হাজির হয়েছেন। রঙ্গনাথ তাঁর বিভূতি রামানুজকে দান করলেন। এই বিভূতি যুক্ত হয়ে যতিরাজ রামানুজ অপূর্ব শোভায় শোভাপ্রাপ্ত হলেন। দলে দলে বৈষ্ণবরা দেশ দেশান্তর থেকে এসে তাঁর পদযুগল স্পর্শ করতে থাকলেন। তাঁরা যে মুহূর্তে তাঁর পায়ে হাত রাখলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক বৈদ্যুতিক শিহরণ তাঁদের শরীরের স্নায়ুপুঞ্জে প্রবাহিত হত। এই শিহরণ তাঁদের মনের সমস্ত জ্বালা—যন্ত্রণা এবং অমানিশার অন্ধকার দূরীভূত করত। রামানুজের মুখ নিঃসৃত বিষ্ণুবাণী শ্রবণ করে সকলে নিরতিশয় আনন্দধামে গমন করতেন। যামুনাচার্যের তিরোধানের পর এই আশ্রম প্রাঙ্গণে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, রামানুজের শুভ আবির্ভাবে তা দূরীভূত হল। রামানুজ প্রতিদিন ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈষ্ণব গান সংকীর্তন করতেন। বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। আর এই ভাবেই ওই অঞ্চলে এমন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হল যা দূর—দূরান্ত থেকে অনেক মানুষকে আকর্ষণ করতে থাকে।

এই সময় রামানুজের মন তাঁর পরম আত্মীয় গোবিন্দের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। গোবিন্দ না থাকলে তিনি হয়তো আজ জীবিত থাকতেন না। গোবিন্দই তাঁর কাছে যাদবপ্রকাশের ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিলেন। গোবিন্দের পরামর্শ অনুসারেই তিনি যাদবপ্রকাশের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। গোবিন্দের সারল্য এবং পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করত। গোবিন্দের ভালোবাসায় রামানুজ কত সুখী প্রহর কাটিয়েছেন। এখন সেই গোবিন্দ কালহস্তীতে অবস্থান করছেন। রামানুজ গোবিন্দের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কী করে গোবিন্দকে এখানে নিয়ে আসা যায়? তাঁর মনে হল পরম বৈষ্ণব শৈলপূর্ণ কালহস্তীর কাছে শ্রীশৈলে বসবাস করছেন। শৈলপূর্ণের সাহায্যে গোবিন্দের মন পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই কথা চিন্তা করে রামানুজ শৈলপূর্ণকে একটি পত্র লিখলেন। এই পত্রের মাধ্যমে শৈলপূর্ণ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হলেন। তিনি শিষ্যদের নিয়ে কালহস্তী সমীপবর্তী এক সরোবর তীরে এসে অবস্থান করতে লাগলেন। কীভাবে গোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় এবং কীভাবে গোবিন্দর আধ্যাত্মিক চিন্তনের জগতে পরিবর্তন ঘটানো যায়—সে কথাই চিন্তা করতে থাকলেন শ্রীশৈলপূর্ণ।

চোদ্দ

শিবের পরম ভক্ত গোবিন্দ প্রতিদিন প্রত্যুষে সরোবরে আসতেন। সেখানকার কাকচক্ষু জলে স্নান সমাপন করে বৃক্ষ থেকে পুষ্প চয়ন করতেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে পরম ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে শিবপুজো সম্পাদন

করতেন। তিনি সদাসর্বদা শিব স্তোত্র উচ্চারণ করতেন। তাঁর সমস্ত সত্তা হয়ে গিয়েছিল শিবময়। একদিন গোবিন্দ দেখলেন যে এক দিব্যকান্তি বৈষ্ণব কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে বসে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। তিনি গাছ থেকে পুষ্প চয়ন করলেন। তারপর তাঁদের কথোপকথন শুনতে পেলেন। এই কথা শুনে বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে তীব্র অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হল।

গাছ থেকে নেমে স্নানার্থে সরোবরের দিকে গমন করছেন এমন সময় শৈলপূর্ণ তাঁকে সম্বোধন করলেন। শৈলপূর্ণ শান্ত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন— মহাশয়, আমি আপনার পরিচয় জানি না, কিন্তু এত সকালে আপনি কোন দেবতার উদ্দেশে পুষ্প চয়ন করলেন তা জানতে বড়ো আগ্রহ হচ্ছে আমার।

সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ জানালেন যে তিনি শিবের উপাসক। শিব ভিন্ন অন্য কোনো দেবতার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। এই বিশ্বসংসারকে তিনি শিবময় দেখতে পান। রোজ নিয়ম করে শিব পূজার জন্যই পুষ্প চয়ন করেন।

বুদ্ধিমান শৈলপূর্ণ বুঝতে পারলেন যে, গোবিন্দর এই মনোভাবের পরিবর্তন করাতে হবে। তিনি শিব সম্পর্কে নানা শ্রুতিবাক্য প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন যে শিব হলেন সংহারের দেবতা। তাঁর বাসস্থান অরণ্য অভ্যন্তরে, তিনি তথাকথিত নীচ বর্ণের মানুষদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও অধিকর্তা হলেন শিব। তাই তাঁকে পশুপতি নামে ডাকা হয়। এই শিবের উদ্দেশে পুষ্প প্রদান করার উদ্দেশ্য কী? কারণ শিব সংসারের সমস্ত ভোগ—বাসনাকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি মহাকাল রূপ তেজো হিসাবে বিদ্যমান। তিনি নিজের বিভূতিভূষণ নাম দিয়েছেন। কারণ এই বিশ্বচরাচরের ধ্বংসাবশেষ ভস্মই তাঁর আচ্ছাদন। তিনি শ্মশানকেই করেছেন তাঁর আবাসভূমি। তাই তাঁকে কি কুসুম প্রদান করে সুখী করা যায়!

এরপর শৈলপূর্ণ বৈষ্ণব মতে নারায়ণের বন্দনা করলেন। তারপর বললেন যে, বিষ্ণু হলেন অনন্ত কল্যাণ গুণের আকর। তাঁর হৃদয় কমল থেকে পৃথিবী এবং অন্যান্য গৃহপুঞ্জের সৃষ্টি। শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মেই নিয়মিত পুষ্প প্রদান করা উচিত।

গোবিন্দ এর উত্তরে বললেন, মহাত্মা, আপনি যা বললেন সেই কথার সত্যতা আমি অস্বীকার করছি না। তবে এ বিষয়ে আমার মনে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে। ভগবানের সেবার দ্বারা আমরা তো আপনাদেরই উপকার করি। এর দ্বারা ভগবানের কোনো উপকার হয় কি? যিনি স্থল—জল—অন্তরীক্ষের অধিকর্তা, তাঁকে এভাবে বন্দনা করলে তাঁর কী লাভ হবে? নিখিল বিশ্ব চরাচরে সমস্তই তাঁর অধিকৃত। তিনি ইচ্ছা করলে এক নিমেষে এই বিশ্বকে বিনষ্ট করতে পারেন। যিনি নিখিল বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন, সেই শঙ্কর তাঁর দাসের কাছ থেকে কোন দ্রব্য অভিলাষ করবে? ভক্তি হল তাঁর আদরের ধন। তিনি আমাদের কাছ থেকে ভক্তি ছাড়া আর কিছু চান না। সচন্দন কুসুম দান দিয়ে তাঁর পাদপদ্ম অর্চনা করে আমরা ভক্তির প্রাবল্য প্রকাশ করি। তারজন্যই তাঁকে এভাবে পুজো করা উচিত।

শৈলপূর্ণ বুঝতে পারলেন যে, গোবিন্দ যথার্থই শিবভক্ত। শিবের প্রতিই তাঁর অচল ভক্তি। কিন্তু যে করেই হোক গোবিন্দকে বৈষ্ণবমতে আনতে হবে। তাই তিনি শান্ত কণ্ঠস্বরে বললেন—হে মহাত্মা, আপনার কথার মধ্যে যে সারবত্তা লুকিয়ে আছে তা শুনে আমি আনন্দ লাভ করলাম। সত্যিই আপনি যা বলেছেন তা শাশ্বত সত্য। শিব সর্বভূতের অধিকারী, তাঁকে আমরা কী দান করব? কিন্তু একবার ভেবে দেখুন দৈত্যারাজ বলির অভিমানকে যিনি বামন রূপে নাশ করেছিলেন সেই বিষ্ণুও এক শক্তিশালী দেবতা। তিনি একটির পর একটি লীলা প্রদর্শন করে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে গেছেন। আপনি যদি লীলাময় হরির উপাসনা করেন তাহলে আপনার সমস্ত অন্তর অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপ্লাবিত হবে। আপনি কেন লীলাদ্বেষী শঙ্করের উপাসক হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন? তাছাড়া আমি জানি বৈষ্ণবধর্মে আপনার জন্ম, তাই বৈষ্ণবধর্মই আপনি অনুসরণ করবেন।

এই কথা শুনে গোবিন্দ বললেন মহাশয়, আপনাকে দেখে এবং আপনার মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করে আমি বুঝতে পারছি যে আপনি এক শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত, তাহলে কেন হরি ও হরের ভেদজ্ঞান করছেন?

প্রতিদিন সকালে এইভাবে গোবিন্দ এবং শৈলপূর্ণের মধ্যে তর্ক—বিতর্ক হত। শেষপর্যন্ত অবশ্য গোবিন্দ শৈলপূর্ণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শৈলপূর্ণ তাঁকে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষিত হয়ে গোবিন্দ এলেন রামানুজের কাছে। সেখানে পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।

আমরা জানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈব এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে তীব্র তর্ক—বিতর্ক আছে। তাঁরা একে অন্যকে সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু একজন পরম ধার্মিক মানুষ শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে কোনো বিভাজন রেখা টানেন না। তিনি জানেন আমরা বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করে শেষপর্যন্ত একই লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারি। যদি আমাদের মধ্যে যথেষ্ট ভক্তি না থাকে তাহলে আমরা কখনোই ভগবানের দর্শন পাব না। অথচ আমরা এক ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন শাখা—প্রশাখা সৃষ্টি করেছি। এমনটি করা কখনোই উচিত নয়।

শ্রীরামানুজ এবং গোবিন্দের মধ্যে শৈশব থেকেই নিদারুণ সখ্যের সম্পর্ক। তাঁরা একে অন্যকে না দেখলে এক মুহূর্তও অতিবাহিত করতে পারতেন না। হয়তো ঘটনাক্রমে তাঁদের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এখন ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে তাঁরা আবার একত্রে এসে মিলিত হলেন। তাঁদের উভয়ের মুখনিঃসৃত শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করে অসংখ্য মানুষ অন্ধকার বিবর থেকে সহস্র সূর্যের আলোয় আলোকিত উপত্যকায় এসে পা রাখলেন। শ্রীরঙ্গম মঠ আবার বৈষ্ণব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত এবং শিষ্যরা এই মঠে এসে ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হতেন। শ্রীরামানুজ এইভাবে তাঁর প্রিয় ভাই গোবিন্দকে স্বীয় ধর্মমতে অভিষিক্ত করলেন। তবে তিনি যে বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এমন করেছিলেন তা নয়, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ভাই গোবিন্দ যেন তাঁরই সঙ্গে বসবাস করে তাঁর অধ্যাত্ম সাধনাকে দশদিগন্তে পরিব্যাপ্ত করতে সাহায্য করেন। অবশেষে অনেক বাধার প্রাচীর পার হয়ে শেষপর্যন্ত তাঁর এই আন্তরিক অভীপ্সা সফল হল। এজন্য তিনি সর্বশক্তিমান বিষ্ণুকে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন।

পনেরো

শ্রীমহাপূর্ণকে গুরু রূপে পেয়ে রামানুজ যামুনাচার্যের শোক বিস্মৃত হলেন। শ্রীমহাপূর্ণ প্রতিদিন প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতেন। মহাপূর্ণ জানতেন যে রামানুজ এক জন্মসিদ্ধ সন্ন্যাসী। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁর বৈদগ্ধ অকল্পনীয়। তবু তিনি শিষ্যের প্রজ্ঞা এবং চিন্তাকে আরো গতিশীল করার জন্য প্রাণপাত করে পরিশ্রম করতে থাকেন।

তাঁরা যখন শাস্ত্র আলোচনায় মগ্ন থাকতেন তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁদের দেখে একেবারে অবাক হয়ে যেতেন। রামানুজ ছিলেন এক মহা অনুগত শিষ্য। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যিনি শরীর, ধন, জ্ঞান, বসন, কর্ম, মন এবং প্রাণ স্বীয় গুরুর জন্য ধারণ করেন তিনিই হলেন প্রকৃত শিষ্য। যদি আমরা নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রামানুজ চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারব তিনি এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মতো শিষ্য পাওয়া যেকোনো গুরুর জন্ম—জন্মান্তরের তপস্যালব্ধ ফলাফল। রামানুজ সদা সর্বদা মহাপূর্ণের ধ্যান করতেন। মহাপূর্ণকে তিনি দেবতার সমগোত্রীয় বলে মনে করতেন। মহাপূর্ণের সান্নিধ্য তাঁকে আরো ঋদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ করেছিল।

মহাপূর্ণের কাছে তিনি ন্যাসতত্ত্ব, গীতার্থসংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাসসূত্র, পঞ্চরাত্রাগম প্রভৃতি অধ্যয়ন করলেন। একদিন মহাপূর্ণ তাঁর শিষ্যকে উদ্দেশ করে বললেন—এখান থেকে কিছু দূরে তিরুকোট্টি বা গোষ্ঠীপুর নামে একটি নগর আছে। এই নগরে অনেক বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসবাস করেন। সেখানে গোষ্ঠীপূর্ণ নামে এক ধার্মিক পণ্ডিতের বসবাস। তাঁর মতো পরম বৈষ্ণব এই যুগে অত্যন্ত বিরল। তুমি যদি বৈষ্ণব মন্ত্র অবগত হতে চাও তাহলে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করো। এজন্য আর দেরি কোরো না। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে শুভ কাজ অতি শীঘ্র শুরু করতে হয়। যেকোনো সময় দৈব দুর্বিপাক ঘটতে পারে, তখন আর হয়তো সেই কাজ তুমি করতে পারবে না। আমার কথা শোনো, অনতিবিলম্বে সেখানে গিয়ে গোষ্ঠীপূর্ণের শরণাপন্ন হও।

এই কথা শুনে রামানুজ গোষ্ঠীপুরে গমন করলেন। গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু রামানুজকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। গোষ্ঠীপূর্ণ ছিলেন একটু অন্য স্বভাবের মানুষ, তিনি বললেন, আজ আমার সময় নেই, তুমি অন্য একদিন এসো।

এই কথা শুনে রামানুত্বজ মনে মনে খুবই ব্যথা পেলেন। তিনি স্বস্থানে ফিরে এলেন। এর কয়েকদিন পরে শ্রীরঙ্গমে এক মহান উৎসব অনুষ্ঠিত হল। গোষ্ঠীপূর্ণ সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে রঙ্গনাথের সেবক একজন বললেন, তুমি রামানুজকে সরহস্য মন্ত্র উপদেশ দিও। কারণ তাঁর মতো আধার আর কখনো কোথাও পাবে না।

এই কথা শুনে গোষ্ঠীপূর্ণ বলেছিলেন, হে প্রভু, আপনি নিজেই নিয়ম করেছিলেন যে কিছুকাল তপস্যা না করলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হলে এই ধরনের জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। অশুদ্ধ চিত্ত কীভাবে এই মন্ত্রকে ধারণ করবে?

তখন উত্তর পাওয়া গেল—গোষ্ঠীপূর্ণ, তুমি রামানুজের পবিত্রতার বিষয়ে অবগত নও বলে এমন ধারণা করছ। রামানুজ সর্বজনপাবন, পরবর্তীকালে তুমি তাঁর আসল পরিচয় জানতে পারবে।

রামানুজ এর পরে আরো একবার গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে গিয়ে নিজের মনোগত বাসনার কথা বললেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তখনো তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করতে রাজি হলেন না। বারবার আঠারো বার রামানুজ প্রত্যাখ্যাত হলেন। রামানুজ ভাবলেন ঈশ্বর বোধহয় তাঁর প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করছেন না। কিন্তু জ্ঞানত তিনি তাঁর ফেলে আসা জীবনে এমন কোনো কাজ করেননি যাঁর জন্য তাঁকে ঈশ্বরের রোষদহনে দগ্ধ হতে হচ্ছে। তিনি কোনো মানুষকে অযথা তিরস্কার করেন না। কারো ব্যক্তিত্বকে অপমান করেননি। সকলকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। সকলের প্রতি সর্বদা সমদৃষ্টি দিয়েছেন। তাহলে কেন তাঁকে এত কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে?

অবশেষে রামানুজের মনে হল, নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে হয়তো কোনো মালিন্য আছে তাই তিনি নিজের কাজে সাফল্য পাচ্ছেন না। এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি রোদন করতে লাগলেন। কয়েকজন ব্যক্তি সেই খবর গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে পৌঁছে দেবার পর গোষ্ঠীপূর্ণের মনোভাবের পরিবর্তন হল।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে লোক মারফত রামানুজকে নিজের কাছে এনে বললেন, শ্রীবিষ্ণু ছাড়া তাঁর মাহাত্ম্য আর কেউ অবগত নয়। আমি তোমাকে এক মহান আধার বলেই মনে করি। তাই তোমাকে আমি মন্ত্ররাজ দান করলাম। কলিকালে এই মন্ত্ররাজের অধিকারী আর কেউ আছেন বলে আমি অবগত নই। যে এই মন্ত্ররাজ গ্রহণ করবে সে দেহান্তে মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠধামে গমন করবে। তাই আমার অনুরোধ তুমি কাউকে এই মন্ত্র দান কোরো না।

রামানুজ এতদিনে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারলেন। আনন্দে তাঁর মন পরিপ্লাবিত হল। তাঁর চোখে তখন এল আনন্দের অশ্রুধারা। তিনি গুরুবাক্য শুনে পরম প্রীত হলেন। এই মন্ত্রশক্তি তাঁর মধ্যে এক অলৌকিক দিব্যজ্ঞানের উদয় ঘটালো। তিনি অলৌকিক কান্তিময় হলেন। মনে হল তাঁর সমস্ত শরীরে বুঝি এক অপার্থিব ছটা নির্গত হচ্ছে।

শ্রীগুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রামানুজ শ্রীরঙ্গমের পথে চললেন। হঠাৎ তাঁর মনের মধ্যে এক অন্য ভাবের উদয় হল। তিনি গোষ্ঠীপুরের শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের দ্বার লক্ষ্য করে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। পথের মধ্যে যাকে দেখলেন তাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন—তুমি আমাকে অনুসরণ করো। তুমি মন্দিরের কাছে এসো। আমি তোমাকে এমন এক রত্ন দান করব যা তুমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না।

রামানুজের তনুবাহার এবং তাঁর উল্লসিত মুখশ্রী দেখে আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁর অনুগামী হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে এই বক্তার মধ্যে এক ব্রাহ্মণ্য তেজ লুকিয়ে আছে। তাঁরা সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচরণ করলেন। অবশেষে এই শহরে এক গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, স্বর্গ থেকে এক মহাপুরুষ স্বয়ং মর্ত্যে অবতরণ করেছেন। তিনি মন্দির সমীপে অবস্থান করছেন। তিনি সকল মানুষকে তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যবস্তু দিচ্ছেন।

এই জনরব অতি দ্রুত এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। বাতাস যেভাবে আগুনের শিখাকে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়, মানুষের বিশ্বাস সেইভাবে এই জনশ্রুতিকে চারপাশে ছড়িয়ে দিল। এই মহতি জনতাকে দেখে রামানুজের হৃদয়ে জাগল অসীম প্রেমসিদ্ধ তরঙ্গ। তিনি সকলকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর মন্দির দ্বারে আরোহণ করে উচ্চস্বরে বললেন—আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় ভাই বোনেরা, তোমরা যদি এই মুহূর্তে সংসারের সমস্ত জ্বালা—যন্ত্রণা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করতে চাও তাহলে আমি তোমাদের হাতে একটি মন্ত্ররত্ন তুলে দেব। অনেক কষ্ট করে আমি যে মন্ত্ররত্ন সংগ্রহ করেছি তা তোমাদেরও দেব। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে উচ্চারণ করো।

তারপর সকলে বলল—বলুন, কী বলতে হবে, আমরা প্রস্তুত।

তখন রামানুজ তাঁর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে বজ্রনির্ঘোষে 'ওঁ নম নারায়ণায়' মন্ত্রের অবতারণা করলেন। তিনি এক—একটি শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আবার সেই শব্দ পুনরায় উচ্চারণ করলেন। আহা! মন্ত্রের কী প্রভাব। মনে হল পৃথিবীতে বুঝি বৈকুণ্ঠ নেমে এসেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁদের দেখে মনে হল তাঁরা আর কখনো পার্থিব শোক, তাপ, জ্বালা—যন্ত্রণা দ্বারা আক্রান্ত হবেন না। তাঁরা বুঝি এক অনন্ত লোকে পৌঁছে গেছেন।

এইভাবেই সেখানে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। তাঁরা সকলে রামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর রামানুজকে ধন্যবাদ দিয়ে স্বীয় স্বীয় গৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন। রামানুজ এইভাবে অসংখ্য মানুষকে অমৃতলোকের যাত্রী করেছিলেন।

অন্যান্য শিষ্যের মুখে গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের এই অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে রুষ্ট হলেন। তাই যখন রামানুজ তাঁর সামনে এলেন তখন গোষ্ঠীপূর্ণ বললেন—তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, তোমার মতো এক নরপশুকে আমি মহারত্ন দান করেছি। এতে আমি মহাপাপ করেছি। আবার তুমি কেন আমার কাছে এসে তোমার মুখ দেখাচ্ছ? তোমার মতো এক পিশাচের নরকেও স্থান হওয়া উচিত নয়।

রামানুজ এই কথা শুনে এতটুকু ভীত, সন্ত্রস্ত বা চিন্তিত হলেন না। তিনি বললেন—মহাত্মা, নরকবাসের জন্য প্রস্তুত হয়েই আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করেছি। আপনার কথা অনুযায়ী যে কেউ ওই মন্ত্র শ্রবণ করবে সেই পরমগতি লাভ করবে। এই বাক্যের ওপর নির্ভর করেই আমি নগরের সমস্ত নরনারীকে মোক্ষপথের পথিক করেছি। দেহান্তে তাঁরা সকলেই বৈকুণ্ঠ লাভ করবে। আমার মতো এক তুচ্ছ মানুষ যদি নরকে গমন করে এবং তার পরিবর্তে যদি হাজার হাজার মানুষ স্বর্গে যেতে পারে তার থেকে আর আনন্দের কী আছে? আমি ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার আদেশ লঙ্ঘ্যন করেছি বলে আমার নরকে যাওয়াই উচিত। আপনার বাক্যানুসারে সহস্র সহস্র পাপীতাপির যদি পরমগতি লাভ হয় তাহলে এর থেকে সুখের আর কী হতে পারে?

এই কথা শুনে গোষ্ঠীপূর্ণ খুবই অবাক হয়ে গেলেন। তিনি পরে বুঝতে পারলেন যে, রামানুজের মধ্যে এক পরম ঔদার্য্য বিদ্যমান। তিনি পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণতাকে দূর করতে পারেননি। রামানুজের প্রতি গোষ্ঠীপূর্ণের আচরণের পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে রামানুজকে আলিঙ্গন করলেন। মনে হল রামানুজের এই সারল্য বুঝি তাঁকেও সংক্রমিত করেছে।

রামানুজকে গোষ্ঠীপূর্ণ বললেন—হে মহানুভব, তোমার এই উদারতা আমি অনুভব করলাম। আজ থেকে তুমি আমার গুরু আর আমি তোমার শিষ্য হিসাবে এই ধরাধামে বিচরণ করব। যাঁর এমন বিশাল হৃদয়, যে লোক পিতা বিষ্ণুর অংশীভূত, তাঁকে আমি সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা করি। আমি এক সামান্য জীব, আমি কি তোমার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি? হে মহাত্মা, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করো।

রামানুজ এই কথা শুনে লজ্জায় নতশিরে বললেন—হে মহাত্মা, আপনি আমার নিত্যগুরু। আপনার শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলেই মন্ত্র এতখানি মাহাত্ম্য লাভ করেছে। আপনি কেন এইভাবে নিজেকে আমার কাছে নিবেদন করছেন? আপনার অসীম প্রভাব আছে বলেই এই শব্দগুলির মধ্যে এক শক্তির অবতারণা

হয়েছে। আজ হাজার হাজার মানুষ ওই মন্ত্র গ্রহণ করে শুদ্ধ জীবনের অধিকারী হল। এর জন্য আপনাকে আমি শতসহস্র প্রণাম জানাচ্ছি। আমি আপনার সন্তান, আপনার শ্রীচরণের দাস হিসাবে অবস্থান করব। এটাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

রামানুজের মাধুর্য এবং উদারতায় গোষ্ঠীপূর্ণ আরো একবার পরম প্রীত হলেন। বেশ বোঝা গেল, রামানুজের চারিত্রিক ওদার্য তাঁর হৃদয়কে কতখানি স্পর্শ করেছে। এতদিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের যে অহংকার ছিল নিমেষে তা হারিয়ে গেল। আত্ম—অহংকারকে সঙ্কুচিত করলেন গোষ্ঠীপূর্ণ। গোষ্ঠীপূর্ণ বুঝতে পারলেন যে, একজন সৎ সাধুর কী কী গুণ থাকা দরকার।

তিনি যে মন্ত্রশক্তির প্রভাব নিজের কাছে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, সে কথা চিন্তা করে তিনি পরম লজ্জিত হলেন। রামানুজকে বাহবা দিয়ে বললেন, তোমার মতো শিষ্য না থাকলে আমি কখনোই বুঝতে পারতাম না যে দান করার মধ্যে কী আনন্দ লুকিয়ে আছে। তুমি আমার কাছ থেকে প্রাপ্ত মন্ত্র সকলকে দান করে অসীম আনন্দ লাভ করেছ। স্বয়ং বিষ্ণু সদাসর্বদা তোমার প্রতি সদয় হবেন, এতে আর অবাক হবার কী আছে?

ষোলো

রামানুজ শ্রীরঙ্গমের মঠে ফিরে এলেন। দেখতে দেখতে আরো কিছুদিন কেটে গেল। একদিন তাঁর প্রিয় শিষ্য কুরেশ তাঁর কাছে একটি দুরূহ শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করার জন্য এলেন।

রামানুজ বললেন—কুরেশ, আমার গুরু গোষ্ঠীপূর্ণ আমাকে একটি আদেশ দান করেছেন। তিনি বলেছেন যিনি এক বছর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবেন এবং গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকবেন, তাঁকেই শ্লোকার্থ দান করতে হবে। তুমি এক বছর এইভাবে দিন যাপন করো, তারপর আমি এই শ্লোকের অর্থ তোমার কাছে বর্ণনা করব।

কুরেশ বললেন, হে মহানুভব, আমাদের জীবন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো। আমরা জানি না আগামীকাল আমাদের ভাগ্যে কী ঘটবে। আমি এখনো এক বছর বাঁচব কি? যাতে আমি অতি শীঘ্র এই মন্ত্রার্থের অধিকারী হতে পারি তেমনই বিধান করুন।

রামানুজ বললেন, শাস্ত্রে আছে যিনি একমাস অনশন ব্রত অবলম্বন করে থাকতে পারেন তিনি এক বছর ব্রহ্মচর্যের ফল লাভ করেন। তুমি একমাস মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করো। কারণ ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা আর অনশন দুই—ই সমান।

কুরেশ সঙ্গে সঙ্গে এই সাধনায় মগ্ন হলেন। তিনি ভিক্ষার দ্বারা যেটুকু অন্ন পেতেন তা দিয়ে কোনোমতে প্রাণ ধারণ করতেন। দেখতে দেখতে একটি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তখন রামানুজ ওই শিষ্যকে শ্লোকের মর্মার্থ বুঝিয়ে বলেছিলেন।

রামানুজের দ্বিতীয় শিষ্য দাশরথিও একটি চরম শ্লোকের অর্থ অনুধাবন করার জন্য রামানুজের কাছে আসেন। রামানুজ দাশরথিকে বললেন—বৎস, তুমি আমার আত্মীয়, তুমি সৎব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তুমি গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে গিয়ে এই শ্লোকের রহস্য জেনে নাও। এটিই আমার ইচ্ছা। কারণ তুমি আমার নিকট আত্মীয় বলে তোমার কোনো চারিত্রিক দোষ আমি অন্বেষণ করতে পারব না। তাই আমার এমন বিধান।

দাশরথি মহা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল পাণ্ডিত্যের অহংকার। তাই বোধহয় রামানুজ তাকে গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

দাশরথি রামানুজের নির্দেশে গোষ্ঠীপূর্ণের কাছে পৌঁছে গেলেন। ছ—মাস চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনোভাবেই গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁকে কৃপা প্রদর্শন করলেন না। অবশেষে একদিন অনুগ্রহ করে বললেন—দাশরথি, তুমি পণ্ডিত বলে জানি, কিন্তু জেনো বিদ্যাধন এবং সৎকূলে জন্মলাভ করলে ক্ষুদ্র চিত্তেরই মদন্ধতা আসে, তুমি এই বিষয়টি অনুসন্ধান করো। গুরুর পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করো। একজন উপযুক্ত গুরুই তোমাকে এই শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দেবেন।

দাশরথি সঙ্গে সঙ্গে রামানুজের কাছে পৌঁছে গেলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে জ্ঞাপন করলেন। এই সময় মহাপূর্ণের কন্যা অত্তুলা সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি রামানুজকে বললেন, পিতা আমায় তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন। কেন পাঠিয়েছেন সেকথা আমি তোমাকে বলব। আমি আজই শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছি। সেখানে রোজ সকালে এবং বিকালে আমাকে রান্নার জন্য সুদূরবর্তী এক হ্রদ থেকে জল আনতে হয়। পথ দুর্গম এবং জনশূন্য। যেকোনো সময় দস্যুর আক্রমণ হতে পারে। প্রতিদিন আমি শারীরিক ক্লেশে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যাই। একথা গতকাল আমি আমার শাশুড়ি মাতাকে নিবেদন করেছি। তিনি আমার কথা শুনে কোনো সহানুভূতি দেখাননি। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, বাপের বাড়ি থেকে কোনো পাচককে আনতে পারনি কেন? আমার এমন অর্থের সংস্থান নেই যে তোমার সেবার জন্য ঝি—চাকর রাখব।

তাঁর এই কথা শুনে আমার মন খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে। আমি কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে চলে এলাম। তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন বৎসে, তোমার ধর্মভ্রাতা রামানুজের কাছে গমন করো। এই বিষয়ে তিনি যা বলবেন তাই মেনে নিতে হবে। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। এখন বলো আমি কী করব? আমি কি শ্বশুরালয়ে ফিরে যাব? আবার দৈনন্দিন কাজে নিজেকে নিয়োগ করব? প্রতি মুহূর্তে এক ভয় আমাকে আক্রমণ করবে? শ্রান্তি এবং ক্লান্তি এসে আমার তনুবাহারকে আহত করবে? নাকি আমি পিত্রালয়ে অতিবাহিত করব?

রামানুজ এই কথা শুনে বললেন বোন, তুমি দুঃখ কোরো না, আমার কাছে একজন ব্রাহ্মণ আছেন। আমি তোমার সঙ্গে তাঁকে পাঠাচ্ছি। তিনি হ্রদ থেকে জল আনবেন এবং সমস্ত রান্নার কাজও সম্পন্ন করবেন।

এই কথা বলে তিনি দাশরথির দিকে তাকালেন। গুরুর অভিপ্রায় জেনে দাশরথি অত্তুলার অনুবর্তী হলেন। তারপর অত্তুলার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পাচকের কাজ করতে থাকলেন।

দেখতে দেখতে ছ—মাস কেটে গেল। একজন বৈষ্ণব শাস্ত্রের একটি শ্লোক নিয়ে ব্যাখ্যা করছিলেন। যাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করছিলেন তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই ব্যাখ্যা শুনছিলেন। দাশরথি সেখানে পৌঁছে গেলেন। ওই শ্লোকের অর্থ শুনে বুঝতে পারেন যে, এই ব্যাখ্যা সঠিক হয়নি। ব্যাখ্যাকর্তা নানা মিথ্যা ভাষ্য প্রদান করছেন। যাঁরা স্থির বিশ্বাস নিয়ে এই ব্যাখ্যা শুনছেন তাঁরা অমঙ্গলে পড়বেন। তাঁদের মতিভ্রম হবে। তাই তিনি এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলেন না।

এই কথা শুনে ব্যাখ্যাকার চিৎকার করে বললেন—হে মূর্খ, তুমি ক্ষান্ত হও, কোথায় শৃগাল আর কোথায় স্বর্গ? কোথায় পাচক আর কোথায় শাস্ত্র? শাস্ত্রে তোমার বিন্দুমাত্র অধিকার আছে কি? আগে নিজেকে প্রমাণ করো, তারপর আমার অর্থের ত্রুটি খুঁজতে এসো। তুমি পাকশালে গিয়ে নিজের সামর্থ প্রকাশ করো।

মহাত্মা দাশরথি এমন অপমানজনক কথা শুনে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাপ্রদান করতে লাগলেন। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল শাস্ত্রসম্মত এবং ব্যাকরণ অনুমোদিত। উপস্থিত সকলে মোহিত হয়ে তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ব্যাখ্যাকার স্বয়ং এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। নিজের এমন আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর কৌতুহলবশত জানতে চাইলেন, আপনার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি কেন দাসত্ববৃত্তি গ্রহণ করেছেন?

দাশরথি এই কথা শুনে বললেন যে—শ্রীগুরুর আদেশে আজ আমাকে পাচক হতে হয়েছে। অবশেষে জানা গেল যতিরাজ শ্রীরামানুজের প্রধান পণ্ডিত—শিষ্য দাশরথি এখন পাচক হয়েছেন। তখন তাঁরা দলবদ্ধভাবে শ্রীরঙ্গমে উপনীত হলেন। রামানুজকে বললেন—হে মহাত্মা, আপনার উপযুক্ত শিষ্য মহানুভব দাশরথিকে আর পাপকর্মে নিযুক্ত রাখবেন না। এখন তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের কোনো অভিমান নেই। তিনি সাক্ষাৎ পরমহংস স্বরূপ বিরাজ করছেন। আপনি আদেশ করুন আমরা যেন তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি।

রামানুজ এই কথা শুনে পরম আনন্দ লাভ করলেন। তিনি দাশরথির অহংকার ছেদ করার জন্য তাঁকে পাচকের পদে বসিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দাশরথিকে আলিঙ্গন করলেন। পরে দাশরথিকে

শ্রীরঙ্গমে এনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করেন। দাশরথি প্রতিদিন এক—একটি শ্লোকের অর্থ নিরূপণ করতেন। তিনি শেষপর্যন্ত বৈষ্ণব দাস হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

গোষ্ঠীপূর্ণ এবার যামুন মুনির শিষ্যকে রামানুজের কাছে নিয়ে এলেন। রামানুজকে বললেন—বৎস, ইনি মহাপণ্ডিত, ইনি আমাদের গুরু যামুন মুনির শিষ্য। ইনি শঠারীসুপ্ত বা সহস্রগীত নামে প্রবন্ধের অর্থ অবগত আছেন। তুমি এঁর সঙ্গে থেকে সেই অর্থ জেনে নাও। তাতে তোমার সুবিধা হবে। রামানুজ কখনো গুরুবাক্যকে অশ্রদ্ধা করেন না। এক্ষেত্রেও তিনি গুরুবাক্য অনুসারে ওই কাজ করতে সম্মত হলেন। কিন্তু ওই ব্যক্তির ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ না হওয়াতে নিজে নতুন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। ওই পণ্ডিত রামানুজের এমন আচরণকে ধৃষ্টতা মনে করে স্বগৃহে প্রস্থান করলেন। লোকের কাছ থেকে গোষ্ঠীপূর্ণ এই খবর শুনলেন। তিনি পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বললেন— সমস্ত সহস্রগীতির অর্থ রামানুজ বুঝতে পেরেছেন তো?

তখন ওই পণ্ডিত সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ বললেন, ভাই, তুমি ওঁকে সামান্য মানুষ মনে কোরো না। যামুন মুনির বিষয়ে তিনি যেমন অবগত আছেন, এমন আমরা কেউই জানি না। সাক্ষাৎ রামানুজ লক্ষ্মণই রামানুজ নাম গ্রহণ করে আরো একবার ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। উনি যেমন অর্থ করেন তেমন অর্থ বোঝার চেষ্টা করো।

গোষ্ঠীপূর্ণের কথা শুনে ওই মানুষটি আবার রামানুজের কাছে গেলেন। রামানুজ একদিন একটি শ্লোকের অন্য অর্থ করায় তিনি তাতে বিরক্ত না হয়ে তা পাঠ করে পরম আনন্দ লাভ করলেন। তিনি পরম আনন্দভরে রামানুজকে প্রদক্ষিণ করলেন। তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি পুত্র সুন্দরবাহুকেও রামানুজের শিষ্য করে দিলেন।

এইভাবে তিনি রামানুজের কাছ থেকে 'সহস্রগীতি' শিক্ষা করলেন। তাঁর সিদ্ধি আরো পরিপূর্ণ হল। শুধু তাই নয়, তিনি প্রতি রাতে তাঁর গুরুর জন্য স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করতেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে রামানুজের প্রতি তাঁর কতখানি শ্রদ্ধাভক্তি এবং ভালোবাসা ছিল।

এবার রামানুজ মহাপূর্ণের আদেশ অনুসারে বররঙ্গের কাছে এলেন। সেখানে এসে তিনি পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তামিল প্রবন্ধ পাঠ করতে থাকলেন।

ছয় মাস পরে শ্রীবররঙ্গ তাঁর প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি রামানুজকে বললেন— বৎস, তুমি আমার সর্বস্ব গ্রহণ মানসে সেবা করছ তা আমি জানি। তোমার ধারাবাহিক সেবায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এসো আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের ভার নিবেদন করি।

এরপর তিনি বললেন—বৎস, যা বলছি তা—ই চরম পুরুষার্থ।

গুরুই পরম ব্রহ্ম, গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, গুরুই সর্ববিধ কাম্য বস্তু সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরুই পরম আশ্রয়, গুরুই ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপ, গুরুই শ্রেষ্ঠ গতি, তিনিই সংসার সাগরে তোমার কর্ণধার স্বরূপ বলে গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। ভগবান লাভের উপায় তিনিই। স্বয়ং ভগবানও তিনি।

এই কথা শুনে রামানুজ নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করলেন। তাঁর মনে হল যে ত্রুটি বা অভাব এতদিন পর্যন্ত তাঁর মধ্যে ছিল, এই বাক্য কয়টি শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তা চিরকালের মতো দূরীভূত হল। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে বিচরণ করতে লাগলেন। 'গদ্যত্রয়' নামে এক মহাগ্রন্থে রামানুজ নিজের মনোভাবের কথা অকপট চিত্তে প্রকাশ করেছেন। তখন থেকেই অনেকে তাঁকে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী বলে পুজো করতে লাগলেন।

বররঙ্গ ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর এক প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম ছিল শোট্টনম্বি। তিনি শোট্টনম্বিকে রামানুজের শিষ্য করে দিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গ এই পাঁচজন ছিলেন যামুন মুনির অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য। রামানুজ তাঁদের সকলের কাছ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে শিক্ষা লাভ করলেন। সকলে তাঁকে যামুনাচার্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা দিল।

রামানুজের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশ—দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এক ভক্ত মণ্ডলী।

সতেরো

উত্তর ভারত রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রে অবস্থিত। বিভিন্ন বিদেশি শাসক বারবার উত্তর ভারত আক্রমণ করেছে। তারা বিভিন্ন হিন্দু দেবালয় একাধিকবার ধ্বংস করেছে। তাই উত্তর ভারতে হিন্দুদের আধ্যাত্মিক সাধনা বারবার বিঘ্নিত হয়েছে।

যেহেতু দক্ষিণ ভারতের অবস্থান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে তাই এই অঞ্চলে খুব বেশি বিদেশি আক্রমণ ঘটেনি। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নরপতি দীর্ঘদিন ধরে দেবালয় নির্মাণ করেছেন। দক্ষিণ ভারতে এক—একটি অতি বৃহৎ মন্দির প্রাঙ্গণ গড়ে উঠেছে। এই মন্দির অঙ্গনে অসংখ্য পূজারী এবং অর্চক বসবাস করতে পারতেন। কেউ কেউ সপরিবারেও বসবাস করতেন। এক—একটি মন্দিরকে এক—একটি নগরের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে।

প্রত্যেকটি মন্দিরের একজন প্রধান অর্চক বা প্রধান পরিচারক নিযুক্ত হতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই পরিচারক হতেন বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। মন্দিরের সার্বিক উন্নতিকল্পে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। কিন্তু তাঁর মনে আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার বিকাশ বা উন্মেষ খুব একটা চোখে পড়ত না। তিনি অন্য সাধারণ মানুষের মতো অর্থলোভী হতেন। অবশ্য কোনো কোনো প্রধান ব্যবস্থাপক বা অর্চক সন্ন্যাস জীবনের সকল ব্রত সুচারুভাবে সম্পাদন করতেন। কিন্তু এই সংখ্যাটি ছিল খুবই কম। বেশির ভাগ অর্চক অর্থবলে বলীয়ান হয়ে অহংকারী এবং মদমত্ত হতেন। মন্দির পরিচালনা থেকে নানাভাবে আত্মসাৎ করা অর্থ দিয়ে তারা বিলাসী জীবন অতিবাহিত করতেন।

শ্রীরঙ্গম মন্দিরের ক্ষেত্রেও এমনই ঘটনা দেখা যায়। এই বিশাল মন্দিরের যিনি প্রধান অর্চক ছিলেন তিনি ছিলেন এক ধনী ব্যক্তি। তাঁর আদেশ অনুসারে সহকারী অর্চকদের কাজ করতে হত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, তিনি ওই মন্দির প্রাঙ্গণে নিজস্ব প্রশাসন চালাতেন। তাঁর কথা মান্য না করলে সেই ব্যক্তিকে তার পদ থেকে বিতাড়িত করা হত। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ ওই ব্যক্তি পেতেন না।

রামানুজের প্রবল জনপ্রিয়তায় ওই অর্চক সংগত কারণেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হলেন। শ্রীরামানুজ সকল মানুষের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ প্রদর্শন করতেন। তিনি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনো প্রভেদ করতেন না। এমনকি শ্রীরঙ্গম মন্দিরের উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় করতেও কার্পণ্য করতেন না। সাধারণ মানুষের মনে এমন ধারণা জন্মেছিল যে, রামানুজ হলেন শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর দ্বিতীয় বিগ্রহ। তাই এখন আর কেউ প্রধান অর্চকের প্রতি সামান্যতম ভক্তি—শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। এতদিন পর্যন্ত প্রধান অর্চক যে সম্মানীয় আসনে আসীন ছিলেন, এখন সেই আসন স্থানচ্যুত হয়েছে। অনেকে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। অনেকে সর্বজনসমক্ষে তাঁকে উপহাস করেন। ধারাবাহিকভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটতে থাকায় প্রধান অর্চক নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, যতদিন পর্যন্ত শ্রীরামানুজের মতো এত তেজপ্রতীম ব্যক্তি এই মন্দিরে অবস্থান করবেন ততদিন তার উন্নতির কোনো আশা নেই। এখন কী উপায়?

শেষে তিনি এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে—করে হোক রামানুজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে তাঁর অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে। জনগণের চোখে এখনই তিনি এক হেয় ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। ভবিষ্যতে হয়তো এই আসনে আর টিকে থাকতে পারবেন না। এসব কথা চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত প্রধান অর্চক স্থির করলেন রামানুজকে একদিন দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে নিজের ভবনে আমন্ত্রণ জানাবেন। রামানুজের মতো সদাশয় এবং উদার ব্যক্তি নিশ্চয়ই এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারবেন না। তখন অন্নের সঙ্গে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দেওয়া হবে। রামানুজ সেই অন্ন গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। প্রধান অর্চকের পথ নিষ্কণ্টক হবে। সময়

সমস্ত শোককে প্রশমিত করে। প্রথম দিকে হয়তো এই শহরের বাসিন্দারা রামানুজের জন্য অশ্রুপাত করবে। ধীরে ধীরে তারা রামানুজকে ভুলে যাবে।

তখন প্রধান অর্চক আবার তার আগের আধিপত্য বিস্তার করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর প্রিয় বশংবদ ব্যক্তিকে প্রধান পূজারীর আসনে আসীন করবেন। সেই ব্যক্তি তাঁর অঙ্গুলি হেলনে পূজার্চনায় ব্রতী থাকবেন। তাঁরা দুজনে মিলে ধারাবাহিকভাবে মন্দিরের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন।

এ কথা চিন্তা করতে করতে প্রধান অর্চক তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন। এই ব্যাপারে স্ত্রীকেই সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে। প্রধান অর্চক জানতেন যে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত লোভী। এর আগে বেশ কয়েকবার তার অনৈতিক কাজে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন। তিনি জানতেন যে এবারেও তাঁর স্ত্রী তাঁর দিকে ইতিবাচক হাত বাড়িয়ে দেবেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন—আমি শ্রীরামানুজকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে নিমন্ত্রণ করতে চাই। কিন্তু অন্নের সঙ্গে মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে ততদিন আমাদের এইভাবে দিন কাটাতে হবে। এত অপমান আর অবমাননা আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি জানো বিষের পেটিকা কোথায় সংরক্ষিত আছে। তোমাকে আর বেশি কি বলব? তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি এর আগে বেশ কয়েকবার অনৈতিক কাজে আমাকে সমর্থন করেছিলে। আশা করি এবারেও তার অন্যথা হবে না।

নরপশুর উপযুক্ত সহধর্মিণী হাসিমুখে ঘাড় নাড়লেন। তিনি নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে বললেন—রঙ্গনাথস্বামীর কৃপাতে তোমার মতো এক পতি আমি লাভ করেছি। আমি রামানুজের এই জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারি না। আগে যখন পথে বের হতাম, তোমার স্ত্রী বলে আমাকে সকলে কত সম্মান করত। এখন আর কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। তারা সকলেই শুধুমাত্র রামানুজের জয়গান করবে। এই ব্যাপারটির এখনই অবসান হওয়া উচিত।

স্ত্রীর কাছ থেকে ইতিবাচক সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে প্রধান অর্চক রামানুজের কাছে গেলেন। রামানুজ তখন এক মনে ঈশ্বরের ধ্যান করছিলেন। তাঁর ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখে প্রধান অর্চক কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে যান। পর মুহূর্তেই আবার এই জগতে ফিরে আসেন। রামানুজের চোখ দুটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অর্চককে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান দেখলেন। প্রধান অর্চকের ষড়যন্ত্র এবং কুচক্র সম্পর্কে কিছু কিছু ঘটনার কথা তিনি অবগত ছিলেন। যেহেতু রামানুজ ছিলেন এক পরিশুদ্ধ ব্যক্তি, তাই পৃথিবীর কোনো মানুষকেই তিনি সন্দেহ করতে পারতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মানুষ অনেক সময় ভুল করে কুকাজে রত হয়। কিন্তু এটি মানুষের আসল অভিপ্রায় নয়।

প্রধান অর্চক হাসিমুখে বললেন—হে মহাত্মা, আমি এবং আমার স্ত্রী অনেকদিন ধরে মনে মনে একটি গভীর গোপন প্রার্থনা পোষণ করে চলেছি। আশা করি আপনি আমাদের সেই স্বপ্নপূরণে বাধা দেবেন না।

রামানুজ এই বাকচাতুর্যের অর্ন্তনিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না। তিনি সরল শিশুর মতো ঘাড় নাড়লেন।

প্রধান অর্চকের মুখে ষড়যন্ত্রীর হাসি ফুটে উঠল। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্বেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন। এখন মাথা ঠান্ডা রেখে পরবর্তী পর্বগুলিকে পরিচালনা করতে হবে। প্রধান অর্চক করজোড়ে বললেন—হে মহাত্মা, আমাদের ইচ্ছা আজ দ্বিপ্রহরেই আপনি আমাদের বাড়ির অতিথি স্বরূপ আসবেন। আমার স্ত্রী যথাসাধ্য অনুব্যঞ্জন রান্না করে স্বহস্তে আপনাকে পরিবেশন করবেন। আপনার মতো এক মহৎ প্রাণের পদধূলিতে আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ হবে। আশা করি আপনি আমাদের বিমুখ করবেন না।

এই কথা শুনে রামানুজের হৃদয় গলিত হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রধান অর্চক খুশি মনে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে বললেন।

স্ত্রী মহানন্দে পাকশালে গিয়ে নানা ধরনের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে লাগলেন। প্রধান অর্চকের আদেশ এবং নির্দেশ মতো সেই ব্যঞ্জনের সঙ্গে বিষাক্ত দ্রব্য মিশিয়ে দিলেন।

মধ্যদিনে যতিরাজ ভিক্ষাগ্রহণ মানসে প্রধান অর্চকের গৃহে আগমন করলেন। অর্চকের পত্নী তাঁকে অতি সমাদরে আপ্যায়ন করলেন। জল দিয়ে নিজেই রামানুজের পা ধুইয়ে দিলেন। বস্ত্র দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিলেন। তখন হঠাৎ মহিলার হৃদয়ে এক অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হল। রামানুজের সারল্যময় মুখ দেখে তিনি অপত্যস্নেহে আক্রান্ত হলেন। পৃথিবীর সমস্ত নারীর মধ্যেই এক চিরন্তন নারীসত্তা লুকিয়ে থাকে।

হঠাৎ প্রধান অর্চকের পত্নীর মনে হল এই সহজ—সরল অসহায় মানুষটিকে কি এভাবে হত্যা করা উচিত? এর আগে কতবার তিনি তাঁর স্বামীর অনৈতিক কাজে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন। এখন তাঁর সমস্ত অন্তরে অনুশোচনার অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল। তিনি যখন বিষমিশ্রিত অন্ন নিয়ে রামানুজের পাত্র পরিপূর্ণ করলেন, তখন তিনি আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন—বৎস, যদি প্রাণ রক্ষা করতে চান, তাহলে অন্যত্র গিয়ে ভিক্ষা করুন। এই অন্ন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক বিষ আপনার শরীরের স্নায়ুপুঞ্জকে অচল এবং অবশ করে তুলবে। আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।

প্রধান অর্চকের পত্নীর মুখে এই কথা শুনে রামানুজ কেমন যেন হয়ে গেলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। প্রধান অর্চক যে এইভাবে তাঁকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করতে মনস্থ করেছেন, এ বিষয়টি জেনে তিনি মনে মনে খুবই দুঃখবোধ করলেন। তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন আমি এমন কী অনিষ্ঠ কাজ করেছি যার জন্যে প্রধান অর্চক আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন?

রামানুজ তখন কিছু স্থির করতে না পেরে অন্যমনস্কের মতো সেখান থেকে উঠলেন। একা একা কাবেরী নদীর দিকে এগিয়ে চললেন। তখন বেলা পড়ে এসেছে। কাবেরী তীরের বালু গরম হয়ে উঠেছে। তিনি তখন গোষ্ঠীপূর্ণকে সেখানে দেখতে পেলেন। তিনি গোষ্ঠীপূর্ণকে দেখে সেই তপ্ত বালুরাশির মধ্যে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। গোষ্ঠীপূর্ণকে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁকে সেখান থেকে তুলে কী হয়েছে তা জানতে চাইলেন। রামানুজ আনুপূর্বিক বিবরণ প্রদান করলেন। তারপর বললেন—আমি প্রধান অর্চকের মনের দূরবস্থার কথা ভেবে এইভাবে ক্রন্দন করছি। সে ভীষণ মহাপাতক, নরকের অন্ধকার থেকে কীভাবে সে মুক্তি পাবে সেকথা আপনি বলুন।'

গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। যে দূরাত্মা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত, সেই মানুষটির জন্য রামানুজের হৃদয়ে এত ভালোবাসা জমে আছে? রামানুজ কি সত্যিই ঈশ্বরের অবতার?

গোষ্ঠীপূর্ণ বললেন—তোমার মতো মহানুভব যখন সেই দূরাত্মার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, তখন তাকে আর নরকের অন্ধকারে পতিত হতে হবে না। সে পাপ মন পরিত্যাগ করে পুণ্যমার্গে আসবে একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

গুরু এবং শিষ্য পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। রামানুজ চিন্তিত মনে হাঁটতে হাঁটতে মঠে পৌঁছে গেলেন। সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন যে একজন ব্রাহ্মণ নানারকম অন্ন নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি সামান্য অন্ন গ্রহণ করে বাকিটুকু শিষ্যদের মধ্যে বণ্টন করলেন। আর এই দিনের ভয়ংকর ঘটনার কথা কাউকে জানালেন না। সবসময় বসে বসে অর্চকের শুভ চিন্তা করতে লাগলেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি রামানুজ কতখানি সহানুভূতিশীল ছিলেন!

যথা সময়ে অর্চক বাড়িতে ফিরে এলেন। তাঁর মন তখন আনন্দে পরিপূর্ণ। নিশ্চয়ই তাঁর ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। পতিগতপ্রাণা স্ত্রী বিষপ্রয়োগে রামানুজকে হত্যা করেছে। একটু পরেই চারপাশে শোকের বাতাবরণ তৈরি হবে।

কিন্তু বাড়িতে এসে অর্চক স্ত্রীর কাছ থেকে সব কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। স্ত্রীকে নানাভাষায় কটুকথা বললেন। মেয়েরা কোমল মনের হয়ে থাকে, একথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। তখন থেকে আবার নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বোনার চেষ্টা করলেন। কীভাবে রামানুজকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে থাকলেন। অবশেষে একটি উপায় বের করলেন।

অর্চক জানতেন যে রামানুজ বিষ্ণুর পরম ভক্ত। বিষ্ণুর স্নানজল পান করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। এই সুযোগের সদব্যবহার করতে হবে।

পরদিন অর্চক বিষমিশ্রিত স্নানজল রামানুজকে প্রদান করলেন। এই স্নানজল পান করলে মৃত্যু অনিবার্য। রামানুজ সেই জল পান করে বুঝতে পারলেন যে এটি বিষমিশ্রিত। অন্য কেউ হলে ভীত সন্ত্রস্ত হতেন। মৃত্যু আশঙ্কায় থরথর কম্পমান হতেন। কিন্তু রামানুজের মুখমণ্ডলে ভয় বা শিহরণের কোনো চিহ্ন পরিস্ফুটিত হল না। অতি উপাদেয় জল পানে আমরা যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা লাভ করি, রামানুজ তাই করলেন। তিনি রঙ্গনাথ স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, হে প্রভু, আমার প্রতি আপনার এত স্নেহ? এই দেবদুর্লভ পানীয় আজ আমি পান করলাম। এখন আমার সমস্ত শরীর জুড়ে যে আনন্দের অনুরণন হচ্ছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

এই কথা বলে রামানুজ ঈষৎ কম্পিত পদক্ষেপে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে নির্গত হলেন। দূরে দাঁড়িয়ে থেকে অর্চক তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলেন। তিনি এইভাবে স্খলিত পদক্ষেপে রামানুজকে যেতে দেখে ভাবলেন যে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই বিষ একসঙ্গে দশজন মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তার মানে রামানুজের আয়ু আর কয়েক ঘণ্টা। একটু বাদেই তাঁকে ঘিরে শোক পালিত হবে।

পরের দিন রামানুজের মৃত্যু হল না। এই খবর শুনে অর্চক আবার অবাক হয়ে গেলেন। তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করল আর—এক নতুন বৈষ্ণব সংগীত। একদল পরম ভক্ত প্রবল উৎসাহ সহকারে খোল করতাল বাজিয়ে চিৎকার করে গাইছেন—'ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং মূঢ় মতে'। ঘরের বাইরে এসে অর্চক অবাক হয়ে দেখলেন যে, রামানুজকে নানা পুষ্প অলংকারে সুসজ্জিত করা হয়েছে। রামানুজের দুই চোখ অর্ধনিমীলিত। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বোধহয় অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা। তাঁর দেহ পৃথিবীতে আছে, কিন্তু আত্মা মহাকাশে হারিয়ে গেছে।

রামানুজের এই দেবতুল্য কান্তি দেখে অর্চকের মনের পরিবর্তন ঘটল। তিনি নিজের কৃতকর্মের কথা ভেবে অনুশোচনা করলেন। তিনি রামানুজকে স্পর্শ করার জন্য সামনে এগিয়ে গেলেন। অতি দ্রুত ছুটে গিয়ে রামানুজের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করলেন। তাঁর এই আচরণ দেখে সংকীর্তন থেমে গেল। যে প্রধান অর্চক অহংকারে মদমত্ত পায়ে পথ চলেন, সাধারণ মানুষকে মনুষ্যেতর জীব বলে উপেক্ষা করেন, তার চরিত্রের এই পরিবর্তন কেন?

অনুতাপবশত কাঁদতে কাঁদতে অর্চক বললেন, হে যতিরাজ, আপনি মানুষ নন, আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু। আমি আপনাকে হত্যা করার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলাম। এজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমার মতো দূরাত্মাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবার জন্য জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। তবে আর বিলম্ব কেন? আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করে পৃথিবীকে বিষমুক্ত করুন। আমি কত মানুষকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করেছি। আপনাকেও হত্যা করার জন্য বার বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু জানতাম না যে আপনি মৃত্যুকেও অতিক্রম করতে পারেন। আপনি যথার্থ মৃত্যুঞ্জয়ী। আপনি প্রলয়কালে কত যমকে নাশ করেছেন। আবার প্রলয় অবসানে কত যমের সৃষ্টি করেছেন। আপনার পা স্পর্শ করার যোগ্যতা আমার নেই। আপনি বলুন আমাকে কী শাস্তি দেবেন? যদি আমাকে নরকে থাকতে হয় তাহলেও আমি সেখানে যাব। ধীরে ধীরে হয়তো এভাবে আমার পাপ স্খালন হবে।

উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে করতে অর্চক বললেন—হে দীনশরণ, আপনি আর বিলম্ব করছেন কেন? আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারে স্থাপন করুন। মদমত্ত হাতির পদতলে প্রেরণ করুন। আমি যে বিষাক্ত জীবনের ভার আর বহন করতে পারছি না। আত্মগত সম্ভাষণে তিনি চিৎকার করে বললেন—তুমি কোথায়? তুমি এখনই এই মহাপাতককে গ্রাস করো। এই কথা বলতে বলতে প্রধান অর্চক উন্মত্তের মতো আচরণ করতে থাকলেন। তিনি ভূমির ওপর মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্ত বের করে ফেললেন। তাঁকে দেখে জনগণ একেবারে অবাক হয়ে গেল। সকলে মিলে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি আরো বেশি উন্মাদনা প্রকাশ করতে

থাকলেন। তিনি বুকে করাঘাত করে নিজেকে রক্তাক্ত করলেন। তাঁর সমস্ত শরীর রক্তরঞ্জিত হল। অশ্রুর সঙ্গে রক্ত মিশে এক অদ্ভুত মিশ্রণের জন্ম হল। তাঁর অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়।

রামানুজ ইতিমধ্যে বাহ্যদশা লাভ করেছেন। তিনি বললেন আর হিংসা, দ্বেষ পরায়ণ হয়ে এভাবে জীবন কাটিয়ো না। শ্রীরঙ্গনাথস্বামী তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন। ইনি হলেন পরম করুণাময়। তাঁর করুণার ওপর ভরসা রাখো।

অর্চক অবাক হয়ে রামানুজের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—হে ভগবন, আমার মতো এক মহাপাতককেও আপনি ক্ষমা করছেন? আমার এই শরীর আপনার দয়ায় গঠিত। কিন্তু আপনি কি এখনো আমাকে দয়া প্রদর্শন করবেন? হে দীনশরণ, চিরকাল আপনার এই কীর্তির কথা মানুষ ঘোষণা করবে।

রামানুজ পরম স্নেহভরে অনুতপ্ত অর্চককে বুকে টেনে নিলেন। রামানুজের স্পর্শে অর্চকের সমস্ত পাপ দূরীভূত হল। মনে হল অর্চক যেন অন্ধকার বিবর থেকে মুক্ত হয়ে আলোকিত প্রান্তে দাঁড়িয়েছেন।

আঠারো

দক্ষিণদেশে যজ্ঞমূর্তি নামে এক মহাপণ্ডিত বাস করতেন। তিনি আর্যাবর্ত পর্যটন করলেন। উত্তর ভারতের একাধিক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে এলেন। স্বীয় জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে তাঁর মনে অহংবোধ ছিল। তিনি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে বিবেচনা করতেন। বিরুদ্ধমত সহ্য করতে পারতেন না।

তিনি শুনলেন শ্রীরামানুচার্য নামে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মায়াবাদ খণ্ডন করে স্বমত প্রচার করছেন। তিনি আর দেরি না করে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হলেন। বেশ কয়েকটি পুস্তক পরিপূর্ণ একটি শকট তাঁকে অনুসরণ করল। যজ্ঞমূর্তি যখন কোথাও যেতেন তখন এই সকল আকর গ্রন্থগুলি সঙ্গে নিতেন। এই গ্রন্থগুলিই ছিল তাঁর সর্ব সময়ের সঙ্গী।

যতিরাজের সম্মুখীন হয়ে তিনি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাইলেন। এই কথা শুনে শান্তমূর্তি রামানুজ বললেন—মহাত্মা, তর্কের দরকার কি? আমি আপনার কাছে পরাস্ত হলাম। আপনি হলেন অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত। আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই আপনার জয়পতাকা উড্ডীন হবে।

এই কথা শুনে যজ্ঞমূর্তি বললেন—যদি আপনি নিজেকে পরাস্ত বলেই স্বীকার করেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি ভ্রান্ত বৈষ্ণব মত পরিত্যাগ করেছেন। আপনি এখন অভ্রান্ত মায়াবাদকে গ্রহণ করবেন।

যতিরাজ রামানুজ বললেন—মায়াবাদীরাও তো ভ্রান্তি, ভ্রান্তি বলে উন্মত্ত। তাঁদের মতে তর্ক যুক্তি সবই মায়া। তাই মায়াবাদকে কি অভ্রান্ত বলা যায়?

যজ্ঞমূর্তি বললেন—দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই হল মায়া। তাই মায়াবাদীরা বলেন এই তিনটি ত্যাগ না করলে কখনো অভ্রান্ত সত্যে পৌঁছোনো যায় না। আমরা যাকে ভ্রম বলি আপনারা তাকেই সত্য বলেন। তাই আপনারা ভ্রান্ত না হলে আমরা কী করে ভ্রান্ত হব।

এইভাবে শুরু হল প্রবল তর্কযুদ্ধ। সতেরো দিন পর্যন্ত এই তর্কযুদ্ধ চলতে থাকে। শেষদিন রামানুজের যুক্তিগুলি যজ্ঞমূর্তি খণ্ডন করলেন। রামানুজ এই ঘটনায় বেশ বিমর্ষ হন। তিনি স্বমঠে গমন করে মঠের দেববিগ্রহ শ্রীদেবরাজের সামনে বসে বললেন—হে ঈশ্বর, যে বৈষ্ণবশাস্ত্র পূর্ববর্তী মহানুভবগণ আত্মস্থ করেছেন, সে শাস্ত্র এখন মায়াবাদ রূপ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মায়াবাদীরা নানাধরনের যুক্তি অবতারণা করে মোহান্ধ জীবদের মোহিত করছে। তাদের তর্কজাল এমন ভ্রান্তি এনে দেয় যে সাত্ত্বিক মহাত্মাগণ মাঝে মাঝে চমৎকৃত হয়ে উঠেন। হে আনন্দধীমান, আর কতকাল আপনি আপনার সন্তানদের নিজের কাছ থেকে দূরে রাখবেন?

এই কথা বলে অসহায় যতিরাজ অশ্রুবারি বিসর্জন করতে লাগলেন। সেই রাত্রিশেষে স্বপ্নযোগে ঈশ্বর দেবরাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। তাঁর কাছে তিনি এই আশ্বাসবাণী পেলেন যে, যতিরাজ তুমি ভয়

পেও না। ভক্তিযোগের প্রকৃত মাহাত্ম্য তোমার মধ্যে দিয়ে আবার বিরচিত হবে। সারা জগতের পূর্ণাত্মা ব্যক্তিরা তখন ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারবে।

এই স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে যতিরাজের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি আনন্দ সাগরে অবগাহন করলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থেকে এক আশ্চর্য জ্যোতিপ্রভা উদ্ভাসিত হল। তিনি যজ্ঞমূর্তির মঠে উপনীত হলেন। তাঁর এমন রূপবিকাশ দেখে মায়াবাদী যজ্ঞমূর্তি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন এতকাল রামানুজ মলিন মুখে স্বমঠে প্রস্থান করেছিলেন। কিন্তু আজ দেখছি ইনি স্বয়ং দেবতার মতো অলৌকিক বিভা দ্বারা আলোকিত হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছেন। নিশ্চয়ই তিনি দৈববল আশ্রয় করেছেন। এর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এমন মহাপুরুষের শরণাগত হওয়াই ভালো। সারাটা জীবন আমি শুধু অহংকারের দাস হলাম। এর ফলে আমার চিত্তশুদ্ধিই হল না। চিত্তশুদ্ধি না হলে ব্রহ্মজ্ঞান কেমন করে হবে? কিন্তু এই মহাপুরুষের স্বভাব কি নির্মল। কোনো অসূয়াবোধ কখনো এঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি কখনো ক্রোধী হন না, অহংকারকে ত্যাগ করেছেন। অভিমানকে দূরে সরিয়ে রাখেন। এঁর মুখমণ্ডলে সদাসর্বদা এক অনির্বচনীয় জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। আমি এঁকে কতভাবে আক্রমণ করেছি, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেছি, তবু ইনি আমার প্রতি কোনো রাগ প্রদর্শন করেননি। ধিক আমাকে, এমন মলিন হৃদয় নিয়ে এই দেবতুল্য মানুষটির সমকক্ষ হবার চেষ্টা করেছি। তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমি আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। অহংকারকে সমূলে উৎপাটিত করব।

এই কথা বলে যজ্ঞমূর্তি রামানুজের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। রামানুজ এই ঘটনায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়ে বললেন—যজ্ঞমূর্তি, আপনি এক মহাপণ্ডিত হয়ে এমন আচরণ কেন করছেন? আজ তর্কের অবতারণা করতে দেরি করছেন কেন?

এই কথা শুনে যজ্ঞমূর্তি উত্তর করলেন—হে মহানুভব, যে তার্কিক এতদিন ধরে আপনাকে নানা বাক্যবাণে বিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল, সেই তার্কিক এখন আর আপনার সামনে দাঁড়িয়ে নেই। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, আপনি হলেন এক মহানুভব। আপনার সঙ্গে বৃথা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হব কেন? আপনি দেখুন আপনার সামনে এক ক্রীতদাস দাঁড়িয়ে আছে। আপনি তার প্রতি আপনার কৃপা দৃষ্টিপাত করুন। আজ থেকে আমি স্ব—ইচ্ছায় আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম। আমি সর্বজন সমক্ষে চিৎকার করে বলব যে আপনি আমার এ জীবনের একমাত্র গুরু। আপনি আপনার অমূল্য উপদেশ দ্বারা আমার চির অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে পবিত্রতার আলোকশিখায় আলোকিত করুন। বৃথা পাণ্ডিত্য আর অভিমানকে প্রশ্রয় দিয়ে আমি অহংকারী ভগবান হয়ে উঠেছি। হায়, আমার মতো মূর্খ আর এই ভূ—ভারতে কে আছে? আপনি আমাকে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে কৃতার্থ করুন।

যে অহংকারী অভিমানী যজ্ঞমূর্তিকে রামানুজ গতকাল প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই যজ্ঞমূর্তিকে আর তিনি চোখের সামনে খুঁজে পেলেন না। রামানুজের মনে হল এক শান্ত, ভদ্র, বিনীত এবং সুস্নাত পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। যজ্ঞমূর্তির চরিত্রের এই পরিবর্তনের অন্তরালে যে ভগবানের অপার করুণা ক্রিয়াশীল, রামানুজ তা উপলব্ধি করতে পারলেন। স্বপ্নে শোনা বাক্যগুলি তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি বরদারাজের কাছে এমন কথাই তো শুনেছিলেন। বরদারাজের অসীম কৃপায় দাম্ভিক পণ্ডিত বিনয়ভূষণে বিভূষিত হয়েছেন। এখন যজ্ঞমূর্তিকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বুঝি অমিত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি কখনো কারো প্রতি রূঢ় আচরণ করতে পারেন না।

রামানুজ মৃদুমধুর স্বরে বললেন—ধন্য যজ্ঞমূর্তি, ঈশ্বরের কৃপা পাষাণকেও বিগলিত করেছে। আমরা জানি অন্যান্য অভিমান ত্যাগ করা সহজ কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান সহজে বর্জন করা যায় না। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' কিন্তু সেই বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপে মনের ভিতর যুক্ত হয় তাহলে আমরা অহংকারী হয়ে উঠি। শ্রীভগবদকৃপায় এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভবপর করা যায়। আপনি অহংকারকে বিসর্জন দিয়েছেন। অসীম আপনার সৌভাগ্য।

যজ্ঞমূর্তি করজোড়ে বললেন—ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনার মতো এক জীবন্ত ভগবানকে আমি সাক্ষাৎ করেছি। আমার সৌভাগ্যের কোনো সীমা নেই। আমাকে আপনার এক মূর্খ সন্তান হিসাবে পরিগণিত করুন। জীবনের বাকি দিনগুলি আমি আপনারই সেবায় অতিবাহিত করব। আপনার প্রদর্শিত পথে চলে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাবার চেষ্টা করব। এখন বলুন, কীভাবে আমি তাঁর অনুগামী হতে পারি।

রামানুজ বললেন বৎস—

'হীনো যজ্ঞোপবীতেন যদি স্যাৎ জ্ঞান ভিক্ষুকঃ।
তস্য ক্রিয়া নিষ্ফলাঃ স্যুঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।।
গায়ত্রী সহিতানেব প্রাজাপত্যান যড়াচরেৎ।
পুনঃসংস্কারমাহৃত্য ধার্য্যং যজ্ঞোপবীতকম্।।
উপবীতং ত্রিদণ্ডযজ্ঞ পাত্রং জলপবিত্রকম্।
কৌপীনং কসিসূত্রজ্ঞ ন ত্যাজ্যং যাবদায়ুষম।।

এই বচন অনুসারে আপনি যজ্ঞউপবীত ধারণ করবেন। যজ্ঞমূর্তি সঙ্গে সঙ্গে উপবীত ধারণ করলেন। এরপর রামানুজ তাঁকে ঊর্ধ্বপন্ড্র ধারণ করালেন। তাঁর শরীরে শঙ্খ এবং চক্র এঁকে দিলেন। দেবরাজের কৃপায় তাঁর এমন চৈতন্য লাভ হয়েছে বলে রামানুজ বললেন—বৎস, এখন আপনার অতুল পাণ্ডিত্য অভিমান—মেঘ থেকে মুক্ত হয়েছে। আপনি গ্রন্থ প্রণয়ন করে মানুষের হিত সাধন করুন।

গুরুবাক্য অনুসারে যজ্ঞমূর্তি তামিল ভাষায় 'জ্ঞানসার' ও 'প্রমেয়সার' নামে দুটি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীরামানুজ যজ্ঞমূর্তির নিবাসের জন্য একটি বৃহৎ মঠ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার কিছুদিন বাদে চারজন মেধাবী, শান্ত, বৈরাগ্যবান যুবক রামানুজের কাছে এলেন। তাঁরা আর সংসারে থাকতে রাজি নন। সংসারের অনিত্যতা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা দীক্ষা নেবেন।

যতিরাজ তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন যজ্ঞমূর্তির কাছে। যতিরাজ বললেন, তোমরা যজ্ঞমূর্তির কাছে যাও, তাঁর কাছেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করো। তাঁর মতো মহাপণ্ডিত সারা পৃথিবীতে খুব বেশি পাওয়া যায় না। শুধু পাণ্ডিত্যই তাঁর ভূষণ নয়, তাঁর মধ্যে ভগবৎ ভক্তির চরম প্রকাশ ঘটে গেছে।

এই চারজন যুবক যজ্ঞমূর্তির কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যজ্ঞমূর্তি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে ভাবলেন না, তিনি ভাবলেন যে, এর ফলে তাঁর একক সাধনার ব্যাঘাত ঘটবে। অনেক কষ্টে তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমানকে বিসর্জন দিয়েছেন, এখন আবার সেই অভিমান যদি তাঁকে অধিকার করে তাহলে কী লাভ?

এই কথা চিন্তা করে তিনি শ্রীরামানুজের পাদমূলে উপনীত হলেন। অত্যন্ত দীনভাবে বললেন— প্রভু আমি আপনার সন্তান। তাহলে কেন আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করছেন?

রামানুজও প্রশ্ন করলেন— কেন কী হয়েছে?

যজ্ঞমূর্তি বললেন— পিতা, আপনার কৃপায় আমি অভিমানরূপ রাক্ষসের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি। আপনি কেন আমাকে আবার সেই জগতে নিক্ষেপ করছেন? গুরু হতে আমাকে আদেশ করবেন না। জলে পদ্মপত্রের মতো আমার নির্লিপ্তভাব এখনো আসেনি। আপনি আমাকে সদাসর্বদা নিজের দাস বলে মনে করবেন। আমার নতুন কোনো মঠের আবশ্যকতা নেই।

রামানুজ তার এই বাক্যে পরম প্রীত হলেন। তিনি যজ্ঞমূর্তিকে আলিঙ্গন করে বললেন— বৎস, আমি আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য এমন করেছি। এই পরীক্ষায় আপনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আপনি আমার কাছেই থাকবেন। মঠে দেবরাজের সেবা করে বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করবেন।

এইভাবে যজ্ঞমূর্তির জীবনে এক স্মরণযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি রামানুজের সান্নিধ্যেই জীবনের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন।

উনিশ

রামানুজ 'সহস্রগীতি' নামক একটি তামিল প্রবন্ধমালা শিষ্যদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই প্রবন্ধমালায় মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের নানা কথা ভাষ্য এবং উদাহরণ সহকারে বিবৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধমালার রচয়িতা বিশিষ্ট তামিল বুদ্ধিজীবী মঠারি। রামানুজ মহাপূর্ণ এবং মালাধরের কাছে যথেষ্ট যত্ন সহকারে এই প্রবন্ধমালা অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধমালার নতুন নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে একটি মৌলিক দিক উন্মোচিত হল। অনেক সময় তিনি এমন কিছু ব্যবহারিক উদাহরণ সংযোজন করলেন যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলতে পারে।

এই প্রবন্ধের এক জায়গায় শ্রীশৈল বা তিরুপতি স্থানের মাহাত্ম্য এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—শ্রীশৈল হল পৃথিবীর বুকে এক বৈকুণ্ঠ। যিনি এখানে আজীবন বাস করেন তিনি বৈকুণ্ঠেই বাস করে থাকেন। তিনি জীবনের শেষে বৈকুণ্ঠে গমন করে শ্রীনারায়ণের আশ্রয় পান।

পাঠ শেষ হলে রামানুজ তাঁর শিষ্যদের ডাকলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে ওই শ্রীশৈলে থেকে আজীবন দেবতার সেবা করতে চাও?

এই কথা শুনে অনন্তাচার্য নামে এক শান্ত স্বভাবের শিষ্য বললেন গুরু, যদি আদেশ করেন তাহলে সেই গিরিবরে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে নিজেকে কৃতার্থ করি।

রামানুজ এই কথা শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন—ধন্য বৎস, তোমার মতো পুত্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই বংশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। তুমি তোমার চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণস্বরূপ বিরাজ করবে। তোমার মতো মহান স্বভাবের শিষ্য পেয়ে আমি নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করছি।

অনন্তাচার্য রামানুজকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে শ্রীশৈলের উদ্দেশে গমন করলেন।

রামানুজ তারপর 'সহস্রগীতি' গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হলেন। পাঠ পরিসমাপ্ত হবার পর তিনি শিষ্যদের নিয়ে শ্রীশৈলের উদ্দেশে গমন করলেন। পথে যেতে যেতে তাঁরা নানাভাবে হরিনাম সংকীর্তন করছিলেন। দু—পাশের জনতা অতি উৎসুক চিত্তে তাঁদের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে বৈরাগ্য এবং ত্যাগের সঞ্চারণ ঘটে গেছে। প্রথমদিন তাঁরা দেহলীনগরে এসে বিশ্রাম নিলেন। পরের দিন এগিয়ে চললেন অষ্টসহস্র গ্রামের দিকে। ওই গ্রামে যজ্ঞেশ এবং বরদাচার্য নামে তাঁর দুজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। যজ্ঞেশ যথেষ্ট অর্থবান, রামানুজ যজ্ঞেশের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে চাইলেন। দুজন শিষ্যকে পাঠালেন নিজেদের আগমনের সংবাদ যজ্ঞেশের কাছে পৌঁছে দিতে। শিষ্যেরা অতি দ্রুত যজ্ঞেশের কাছে পৌঁছে তাঁকে এই খবর জ্ঞাপন করলেন।

যজ্ঞেশ এই খবর শুনে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যান। তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল তাঁর গৃহে অন্তত একবার গুরু রামানুজকে আমন্ত্রণ জানাবেন। আর ঘটনা পরম্পরায় তাঁর এই স্বপ্ন সফল হচ্ছে। এতে তাঁর আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না।

কীভাবে রামানুজকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন যজ্ঞেশ। গৃহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। দুই শ্রান্ত পথিকের পরিচর্যা করার কথা তাঁর মনে পড়ল না। দুজন পথিক গৃহস্বামীর এমন অবহেলা এবং ঔদাসীন্যে যথেষ্ট দুঃখ পেলেন। তাঁরা রামানুজের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন।

এই ঘটনার কথা শুনে রামানুজ খুবই কষ্ট পেলেন। তিনি বরদাচার্য নামে অন্য এক শিষ্যের আতিথ্য গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। এই দ্বিতীয় শিষ্যটি ছিলেন বিদুরের মতো দরিদ্র ও পবিত্র স্বভাবযুক্ত। তিনি রোজ সকালে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেন। দ্বিপ্রহরের পর ঘরে ফিরে আসতেন। ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা নারায়ণের নিত্যসেবা করতেন। তিনি এইভাবে তাঁর লক্ষ্মী নামে স্ত্রীর সঙ্গে সুখে শান্তিতে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁর ঘরের পাশে কয়েকটি কার্পাস গাছ থাকায় তাকে সকলে কার্পাসা রাম বলত।

রামানুজ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কার্পাসা রামের গৃহে প্রবেশ করলেন। এই সময় কার্পাসা রাম ভিক্ষা করার জন্য গ্রামে গমন করেছিলেন। গৃহে কোনো পুরুষকে না দেখে রামানুজ অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। লক্ষ্মীর কাছে নিজেদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। লক্ষ্মীদেবী তখন স্নান করে চীরখণ্ড ধারণ করে পাকশালায় বসেছিলেন। তাই গুরুর কাছে উপস্থিত হতে পারলেন না। তিনি করতালি ধ্বনি করে নিজের অবস্থান জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে রামানুজ তাঁর উত্তরীয় ঘরের ভিতর নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মীদেবী সেই উত্তরীয় দিয়ে নিজেকে আবৃত করে গুরুর সামনে এলেন। তাঁকে প্রণাম করে বললেন—হে মহাত্মা, আমার স্বামী ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য গ্রামে গেছেন। একটু বাদেই তিনি ফিরে আসবেন। আপনারা এখানে এসেছেন বলে আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে। সুখে উপবেশন করুন। এই জল দিয়ে হাত—মুখ ধুয়ে নিন। সামনেই পুকুর আছে, সেখানে স্নান করে ক্লান্তি দূর করতে পারেন। আমি শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য তৈরি করে দিচ্ছি।

এই কথা বলে শান্তস্বভাবা গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মীদেবী ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। ঘরে এক কণা চালও ছিল না। তিনি ভাবলেন কীভাবে শ্রীগুরুর সেবা করবেন? কীভাবে অভুক্ত, ক্লান্ত, শ্রান্ত অতিথিদের অন্ন পরিবেশন করবেন?

কাছেই এক ধণাঢ্য বণিকের বসবাস। এই বণিক লক্ষ্মীদেবীর অপরূপ রূপ দেখে বারবার মোহিত হয়েছিলেন। সে দূতী মারফত তার মনোগত বাসনার কথা লক্ষ্মীদেবীর কাছে বারবার উত্থাপন করেছে। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী কখনো কোনো পরপুরুষের কথা চিন্তায় আনতে পারেন না। তাই ওই ধনী ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করতে পারেনি। এজন্য লক্ষ্মীদেবীর প্রতি তার মনে চাপা উষ্মা ও রাগ ছিল।

লক্ষ্মীদেবী ভাবলেন যদি আমি এই অস্থি, মল—মূত্রময় দেহের বিনিময়ে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি তাহলে ক্ষতি কী? সেই খাদ্য দিয়ে গুরুর সেবা করতে পারব। পুরাণে এমন কথা অনেকবার শোনা গেছে। কলিঘ্ন নামের এক পরমভক্ত চৌর্যবৃত্তি করে ইষ্টদেবতার সেবা করেছিল। ভগবান তার প্রতি প্রীত হয়েছিলেন।

এই কথা চিন্তা করে লক্ষ্মীদেবী ভাবলেন তিনি শ্রেষ্ঠীর কাছে গিয়ে তার অভিলাষ পূর্ণ করবেন। আর অতিথি সৎকারের জন্য উপযুক্ত অর্থ বা খাদ্য সংগ্রহ করবেন।

তিনি অপর একটি দ্বার দিয়ে বাইরে চলে এলেন। বণিকের বিশাল অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে পরপর সাতটি দ্বার আছে। লক্ষ্মীদেবী একে একে প্রত্যেকটি দ্বার অতিক্রম করে বণিকের নিভৃত প্রকোষ্ঠে পৌঁছে গেলেন। বণিক লক্ষ্মীদেবীকে দেখে আনন্দে অবাক হয়ে যায়। সে ভাবতেই পারেনি যে পতিগতপ্রাণা লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তার নিভৃত কক্ষে এসে উপস্থিত হবে। লক্ষ্মীদেবী সরাসরি বললেন হে শ্রেষ্ঠী, আজ রাতে আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করব। আমার গুরু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আমার গৃহে আগমন করেছেন। তাঁদের সেবার উপযোগী দ্রব্য আহরণ করে পাঠাও। তাহলেই তোমার মনের বাসনা—কামনা পূর্ণ হবে।

বণিক একথা শুনে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। যে রমণীকে শ্রেষ্ঠী নিজের অঙ্কশায়িনী করার জন্য এতদিন ধরে চেষ্টা করেছে, আজ সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে। সে একের পর এক দূতীকে লক্ষ্মীর কাছে প্রেরণ করেছিল, দূতী মারফত প্রচুর ধন ও অলংকারও পাঠায়। লক্ষ্মীদেবী কিন্তু সবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শেষপর্যন্ত শ্রেষ্ঠী হতাশ হয়ে ভেবেছিল যে, তার সম্ভোগ বাসনা বুঝি পূর্ণ হবে না। ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে সেই লক্ষ্মীদেবী কিনা উপযাচিকা হয়ে তার কাছে এসেছেন? সে সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করে লক্ষ্মীদেবীর বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

লক্ষ্মীদেবী এরপর রন্ধনদ্রব্য সকল নিয়ে শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই নানা জাতীয় অন্নব্যঞ্জন তৈরি হল। সশিষ্য রামানুজকে এরপর লক্ষ্মীদেবী আহারের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। রামানুজ এবং তাঁর শিষ্যগণ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাপ্ত করলেন। তাঁরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে লক্ষ্মীদেবীকে আশীর্বাদ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে কার্পাসরাম নিজের ভিক্ষাবৃত্তি শেষ করে গৃহে ফিরে এলেন। তিনি সশিষ্য গুরুদেবকে দেখে আনন্দিত হলেন। আর যখনই শুনেছেন যে, লক্ষ্মীদেবী তাঁদের দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন, তখন তাঁর বিস্ময়ের কোনো সীমা পরিসীমা থাকল না। তিনি কপর্দকশূন্য দরিদ্র। মাধুকরী বৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো উপায় তাঁর জানা নেই, তাঁর সহধর্মিণী কোথা থেকে এত দ্রব্য আহরণ করলেন? এই বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তা করতে থাকলেন। তিনি ঘরে গিয়ে নিজ পত্নীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। লক্ষ্মীদেবী সমস্ত ঘটনার আনুপূর্বিক স্বামীর কাছে নিবেদন করলেন। আজ অবধি কোনো ঘটনা স্বামীর কাছে আড়াল করেননি। এটিই ছিল তাঁর চরিত্রের সবথেকে ইতিবাচক দিক। তারপর অবনত মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

বরদাচার্য এই ঘটনার কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন— আজ তুমি তোমার সতীত্বের যথার্থ পরিচয় দিয়েছে। গুরুরূপী নারায়ণই এই পৃথিবীতে একমাত্র পুরুষ। আর এই পৃথিবীর সমস্ত রমণীর তিনি পতি। অস্থি—মাংসময় দেহের বিনিময়ে তুমি সেই পরম পুরুষের সেবা করতে সক্ষম হয়েছো, এর থেকে বড়ো সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? আমি কী ভাগ্যবান! তোমার মতো এক পরম ভক্তিমতী রমণী আমার সহধর্মিণী। এই কথা বলে তিনি পত্নীর হাতে হাত রেখে গুরুদেবের কাছে এলেন। তারপর অনেকক্ষণ তাঁরা দুজন গুরুদেবের পায়ে নিজেদের স্থাপন করলেন। দরিদ্র বরদাচার্য রামানুজের কাছে স্ত্রীর আচরণের কথা নিবেদন করলেন। রামানুজ এই কথা শুনে খুবই অবাক হয়ে যান।

গুরুর আদেশ অনুসারে দম্পতি প্রসাদ গ্রহণ করলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অবশিষ্ট প্রসাদ নিয়ে ওই ধনী ব্যক্তির গৃহে গেলেন। বরদাচার্য বাইরে থাকলেন। লক্ষ্মীদেবী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রসাদ বণিককে নিবেদন করলেন। বণিক পরম আনন্দের সঙ্গে ওই প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রসাদের কী মাহাত্ম্য! ভোজন সমাপ্ত হবার পর দেখা গেল বণিকের মনে এক অবিস্মরণীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। যে পুরুষ লক্ষ্মীদেবীকে ভোগ করে ইন্দ্রিয় বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছিল, সেই পুরুষ এখন একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

লক্ষ্মীদেবীর প্রতি এখন আর তার কোনো কামনা নেই। সে লক্ষ্মীদেবীকে 'মা' সম্বোধন করে নিজের অন্তরের বেদনা নিবেদন করল। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমি কী মহাপাতক হতে উদ্যত হয়েছিলাম। নিষাদ যেমন দময়ন্তীকে স্পর্শ করতে গিয়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, আমারও অদৃষ্টে তাই ছিল। তোমার অপার করুণায় আমি এই যাত্রা বেচে গেলাম। তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করো। আমাকে মা তুমি ক্ষমা করো এবং পরিশুদ্ধ হবার পথ দেখাও। যাতে আমি আর কখনো পাশব প্রবৃত্তির বশবর্তী না হই। তোমার অভীষ্ঠ দেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়ে আমায় কৃতকৃতার্থ করো।

লক্ষ্মীদেবী বণিকের এই কথায় খুবই খুশি হলেন। তাঁর হৃদয়ে সমস্ত আবেগ দূর হয়ে গেল। তাঁর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকল একথা ভেবে তিনি নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি পতির সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। এর ফলে বরদাচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা দুজনে ওই বণিকের সঙ্গে নিজের গুরুর কাছে উপনীত হলেন। বণিক রামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন।

শিষ্যগণ এই অভূতপূর্ব ঘটনা দেখে চমৎকৃত হয়ে যান। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে এই সমস্ত ঘটনার অন্তরালে শ্রীরামানুজের কৃপাই বিদ্যমান। রামানুজ তাঁর পবিত্র কর দ্বারা ওই দরিদ্র দম্পতিকে স্পর্শ করলেন। তাঁদের জীবনের যাবতীয় দুঃখ—কষ্ট বিনাশ করলেন। বণিক পরম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। রামানুজও তাঁকে দীক্ষিত করলেন। বণিক প্রভূত সম্পদ দরিদ্র দম্পতির হাতে তুলে দিলেন, যাতে সারাজীবন তাঁরা সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ দম্পতি এই অর্থ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, হে ঈশ্বর, ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা যা সংগ্রহ হয় তাতেই আমাদের ভরণ—পোষণ হয়ে যায়। আমরা জানি অর্থই অনর্থের মূল। অর্থ

পেলে আমরা হয়তো ঈশ্বরকে ভুলে যাব। তাই এমন অর্থ গ্রহণ করার জন্য কখনো আমাদের অনুরোধ করবেন না।

রামানুজ এই কথা শুনে খুবই খুশি হলেন। তিনি ভক্তিমান ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন—তোমার মতো মহাত্মাকে স্পর্শ করে আমি পবিত্র হলাম। তোমার নির্লিপ্তি এবং নিস্পৃহতা সকলেরই অনুকরণীয় হওয়া উচিত।

যখন সেখানে এমন ঘটনা ঘটছিল তখন যতিরাজের ধনবান শিষ্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি স্বগৃহে গুরুকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি গুরুর জন্য ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন। পরে যখন শুনলেন যে গুরুদেব দরিদ্র কার্পাসরামের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন তখন তিনি খুবই কষ্ট পান। তিনি ভাবলেন এমন কী অপরাধ করেছি যাতে গুরু আমার সেবা গ্রহণ করলেন না? নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে। তা না হলে কেন গুরু আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যকে কৃতার্থ করবেন?

একথা চিন্তা করতে করতে তিনি ভয়ে ভয়ে রামানুজের কাছে উপনীত হন। গুরুদেবকে প্রণাম করে ক্রন্দন করতে থাকেন। রামানুজ তাঁর ধনবান শিষ্য যজ্ঞেশকে সব ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললেন। তিনি বললেন—শোনো, আমরা তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিনি, সেজন্য তোমার রাগ হয়েছে। এর কারণ বৈষ্ণব অপরাধ। বৈষ্ণব সেবার মতো পরম ধর্ম আর আছে কি? তুমি কেন বৈষ্ণব সেবায় নিজেকে নিয়োগ করলে না? আমি আমার দুজন শিষ্যকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা পদব্রজে এতটা পথ গিয়ে তোমার প্রাসাদে পৌঁছেছিল। তুমি তাদের পা ধোয়ার মতো জলও দাওনি, বসবাসের জন্য একবারও বলনি। তোমার এই আচরণ কি মানা যায়? তাই আমি তোমার গৃহে যেতে চাইলাম না। আর দ্যাখো, এই নিঃস্ব—রিক্ত ব্রাহ্মণ আমায় কী অমৃত ভোজন করিয়েছে। এত সুখ শান্তি কি তোমার বাড়িতে পেতাম?

এই কথা শুনে যজ্ঞেশ তার অপরাধের বিষয় বুঝতে পারলেন। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে বললেন—হে গুরু, আমি অর্থবান বলে এমন আচরণ করিনি, আপনি আসবেন একথা শুনে আমার চেতনা লোপ পেয়েছিল। আমার বড়োই দুর্ভাগ্য। কারণ এ যাত্রায় আমি আপনার সেবা করতে পারলাম না।

এই কথা বলে যজ্ঞেশ নিজেকে ধিক্কার দিয়ে করুণ স্বরে রোদন করতে থাকলেন। রামানুজ শ্রীশৈল থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবেন, এই কথা শুনে যজ্ঞেশ তখনকার মতো শান্ত হয়েছিলেন।

কুড়ি

রামানুজ অষ্টসহস্র গ্রাম পরিত্যাগ করলেন। তিনি শিষ্যদের নিয়ে কাঞ্চীপুরের দিকে যাত্রা করলেন। দুপুরে সেখানে পৌঁছে বরদারাজস্বামীর মন্দিরে গেলেন। তারপর মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। এখানে তাঁরা তিন রাত ছিলেন। এবার কাপিল তীর্থে যেতে হবে।

রামানুজ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কাপিল তীর্থে পৌঁছে গেলেন। সেই দিনই শ্রীশৈলের পাদদেশে উপনীত হলেন। অনেকদিন ধরে তাঁর মনে একটি আশা ছিল, জীবনে অন্তত একবার শৈলধামে পদার্পণ করবেন। তাই সেখানে পৌঁছে তাঁর আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা থাকল না। অনেকক্ষণ তিনি অনিমেষ নয়নে ভুবৈকুণ্ঠের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর সমস্ত শরীরে তখন এক স্বর্গীয় শিহরণের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর চোখ থেকে নির্গত হল আনন্দের অশ্রু।

চোখ বন্ধ করে তিনি ভাবলেন এই হল সেই পবিত্র স্থান যেখানে হরি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিরাজ করছেন। তাই এখানকার প্রাকৃতিক শোভা এত মনোরম। পৃথিবীর সমস্ত পুণ্য এখানেই স্থিত। এখানেই লক্ষ্মী—নারায়ণের অবস্থান। আমি আমার কলুষিত শরীর নিয়ে এখানে বেশিক্ষণ থাকব না। আমি দূর থেকে এই অঞ্চলটির দিকে তাকিয়ে থাকব।

এই কথা ভেবে রামানুজ শ্রীশৈলের পাদদেশে বসবাস করতে থাকলেন। সেখানকার রাজা ছিলেন বিট্‌ঠলদেব। তিনি লোক মারফত রামানুজের আগমন সংবাদ শুনলেন। অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর

কাছে হাজির হলেন। বিটঠলদেব চেয়েছিলেন তিনি রামানুজের শিষ্যত্ব লাভ করবেন। করুণ হৃদয় রামানুজ সংস্কার দ্বারা বিটঠলদেবের শুদ্ধি বিধান করলেন। তারপর তাঁকে নিজের শিষ্য বলে গ্রহণ করলেন। গুরুদক্ষিণা স্বরূপ বিটঠলদেব ইলমণ্ডীয় নামে এক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ রামানুজকে দান করলেন। রামানুজ এই অঞ্চলটি দরিদ্র ব্রাহ্মণদের দান করে পরম আনন্দ লাভ করলেন।

শ্রীশৈলস্থ সাধু ও তপস্বীগণ রামানুজের আগমনবার্তা শুনেছেন। তাঁরা লোকমুখে রামানুজের নাম শুনেছেন। রামানুজ যে স্বয়ং ঈশ্বর এই খবর তাঁদের কানে গিয়েছিল। তাঁরা রামানুজকে দেখবার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু যখন তাঁরা শুনলেন যে রামানুজ পাদস্পর্শ ভয়ে শ্রীশৈলশিখরে আরোহণ করবেন না, তখন তাঁরা দলবদ্ধভাবে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন। তাঁরা বিনীতভাবে বললেন—হে মহাত্মা, আপনার মতো মহাত্মা যদি পাদস্পর্শের ভয়ে শৈলশিখরে আরোহণ না করেন, তাহলে তো সাধারণ মানুষও এমন আচরণ করবে। তারা ভাববে যখন পবিত্র স্বভাব রামানুজ শৈলারোহণ করেননি, তখন আমাদের আর কথা কি? আমরা তো মলিন স্বভাবের অধিকারী। তাই তারা ঈশ্বর সমীপেও যাবে না। আপনি কালবিলম্ব না করে শ্রীশৈলে চলে আসুন। আপনি মহাত্মা মানুষ। আপনার অন্তরে হরির বসবাস। ভক্তিই শ্রীহরির একমাত্র প্রিয় পদার্থ। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে, নারায়ণ সেখানে বিরাজ করেন। আপনাদের মতো মহাপুরুষরা এই তীর্থস্থলে আসেন বলেই তীর্থ আরো পবিত্র হয়ে ওঠে।

এই কথা শুনে রামানুজ বুঝতে পারলেন এখনই তাঁকে শ্রীশৈলধামে প্রবেশ করতে হবে।

তুঙ্গদেশে উঠতে তাঁর শরীর শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হল। গিরিশিখর থেকে ভগবানের প্রসাদ এবং চরণামৃত তাঁর কাছে আনা হল। এই প্রসাদ এবং চরণামৃত এনেছিলেন বৃদ্ধ পরমভক্তিমান শ্রীশৈলপূর্ণ। তিনি তা রামানুজের হাতে তুলে দিলেন। সেই ঋষিতুল্য মহাপুরুষকে দেখে রামানুজ বললেন— হে মহাত্মা, আপনি কেন এমন কাজ করলেন। আমি আপনার অধম দাস। আপনি নিজে হেঁটে এতটা পথ আমার কাছে এলেন। যেকোনো বাহককে বললে সে—ই এই কাজ করতে পারত।

শ্রীশৈলপূর্ণ বললেন—হে রামানুজ, আমিও ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার থেকে হীনমতি বালক আর কে আছে? তাই আমি এই বহনভার সহ্য করেছি।

শৈলপূর্ণের এমন কথায় রামানুজ চমৎকৃত হয়ে বললেন—আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হল। আপনার কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে হয় কীভাবে দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করা যায়।

তাঁরা সকলেই ওই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সশিষ্য রামানুজ পৌঁছে গেলেন বেঙ্কটনাথের মন্দিরের সামনে। শৈলবাসী শিষ্য অনন্তাচার্য এসে তাঁর পায়ের ধুলো গ্রহণ করলেন। রামানুজ তাঁর শিষ্যকে আশীর্বাদ করলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করে বেঙ্কটনাথের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর সমস্ত বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছিল। বেঙ্কটনাথের পূজারীরা তাঁকে পাদতীর্থ প্রদান করেন। তাঁর হাতে প্রসাদ তুলে দেন। তিনি শিষ্যদের সঙ্গে মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এবার অন্য দেবদেবীর বিগ্রহ দর্শন করেন। তারপর পৌঁছে গেলেন সর্বতীর্থময় পুণ্যোদক সরোবরে। এই সরোবরের জল অত্যন্ত পবিত্র। কথিত আছে এখানে অবগাহন করলে চিত্তের মালিন্য চিরকালের জন্য দূরীভূত হয়। সব পাপের অবসান হয়ে যায়। রামানুজ সেখানে স্নান সারলেন। ত্রিরাত্র সেখানে বাস করে আবার অবরোহণ করলেন।

শ্রীশৈলপূর্ণের শিষ্য গোবিন্দ তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। গোবিন্দের সঙ্গে তাঁর বাল্যকালের অনেক স্মৃতি বিজড়িত। তাঁরা দুজনেই সমবয়সি, শৈশব থেকেই একসঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছেন। অনেকদিন পরে বাল্যবন্ধুকে দর্শন করলেন রামানুজ। তিনি জানেন গোবিন্দের জন্যই তাঁর প্রাণ একসময় রক্ষা পেয়েছিল। শৈলপূর্ণ গোবিন্দকে বৈষ্ণবধর্মে পূর্ণদীক্ষিত করে রামানুজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর রামানুজ তাঁকে গুরু সন্নিধানে প্রেরণ করেন। তখন থেকে গোবিন্দ এই শ্রীশৈলপূর্ণের কাছেই বসবাস করছেন। তাঁর জীবনের স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যতের সঙ্গে গুরু অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। গুরুর সেবাকেই তিনি

পরম সেবা বলে জ্ঞান করতেন। গুরু ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা করতেন না। গোবিন্দকে দেখে মনে হয় যে তাঁর স্বভাব বুঝি পাঁচ বছরের বালকের মতো।

গিরিশিখর থেকে অবরোহণ করে রামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের অনুরোধে তাঁর আলয়ে একবছর বসবাস করেছিলেন। মহাত্মা শৈলপূর্ণ এক বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদ। রামায়ণের ঘটনাবলি ভাষ্য সহকারে উপস্থাপন করতেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের ব্যাখ্যা শুনে যতিরাজ রামানুজ খুবই খুশি হয়েছিলেন।

এখানে বসবাসকালে তিনি গোবিন্দের দৈনন্দিন জীবনচর্চা দেখেও আনন্দিত হন। একদা তিনি দেখলেন যে তাঁর বাল্যবন্ধু গুরুর জন্য শয্যা রচনা করে নিজেই সেখানে শয়ন করছেন। এতে যতিরাজ যথেষ্ট অবাক হন। তিনি শৈলপূর্ণের কাছে পুরো ব্যাপারটি নিবেদন করলেন। শৈলপূর্ণ গোবিন্দকে ডেকে এনে প্রশ্ন করলেন—তুমি আমার শয্যায় কেন শয়ন করেছ? জানো গুরুর শয্যায় শয়ন করলে কী দোষ হয়? তার জন্য কী শাস্তি হতে পারে?

গোবিন্দ স্থিরভাবে জবাব দিলেন যে, এজন্য দীর্ঘকালীন নরকবাস করতে হবে।

শৈলপূর্ণ বললেন—সব কথা জেনে তুমি কেন এই কাজ করলে? গোবিন্দ বললেন নরকবাস জেনেও ইচ্ছা করেই আপনার শয্যায় শয়ন করি। শয্যা সুখস্পর্শ হল কিনা, তাতে শয়ন করলে আপনার সুখনিদ্রা হবে কিনা সেটি দেখার জন্যই আমি এমন কাজ করে থাকি। তাই আমাকে যদি নরক গমন করতে হয় তাহলেও আমি এই কাজ থেকে বিরত হতে পারব না। আমার নরকবাস দ্বারা যদি আপনার সুখ—স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়, তাহলে আমি স্বর্গে থাকার থেকে নরকে থাকাকেই শ্রেয় বলে মনে করব।

রামানুজ এই কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি অজ্ঞানবশত গোবিন্দ সম্পর্কে নানা কুচিন্তা করছিলেন, সেজন্য মনে মনে লজ্জিত হলেন। এমনকি গোবিন্দর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা পর্যন্ত করলেন।

একদিন রামানুজ দেখলেন গোবিন্দ একটা সাপের মুখের ভিতর আঙুল প্রবেশ করিয়ে তাঁকে সবেগে টেনে নিলেন। সাপটি যন্ত্রণায় মৃতকল্প হয়ে গেল। তারপর গোবিন্দ স্নান করে রামানুজের কাছে এলে রামানুজ জানতে চাইলেন তুমি এ কি করলে? একটা বিষাক্ত সাপের মুখে আঙুল প্রবেশ করালে কেন? তোমাকে যেকোনো মুহূর্তে সাপটি দংশন করতে পারত। তুমি বালকের ন্যায় এমন আচরণ কেন করলে? তাছাড়া এই নিরপরাধ জীবটি এমন আচরণের ফলে মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে। তুমি জানো ঈশ্বর মানুষ এবং মনুষ্যেতর সকল জীবের প্রতি একইরকম দয়াবান। তুমি এক সদাশয় পুরুষ, তুমি কেন এমনভাবে একটি জীবকে কষ্ট দিলে?

গোবিন্দ বললেন—ভাই, কোনো একটি কাটাযুক্ত দ্রব্য ভোজন করে সাপটির গলায় কাঁটা বিঁধে যায়। সাপটি যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। তাই আমি সাপটির মুখে আঙুল দিয়ে সেই কাঁটাটি বের করে দিয়েছি। ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ক্লান্তিবশত এখন সে নির্জীব অবস্থায় পড়ে আছে। একটু পরে ও সুস্থ হবে। তার জন্য চিন্তা কোরো না।

এই কথা শুনে রামানুজ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। গোবিন্দ যে একটি সাপেরও সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করেন, এমন কোনো মানুষ কি আর কখনো এই পৃথিবীতে আসবেন?

একবছর কেটে গেল। এবার গুরুদক্ষিণা দিয়ে শ্রীশৈলপূর্ণের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। শৈলপূর্ণ বললেন, বৎস রামানুজ, তোমার কি কোনো প্রার্থনা আছে? যদি সেই প্রার্থনা আমি পূরণ করতে পারি তাহলে আমার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকবে না।

রামানুজ বললেন—হে মহাশয়, আপনার দেবতুল্য শিষ্য গোবিন্দকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। গোবিন্দ যে শুধু আমার আত্মীয় তা নয়, সে হল আমার বাল্যবন্ধু। সে একবার তার উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। অনুগ্রহ করে তাকে আমায় অর্পণ করুন। এটাই হল আমার একমাত্র প্রার্থনা।

একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে শৈলপূর্ণ তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে রামানুজের হাতে সমর্পণ করলেন। গোবিন্দকে পেয়ে রামানুজের আনন্দ একেবারে আকাশ স্পর্শ করল। তিনি আর কালবিলম্ব না করে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে

ঘটিকাচলে গমন করলেন। সেখানে নৃসিংহদেবকে দর্শন করে যথেষ্ট খুশি হলেন। সেখান থেকে এলেন পক্ষিতীর্থে। দেবদর্শন ও স্নান, দান ইত্যাদি শেষ করে কাঞ্চীপুরে ফিরে এলেন।

শ্রীবরদারাজস্বামীকে দেখে তাঁর হৃদয় আবার আনন্দে পরিপূর্ণ হল। কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। গোবিন্দের গুরুভক্তির কথা শুনে কাঞ্চীপূর্ণ পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। রামানুজ বললেন—হে মহাত্মা, আপনি আমার ভাই গোবিন্দকে আশীর্বাদ করুন। সারাজীবন ধরে সে যেন এমনভাবে সকলের সেবা করতে পারে।

কাঞ্চীপূর্ণ হেসে বলেছিলেন, তোমার ইচ্ছা সর্বদাই ফলবান হবে। তুমি যখন যার ভালো চাও সেই তখন ভালোর দিকে এগিয়ে যায়। তোমার মতো শুদ্ধ চরিত্রসম্পন্ন মানুষ এই পৃথিবীতে দুর্লভ।

গোবিন্দের মুখে মালিন্য দেখে কাঞ্চীপূর্ণ বললেন, গুরুসেবার অভাবে গোবিন্দের এমন অবস্থা হয়েছে। তুমি ওকে এখানে আটকে রেখো না। ওকে শৈলপূর্ণের কাছেই পাঠিয়ে দাও।

রামানুজ বুঝতে পারলেন যে, এইভাবে গোবিন্দকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আনা উচিত হয়নি। তিনি গোবিন্দকে সঙ্গে সঙ্গে গুরুর কাছে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। গোবিন্দও সরল পথ ধরে তখনই গুরুগৃহে যাত্রা করলেন। শৈলপূর্ণ শিষ্যের আগমনবার্তা শুনে একবারও তাঁর দিকে তাকালেন না। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হল। সকলে ভোজন সমাপন করলেন। কিন্তু শৈলপূর্ণ গোবিন্দকে ভোজনের জন্যও ডাকলেন না।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হল। গোবিন্দ অনাহারে বাইরে বসে আছেন।

শৈলপূর্ণের সহধর্মিণী এই ঘটনাটি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, আপনি গোবিন্দের সঙ্গে কথা বলুন বা নাই বলুন, তাঁকে ভোজন করার আদেশ করুন।

শৈলপূর্ণ বললেন যে অশ্ব বিক্রীত হয়েছে, তাকে তৃণ দিতে আমি আর কর্তব্যবদ্ধ নই। সে নতুন প্রভুর কাছেই প্রতিপালিত হবে।

গোবিন্দ এমন কথা শুনে অনাহারেই কাঞ্চীপুরে ফিরে এল। তারপর রামানুজের পা স্পর্শ করে বললেন—রামানুজ, আপনি আর আমায় ভ্রাতা সম্বোধন করবেন না। আমি আমার পূর্বগুরুর মুখ মারফত জানতে পারলাম যে এখন আপনিই হবেন আমার গুরু। বলুন আমাকে কী করতে হবে?

অনাহারে ও দীর্ঘ পথ পরিশ্রমে ক্লান্ত গোবিন্দের শ্রান্ত মুখচ্ছবি দেখে রামানুজ খুবই কষ্ট পেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের স্নানের ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে উপযুক্ত আহার ভোজন করালেন। আগে গোবিন্দ যেভাবে শৈলপূর্ণের সেবা করতেন, এখন তিনি ঠিক সেইভাবেই গাঢ় ভক্তি এবং ভালোবাসার দ্বারা রামানুজের সেবা করতে শুরু করলেন।

কাঞ্চীপুরে তিন রাত বসবাস করার পর তাঁরা অষ্টসহস্র গ্রামে উপনীত হলেন। যেখানে গিয়ে তাঁর ধনবান শিষ্য যজ্ঞেশের সেবা গ্রহণ করলেন। যজ্ঞেশের অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ হল। যজ্ঞেশের প্রাসাদে একরাত থেকে গোবিন্দ এবং অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরে এলেন। শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর মূর্তির সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অনিমেষ নয়নে দেবতার মূর্তি অবলোকন করলেন। তারপর আবার তাঁর দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে প্রবৃত্ত হলেন।

একুশ

সম্পর্কে শৈলপূর্ণ হলেন গোবিন্দর মামা। গোবিন্দ বুঝতে পারলেন যে বিশেষ উদ্দেশ সাধনের জন্য শৈলপূর্ণ তাকে রামানুজের কাছে প্রেরণ করেছেন। হয়তো গোবিন্দ রামানুজের সান্নিধ্যে জীবনের এক নতুন অর্থ নিরুপণ করতে পারবেন। তখন থেকে তিনি রামানুজের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করলেন। দু—এক দিনের মধ্যেই বুঝে নিলেন যে রামানুজের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহে কোন বস্তুর প্রয়োজন।

এরপর থেকে তিনি সদা সর্বদা রামানুজের সেবায় রত থাকতেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কীভাবে রামানুজকে পরিতৃপ্ত করা যায় সেদিকে তাঁর কঠিন কঠোর দৃষ্টি ছিল। রামানুজের মুখের অভিব্যক্তি দেখে গোবিন্দ বুঝতে পারতেন তাঁর কী প্রয়োজন। রামানুজ সহজ—সরল জীবনযাপনের অভিসারী ছিলেন। তিনি

বাহুল্য পছন্দ করতেন না। গোবিন্দের এই গুরুভক্তি দেখে রামানুজের অন্যান্য সদস্যরা আবেগে অভিভূত হতেন। তাঁরা সর্বদা গোবিন্দের প্রশংসা করতেন।

গোবিন্দ বলতেন, আমি ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে রামানুজকে সেবা করার অধিকারী হয়েছি। এজন্য নিজেকে যথেষ্ট ভাগ্যবান বলে মনে করি।

এই খবর রামানুজের কানে পৌঁছে গেল। রামানুজ গোবিন্দকে ডেকে বললেন, তোমার সৎগুণ দর্শনে এই ভক্তরা প্রশংসা করছেন, এতে কি তোমার অহংকার এসেছে?

গোবিন্দ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, মহাত্মা অনেক লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মোহান্ধ জীব মানবজন্ম লাভ করে। বহু জন্মের পর বর্তমান জন্মে আশ্রয় করার পর তার মনে অহংকার আসে। এই অহংকারকে দূর করতে হবে। আপনার করুণা ছাড়া অহংকার দূর করা কখনোই সম্ভব নয়। আমার মধ্যে যে সকল গুণ এবং ইতিবাচক ভাবনাগুলি আছে তা আপনার দ্বারাই সংরক্ষিত। আমি জড়মতি এবং হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন। যখন কেউ আমার সৎগুণের প্রশংসা করেন, পরোক্ষভাবে তিনি আপনারই প্রশংসা করেন। আপনার প্রশংসা আমাকে যথেষ্ট অহংকারী করে তোলে।

এই কথা শুনে আরো একবার রামানুজ অবাক হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন গোবিন্দের মধ্যে কতখানি প্রজ্ঞা এবং ঋদ্ধির জন্ম হয়েছে।

একদিন গোবিন্দ প্রাতঃকৃত্য সমাপন না করে এক বারাঙ্গনার বর্হিদ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁকে দেখে সতীর্থরা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা রামানুজের কাছে গিয়ে গোবিন্দের এই বিসদৃশ আচরণ সম্পর্কে রামানুজ সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দকে ডেকে জানতে চাইলেন—গোবিন্দ তুমি কেন প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন না করে এক বারাঙ্গনার দ্বারে চলে গেলে?

এর উত্তরে গোবিন্দ বললেন—ওই অঙ্গনা সুমধুর কণ্ঠস্বরে রামায়ণ গান করছিলেন। সেই গান শোনার জন্য আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই আমার প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করার সময় হয়নি।

এই ঘটনার মাধ্যমে গোবিন্দের চরিত্রের সারল্য আরো একবার সকলের কাছে উদ্ঘাটিত হল।

শৈলপূর্ণের ভগিনী অর্থাৎ গোবিন্দের জননী এলেন রামানুজ সন্নিধ্যানে। তিনি এসে বললেন—বৎস, গোবিন্দ—পত্নী ঋতুমতী হয়েছে। গোবিন্দর উচিত সহধর্মিণীর ধর্ম রক্ষা করা। কিন্তু আমার কথা শুনে সে তোমাকে ছেড়ে যাবে না। তোমাকে সে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করে। তাকে আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। সে বলেছিল, যখন যতিরাজের সেবার পর একান্তে বসবাসের মতো সময় হবে তখন পত্নীকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছি না তোমার সেবা করার পর অবসর সে পাবে কি না। সবসময় দেখি সে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত আছে।

শ্রীরামানুজ একথা শুনে গোবিন্দকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন— বৎস, তুমি আজকে তোমার পত্নীর সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করবে।

গোবিন্দ গুরুর আদেশ শিরোধার্য করলেন। ক্রমে রজনি এল মহাকালের দরজায়। সেই রজনিতে গোবিন্দ তাঁর পত্নীর পাশে গিয়ে শয়ন করলেন। তিনি নানা ধরনের সৎ বাক্যালাপের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

রাত্রি অতিবাহিত হলে গোবিন্দ—জননী বঁধূর মুখে সমস্ত কথা শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে উদ্দেশে গোবিন্দকে তার স্ত্রীর শয্যায় পাঠানো হয়েছিল সেই উদ্দেশ সফল হয়নি। রামানুজের কাছে গিয়ে তিনি সব কথা নিবেদন করলেন। রামানুজ গোবিন্দকে ডেকে এনে বললেন—আমি বলেছিলাম, তুমি তোমার সহধর্মিণীর ধর্ম রক্ষা করবে। সেইজন্য এক শয্যায় শয়ন করবে। তুমি আমার কথা অমান্য করে সারারাত তার সঙ্গে ধর্ম আলোচনায় কাটিয়ে দিয়েছ। এর কারণ কি?

গোবিন্দ বললেন, মহাত্মা, আপনি আমাকে তমগুণ পরিত্যাগ করে ভার্যার সঙ্গে শয়ন করতে আদেশ করেছিলেন। আমি সেই অনুসারেই কার্য করেছি। আপনি প্রজ্ঞাবান, আপনি জানেন তমগুণ পরিত্যাগ করলে

হৃদয়ে অন্তর্যামী পুরুষের প্রকাশ হয়। সেখানে কামনা—বাসনার স্থান কোথায়?

গোবিন্দের এমন কথাবার্তা শুনে রামানুজ আরো একবার চমৎকৃত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে তিনি বললেন গোবিন্দ তোমার মনের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে তোমার উচিত এখনই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করা। এটিই হল শাস্ত্রের নিয়ম। তুমি গার্হ্যস্থ জীবনের কর্তব্যাদি সম্পাদন করতে পারবে না। যদি তুমি তোমার ইন্দ্রিয়সমূহের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হও, তাহলে অবিলম্বে সংসারের সকল প্রলোভন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করো।

এই কথা শুনে গোবিন্দের মনে হল এ যেন দৈববাণী। কত বছর ধরে তিনি এই শুভ মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, প্রভু আমি এখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাই।

যতিরাজ রামানুজ কালবিলম্ব না করে গোবিন্দ—জননীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করলেন। তারপর গোবিন্দকে পঞ্চ—সংস্কারে সংস্কৃত করলেন। তাঁকে দণ্ড কমণ্ডুল দান করলেন। পরমহংস পদে গোবিন্দ উন্নীত হলেন।

গোবিন্দের শরীর থেকে তখন এক অলৌকিক আভা বের হচ্ছিল। তাঁর মুখাবয়বে ছিল স্বর্গীয় অভিব্যক্তি। গোবিন্দকে দেখে মনে হল তিনি বুঝি শুদ্ধ জ্ঞান—ভক্তিময় এক পরম বিগ্রহ। তাঁকে যতিরাজ 'মন্নাথ' আখ্যা দিয়েছেন। রামানুজ এই নামেই তাঁর শিষ্যদের দ্বারাই অভিহিত হতেন। কিন্তু স্বীয় নাম তিনি গোবিন্দকে অর্পণ করলেন। গোবিন্দকে তিনি যথেষ্ট ভালোবাসতেন। কিন্তু নিজের নামের সঙ্গে রামানুজের নাম গোবিন্দ যুক্ত করতে চাইলেন না। তিনি 'মন্নাথ' এই পদটিকে তামিল ভাষায় রূপান্তরিত করে 'এম পেরুমানার'—এই পদ নিষ্পন্ন করলেন। তারপর 'এম আর' বা 'এমার' পদসিদ্ধ করলেন। এটিই হল গোবিন্দের নাম।

শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে 'এমার মঠ' নামে একটি বিখ্যাত মঠ আছে। এই মঠটি স্বয়ং রামানুজ দ্বারাই নির্মিত। গোবিন্দর নাম অনুসারেই এই মঠের নামকরণ করা হয়েছিল।

তখন রামানুজের শ্রীরঙ্গমের মঠে বেশ কয়েকজন শিষ্য অবস্থান করছেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁরা যথেষ্ট ভক্তিনিষ্ঠা সহকারে সমগ্র বেদ পাঠ করেছেন। দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা কণ্ঠস্থ করেছেন। তাঁরা পীঠাধিপতি নামে অভিহিত।

এই সকল শিষ্য পরিবৃত হয়ে শ্রীরামানুজ ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় মগ্ন থাকতেন। শাস্ত্রালাপে নিজেকে নিয়োগ করতেন। এইভাবে এক—একটি দিন অতিবাহিত হতে লাগল। মনে হল এই মঠে বুঝি স্বর্গ নেমে এসেছে।

বাইশ

সেদিন রামানুজ পরম শ্রদ্ধাভরে মহাপ্রয়াত গুরু যামুনাচার্যের গুণ বর্ণনা করছিলেন। তাঁর সামনে উপস্থিত শিষ্য এবং ভক্তবৃন্দ সেই নামকীর্তন শুনে আনন্দিত হলেন। যামুনাচার্যের মতো মহাপণ্ডিত বিশ্বে দুর্লভ। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে করতে রামানুজ একটি পূর্ব ঘটনার কথা বিবৃত করলেন। তখন কাবেরী তীরে চিতার স্পর্শে ওই মহাত্মার দেহ শায়িত ছিল। রামানুজ সেখানে পৌঁছে দেখলেন তাঁর হাতের তিনটি আঙুল মুষ্টিবদ্ধ। তিনি এর অর্থ নিরূপণ করেছিলেন। তিনি ওই মৃতদেহের সামনে তিনটি প্রতিজ্ঞা করেন। সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ তিনটি আঙুল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। আজ অনেকদিন পরে সেই তিনটি প্রতিজ্ঞার কথা রামানুজের মনে পড়ল।

রামানুজ উপস্থিত শিষ্যদের বললেন—আমি শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করব বলে যামুনাচার্যের কাছে প্রতিশ্রুত আছি। কিন্তু দেখতে দেখতে এতগুলি বছর কেটে গেল। অথচ আমি এখনো আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি। অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এই কাজ আমি করার সময় পাইনি। এই গ্রন্থ লিখতে হলে আমাকে বেশ কিছুদিন একাকিত্বের মধ্যে থাকতে হবে। বোধায়ন বৃত্তির সাহায্য নিতে হবে। মহর্ষি বোধায়ন হলেন এক মহাপণ্ডিত। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি কাশ্মীর অন্তর্গত সারদাপীঠে রক্ষিত আছে। কুরেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করব। হে ভক্তগণ, তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, আমার এই সারস্বত অভিযাত্রা যেন সফল ও সার্থক হয়। আমি যেন সত্যই আমার শপথ রক্ষা করতে পারি।

এইবার শিষ্যদের কাছ থেকে রামানুজ বিদায় গ্রহণ করলেন। কুরেশের সঙ্গে বহু পথ অতিক্রম করে তিন মাস পরে সারদাপীঠে উপনীত হলেন। সেখানে সব বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর বসবাস। হিমালয়ের অসাধারণ নৈসর্গিক শোভার মধ্যে এই মঠটি অবস্থিত। এই পণ্ডিতগণ দাক্ষিণাত্যের বাসিন্দা রামানুজের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হল। পণ্ডিতরা বুঝতে পারলেন যে রামানুজ স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার। যেকোনো বিষয়ে অনর্গল ভাষণ দিতে পারেন। সুভাষণ দান কালে এমন সুন্দর, সুমধুর এবং সুস্নিগ্ধ শব্দ চয়ন করেন যা তাঁদের হৃদয়ে পৌঁছে যায়। তাঁর শাস্ত্র কুশলতাও সকলকে অবাক করে দিল। পণ্ডিতগণ তাঁকে দুর্লভ অতিথিজ্ঞানে পরম সমাদরে সৎকৃত করলেন।

রামানুজ বোধায়ন বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ ভাবলেন রামানুজকে এই গ্রন্থ দেখতে দেওয়া উচিত নয়। তবে যদি এই পুস্তক এই মহাপুরুষ দর্শন করেন তাহলে নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন। অদ্বৈতবাদের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে সারস্বত জগতে অবতীর্ণ হবেন।

এই কথা চিন্তা করে তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। তাঁরা বললেন, মহাত্মা, এই পুস্তক বংশ পরম্পরায় আমাদের মঠে সযত্নে রক্ষিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা কীটদষ্ট হয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রামানুজের মনে হল তাঁর চতুপার্শ্বে বুঝি ভয়ংকর ভূকম্প উপস্থিত হয়েছে। শুধুমাত্র এই পুস্তকটি পাঠ করার জন্যই তিনি এত শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে এতদূর এলেন। তাঁর সব পরিশ্রম বিফল হল। কথিত আছে স্বয়ং সারদাদেবী ওই পুস্তক হাতে নিয়ে তাঁর সামনে আসেন। তিনি যতিরাজের হাতে পুস্তকটি তুলে দিয়ে বলেন— বৎস, তুমি এখনই এই স্থান ত্যাগ করো। কারণ যদি এই খবর কাশ্মীর পণ্ডিতদের কানে পৌঁছে যায়, তাহলে তাঁরা তোমাকে এই পুস্তক নিতে দেবেন না।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সারদাদেবী তাঁর চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিতা হলেন। রামানুজ বীণাপানির দুর্লভ দর্শন লাভ করে আনন্দ সাগরে অবগাহন করলেন। তিনি অনতিবিলম্বেই সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। সারদাপীঠের পণ্ডিতগণ গ্রন্থাগার সংস্কারের জন্য সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁরা একে একে এক—একটি পুস্তক বের করতে লাগলেন। পুস্তকগুলি কীটদষ্ট হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। তাঁরা কিছুদিন পরপরই এমন কাজ করে থাকেন। অনেক বই—ই পাওয়া গেল। কিন্তু বোধায়ন বৃত্তি বইটি পাওয়া গেল না। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, দাক্ষিণাত্যবাসী ওই দুই পণ্ডিতই গ্রন্থটি অপহরণ করে নিয়ে গেছেন।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন বলবান পুরুষ। তারা স্থির করলেন অবিলম্বে রামানুজকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা দিবানিশি পথ চলতে লাগলেন। একমাস পরে তাঁরা রামানুজের দেখা পেলেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল যে রামানুজের কাছে ওই পুস্তকটি আছে। তখন আর তাঁরা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে রাজি হলেন না। তাঁরা বলপূর্বক পুস্তকটি নিয়ে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় রামানুজ তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। তিনি আবার বিলাপ করতে শুরু করলেন। গুরুর এই অবস্থা দেখে কুরেশ বললেন আপনি বিষণ্ণ হবেন না। কাশ্মীর থেকে যাত্রা করে আমি প্রতি রজনিতে এই পুস্তকের কিছুটা করে অংশ পাঠ করতাম। তখন আপনি নিদ্রামগ্ন থাকতেন। আপনার কৃপায় সমস্ত পুস্তকটি আমি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছি। আমি এখনই এটি লিখতে শুরু করছি। পাঁচ—ছয় দিনের মধ্যে লিখে শেষ করে ফেলব।

কুরেশের মুখ থেকে এমন কথা শুনে রামানুজ অত্যন্ত আনন্দ পেলেন। রামানুজ বুঝতে পারলেন এ সবই হল বিষ্ণুর অপার লীলা। তিনি কুরেশকে মন ভরে আশীর্বাদ করে বললেন— বৎস, তুমি চিরজীবী হও। আজ আমাকে তুমি যে কি ঋণপাশে আবদ্ধ করলে তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

বইটি লেখা শেষ হল, সেটি নিয়ে তাঁরা অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হলেন। রামানুজ শিষ্যবর্গকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের ভক্তি এবং কুরেশের মেধাশক্তির ফলে এই অসাধ্য

সাধন হয়েছে। তা না হলে এই বোধদয় বৃত্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। বোধায়নের মধ্যে যেসব ভাষ্য আছে তা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। আমি এখনই শ্রীভাষ্য রচনা করতে শুরু করব। তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো আমি যেন সুস্থ শরীরে এবং সুস্থ মনে এই সারস্বত সম্পাদনা সম্ভব করতে পারি। আমি নানা যুক্তি স্থাপন করব। কোনো ভ্রম থাকলে তা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করব। আমার এই কাজে স্বয়ং দেবী সরস্বতী আমার সহায় হবেন। এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এবার শ্রীভাষ্য রচনা শুরু হল। ভাষ্য রচনাকালে কুরেশকে একবারমাত্র লেখা বন্ধ করতে হয়েছিল। জীবের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে রামানুজ বললেন জীব স্বরূপত নিত্য ও জ্ঞাত।

তখনই কুরেশের লেখনী স্থির হল। গুরু তাঁকে লেখার জন্য বারবার আদেশ করছেন। কিন্তু কুরেশ তাঁর আদেশ পালন করছেন না।

এই ঘটনায় রামানুজ বিরক্ত হয়ে বললেন—কুরেশ, তুমি আমার কথা শুনছ না কেন? তাহলে শ্রীভাষ্য তুমি নিজেই লেখো।

পরক্ষণেই রামানুজের মনে হল জীব যদি স্বরূপত নিত্য ও জ্ঞাত হন, তাহলে তাকে স্বতন্ত্র ও দেহঅভিমান বিশিষ্ট বলা উচিত কি? কিন্তু শ্রীভগবান যখন বলেন জীব এমন তখন জীব পরতন্ত্র ভিন্ন স্বতন্ত্র নন। জীব সর্বতোভাবেই ঈশ্বরের অধীন। তাই ঈশ্বরকে শেষী এবং জীবকে শেষ বা তার অংশ বলা উচিত। এই কথা স্থির করে তিনি জীব স্বরূপকে বিষ্ণু শেষত্ব সংযুক্ত বলে ঘোষণা করলেন। কুরেশ আবার শ্রীভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

এই মহৎ সারস্বত কর্ম সম্পাদনের পর রামানুজ বেদান্তদীপন, বেদান্তসার, বেদান্ত সংগ্রহ এবং ভীতাভাষ্যম নামে চারটি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীভাষ্য রচনা করে তিনি যামুনাচার্যের দ্বিতীয় অভিলাষ পূর্ণ করলেন। আর ভক্তবৃন্দকে দ্রাবিড় প্রবন্ধমালার বিষয় শিক্ষা দিয়ে যামুনাচার্যের প্রথম অভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন। এবার তাঁর মনে হল স্বীয় মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে চিহ্নিত করে সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে।

শ্রীভাষ্য এবং অন্যান্য আকর গ্রন্থ অধ্যাপনার কাজ শেষ হল। এবার যতিরাজ রামানুজ স্থির করলেন যে তিনি বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করবেন। শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে তীর্থ অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রথম গেলেন চোল মণ্ডলের রাজধানী কাঞ্চীপুরে, বরদারাজের আদেশ নিয়ে কুম্ভকোনম অভিমুখে যাত্রা করলেন। কুম্ভকোনম একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে একাধিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের বসবাস। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে শাস্ত্র চর্চা করে যথেষ্ট প্রজ্ঞা এবং ঋদ্ধিলাভ করেছেন। রামানুজের সঙ্গে তাঁদের তর্ক হল। রামানুজ সেখানকার বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করলেন। তাঁরা রামানুজের মত গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এবার রামানুজ এলেন পাণ্ড্য দেশের রাজধানী মাদুরাতে। এই শহরে দ্রাবিড় কবিদের বসবাস। বংশ পরম্পরায় তাঁরা সুললিত ছন্দে কবিতা লিখে হাজার হাজার পাঠক—পাঠিকার মন জয় করেছেন। এই কবিদের সামনে দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা ব্যাখ্যা করে রামানুজ তাঁদের হৃদয় জয় করলেন। এই কবিরা রামানুজের প্রশস্তিতে একাধিক কাব্য রচনা করলেন।

এবার রামানুজ গেলেন শঠরিপুরে। সেখানে দেবালয়ে গিয়ে শঠারি বিগ্রহকে দর্শন করলেন। তারপর সেই বিগ্রহকে উপলক্ষ্য করে লেখা স্তব উচ্চারণ করতে লাগলেন। কয়েকদিন এখানে কাটিয়ে তিনি এলেন বুরঙ্গ নগরীতে। এই নগরীতে বিষ্ণু মন্দির আছে। সেই মন্দিরে গিয়ে তিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করলেন। কথিত আছে রামানুজের লোকরক্ষণ ক্ষমতা দেখে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন।

এবার রামানুজের গন্তব্য কেরল বা মালাবার রাজ্য। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি মালাবার দেশে গমন করলেন। এলেন রাজধানী তিরুঅনন্তপুরমে। এখানে অনন্ত শয়নে পদ্মনাভস্বামী আছেন। তাঁকে দেখে তিনি ভক্তিতে আপ্লুত হলেন। দাক্ষিণাত্য পরিক্রমণ শেষ হল। রামানুজকে এবার দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যেতে হবে উত্তর ভারতে। পথশ্রমে তিনি যখন ক্লান্ত হতেন তখন জপ করতেন ইষ্টনাম। তাঁর মনে হত স্বয়ং বিষ্ণু

বোধহয় তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিষ্ণুর উপস্থিতিতে তাঁর পথশ্রমজনিত ক্লান্তি এবং শ্রান্তি দূর হত। তিনি আবার নব বলে বলীয়ান হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতেন।

একে একে রামানুজ দ্বারাবতী, মথুরা, বৃন্দাবন, শালগ্রাম, সাকেত, বদরিকাশ্রম, নৈমিষ, পুষ্কর প্রভৃতি ঘুরে এলেন কাশ্মীরের সারদাপীঠে। এই হল সেই সারদাপীঠ যেখানে এর আগে তিনি একবার পদার্পণ করেছিলেন। সারদাপীঠের পণ্ডিতবর্গ নানা কারণে তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং সারদাদেবী তাঁর কাছে একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে তাঁকে ভাষ্যকার উপাধি দান করেন।

কাশ্মীরের পণ্ডিতরা সমবেতভাবে রামানুজের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঈশ্বরের কৃপায় রামানুজের প্রাণ রক্ষা পেল। এর আগে বেশ কয়েকবার স্বয়ং ভগবান তাঁকে রক্ষাকর্তা হিসাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দেখা গেল সারদামঠের যারা অর্চক বা পূজক তাঁদেরই প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

অবশেষে এগিয়ে এলেন কাশ্মীরের রাজা। তিনি রামানুজের পদমূলে নিজেকে সমর্পণ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রামানুজকে অপমান করার জন্য কাশ্মীরি পণ্ডিতদের আজ এই অবস্থা হয়েছে। রাজার অনুরোধে রামানুজ সকলকে সুস্থ করলেন। রাজা এবং পণ্ডিতরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এখানে রামানুজ ভগবানের হয়গ্রীব মূর্তি দর্শন করেন। এরপর তিনি চললেন কাশীধামের উদ্দেশে। কাশীতে যশস্বী পণ্ডিতদের বাস। কাশী হল হিন্দুদের পবিত্র তীর্থভূমি। সেখানে রামানুজ বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। একাধিক পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অনেককে স্বীয় মতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ তাঁর বৈদগ্ধ এবং প্রজ্ঞায় চমৎকৃত হয়েছেন। উত্তর ভারত অভিযান শেষ করে এবার তিনি দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশে চলতে শুরু করেন।

বেশ কিছুদিন বাদে তিনি এলেন ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র পুরীধামে। নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখানে একটি মঠ স্থাপন করেন। এই মঠটি তাঁর প্রিয় শিষ্য গোবিন্দের নাম অনুসারে 'এমার মঠ' নামে চিহ্নিত। তিনি চেয়েছিলেন পুরীধামে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে। কিন্তু এই তর্কযুদ্ধে সেখানকার পণ্ডিতরা যোগ দিলেন না। তাঁদের মনে ভয় ছিল যে তাঁরা রামানুজের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের লড়াইতে পেরে উঠবেন না। রামানুজ সেখানে নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পূজারীদের কাছে গিয়ে তিনি পুরুষোত্তমের সেবা পাঞ্চরাত্রগমানুসারে করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পূজারীরা তাঁদের নিজের মত ত্যাগ করে নতুন মত গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। এবার রামানুজ রাজার কাছে বিচার আকাঙ্ক্ষা করলেন। এই কথা পূজকদের কানে পৌঁছে গেল। তাঁরা সকলে তখন স্বয়ং পুরুষোত্তমের বন্দনা করতে শুরু করলেন। কথিত আছে সেই রজনিতে তিনি নিদ্রাবস্থায় শত যোজন দূরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। জগন্নাথ নাকি তাঁকে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন। তিনি কূর্মক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

ঘুম ভাঙলে রামানুজ একেবারে অবাক হয়ে যান। এ কোনো স্থান? অসংখ্য শিষ্যদের মধ্যে কাউকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। বুঝতে পারলেন যে এটি হল দেবতার মায়া। তিনি কূর্মদেবের মন্দিরে গেলেন। সেই অবতারের মূর্তি পুজো করলেন। তারপর সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন।

এলেন সিংহাচলে, শিষ্যদের সঙ্গে দেখা হল। গারুড় পর্বতের অহোবল মন্দিরে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি একটি মঠ তৈরি করেন। ঈশালিখাঙ্গো এসে সেখানে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করেন। এরপর বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে এলেন। এই সময় সেখানে শৈব এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে অনভিপ্রেত তিক্ততা দেখা দিয়েছিল। শ্রীরামানুজ তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, বিষ্ণু বিগ্রহ ছাড়া সেটি অন্য কোনো বিগ্রহ নয়। শৈব এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই সন্তুষ্ট হন। সেই তীর্থে তিনি কিছুদিন অবস্থান করলেন। শিষ্যদের নিয়ে এলেন কাঞ্চীপুরে। অনেকদিন পরে প্রিয়তম শ্রীবরদারাজকে দর্শন করলেন। এখানে থেকে মদুরান্তক দর্শন করে নাথভূমির জন্মভূমি বীরনারায়ণপুরে এলেন। আবার শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হলেন। এভাবেই তাঁর ভারত বিজয় সম্পন্ন হল।

তেইশ

কুরেশ হলেন রামানুজের পরম শিষ্য। তিনি এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কাঞ্চীপুরের কাছে তাঁর বাসস্থান। অণ্ডাল নামক এক সহধর্মিণীকে পেয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতেন। কুরেশ তাঁর বিপুল সম্পত্তি সাধারণ মানুষের সেবায় ব্যয় করতেন। একেবারে বালক অবস্থা থেকেই রামানুজের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালোবাসা। রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বেশির ভাগ সময় তিনি রামানুজের কাছেই থাকতেন। কুরেশ ছিলেন অসম্ভব স্মৃতিধর মানুষ। একবার যা পাঠ করতেন কখনো তা ভুলতেন না। তাঁর দ্বারা রামানুজ মহাপণ্ডিত যাদবপ্রকাশকেও তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন।

কুরেশ এক বিশাল অট্টালিকায় বাস করতেন। সেই অট্টালিকা মধ্যরাত পর্যন্ত নানা শব্দে ঝঙ্কৃত হত। তারপর ওই বিশাল অট্টালিকার দরজা বন্ধ করা হত।

কথিত আছে বরদারাজপত্নী লক্ষ্মীদেবী একবার গভীর রাতে কুরেশের দ্বারধ্বনি শুনেছিলেন। তিনি এই শব্দের কারণ জানতে চাইলেন স্বামীর কাছে। কাঞ্চীপূর্ণ এই রহস্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছিলেন মা, সকাল থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত দীন, হীন, অন্ধ, খণ্ডদের সেবা চলছিল। পরিচারকেরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার জন্য এই বিশাল ধর্মশালার দ্বার বন্ধ করে। এই দ্বার রুদ্ধ হবার পর প্রতি রজনিতে এমন শব্দ হতে থাকে।

লক্ষ্মীদেবী এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কুরেশকে অন্তত একবার দেখতেই হবে এমন আকাঙ্ক্ষা করলেন তিনি। তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে বললেন ওই মহাত্মা ব্যক্তিকে কাল সকালে আমার কাছে নিয়ে এসো। কাঞ্চীপূর্ণ কুরেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে জগন্মাতার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কুরেশ এই কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে যান। তিনি নিজেকে নরাধমের মতো মনে করেন। কারণ বিষয়বিষ্ঠা তাঁর মনকে এবং হৃদয়কে একেবারে কলুষিত করে ফেলেছে। ইহজীবনে তিনি কখনো লক্ষ্মীদর্শন করতে পারবেন বলে মনে করেন না।

তাই কুরেশের চোখ থেকে লবণাক্ত অশ্রুধারা নির্গত হতে থাকল। তিনি তাঁর অঙ্গ থেকে সমস্ত অলংকার খুলে ফেলে দিলেন। পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বসন পরিধান করলেন। নিজের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন—কাঞ্চীপূর্ণ, আমি মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না। আমি তাঁর চরণ স্পর্শ করে শুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি জানি যে আগে স্নান করতে হবে। কতদিনে এই ক্লেদ মুক্ত হবে তা আমি জানি না। আপনি যদি আমাকে আশীর্বাদ করেন তাহলে হয়তো এই জীবনেই আমি জগন্মাতার রূপ দর্শন করতে পারব।

কুরেশ অভিভূতের মতো শ্রীরঙ্গমের দিকে এগিয়ে চললেন। স্ত্রী অণ্ডালও তাঁকে অনুসরণ করলেন। যদি পথে স্বামী তৃষ্ণার্থ হন সেইজন্য অণ্ডাল সঙ্গে একটি স্বর্ণপাত্র নিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা অরণ্যের পথ ধরলেন। সেখানে অণ্ডাল ভয় পেয়েছিলেন। তিনি বললেন—হে প্রভু, এখানে কি কোনো ভয়ের কারণ আছে?

কুরেশ বললেন, যারা ধনবান তাদেরই ভয় থাকে। তোমার সঙ্গে মূল্যবান কিছু না থাকলে কোনো ভয় তোমার থাকবে না। একথা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডাল তাঁর সঙ্গে থাকা স্বর্ণপাত্রটি দূরে নিক্ষেপ করলেন। পরদিন এলেন শ্রীরঙ্গমে। শ্রীরামানুজ তাঁদের নিজের মঠে নিয়ে এলেন। তাঁদের সযত্নে আপ্যায়ণ করলেন। যতিরাজ তাঁদের বসবাসের জন্য আলাদা একটি গৃহ স্থির করেছিলেন।

কুরেশ তখন মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে দিন অতিবাহিত করতেন। শ্রীভগবান কীর্তনে নিজেকে মগ্ন রাখতেন। শাস্ত্র আলোচনায় যোগ দিতেন। অণ্ডাল কুরেশের সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। অতুল ঐশ্বর্যের কথা তাঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন। অণ্ডাল ছিলেন এক পতিগতপ্রাণা রমণী। কুরেশের সুখকেই নিজের সুখ বলে মনে করতেন।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে চারদিক জলমগ্ন হল। কুরেশ সেদিন ভিক্ষার জন্য বের হতে পারেননি। তাই তাদের অনাহারে থাকতে হল। তাঁরা ক্ষুধার কথাও ভুলে গেলেন।

কিন্তু অণ্ডাল স্বামীকে উপবাসী দেখে রঙ্গনাথস্বামীকে সব কথা মনে মনে জানালেন। এরপর হঠাৎ দেখা গেল একজন পূজারী পূজার নানা প্রসাদ এনে কুরেশের হাতে তুলে দিলেন। কুরেশ এই ঘটনায় খুবই অবাক হন। তিনি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি মনে মনে শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর কাছে কিছু প্রার্থনা করেছ? তা না হলে কেন আবার ভোগ এসে আমাদের আগের মতো অন্ধ করতে চাইছে?

অণ্ডাল সব কথা স্বামীকে খুলে বললেন। তিনি বললেন—আপনার ক্ষুধা যন্ত্রণার কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। সেজন্য আমি মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম।

কুরেশ স্ত্রীর এই আচরণে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন, এরপর আর কখনো এমনভাবে দেবতার কাছে অন্ন প্রার্থনা করবে না।

তিনি মহাপ্রসাদ মস্তকে ধারণ করলেন। সহধর্মিণীকেও তা ভোজন করতে আদেশ করলেন। সারারাত শঠারিসুক্ত আবৃত্তি করে কাটালেন।

এই প্রসাদ গ্রহণের দশমাস পরে অণ্ডাল একসঙ্গে দুটি পুত্র প্রসব করলেন। এই খবর রামানুজের কাছে পৌঁছোলে তিনি গোবিন্দকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। গোবিন্দ দুই শিশুর জাতকর্ম করে মন্ত্র দ্বারা তাদের দেহ ও মনের শুদ্ধি বিধান করেন। তিনি এই দুই শিশুকে রাক্ষস, ভুত, পিশাচের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বিষ্ণুর পঞ্চাস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করেন। শিশুরা ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগল। ছ—মাস বয়সে শিশুদের নামকরণ করা হল। বড়োটির নাম রাখা হল পরাশর এবং ছোটোটি হলেন ব্যাস। গোবিন্দের ছোটো ভাই বালগোবিন্দের পুত্রেরও নামকরণের কাল উপস্থিত হল। রামানুজ তার নাম রেখেছিলেন পরাঙ্কুশপূর্ণ। এইভাবে যতিরাজ রামানুজ তাঁর তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করলেন।

একেবারে ছোটোবেলা থেকে পরাশর ছিলেন পড়াশোনায় অত্যন্ত মনোযোগী। চার বছর বয়সে সর্বজ্ঞ ভট্ট নামে এক পণ্ডিত নানা শিষ্য নিয়ে দামামা বাজিয়ে যাচ্ছিলেন। এইসময় পরাশর অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলছিলেন। তিনি দামামা বাদকের মুখে শুনলেন জগৎ বিখ্যাত সর্বজ্ঞ ভট্ট সশিষ্য যাচ্ছেন। কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন।

এইসময় পরাশর খেলা ফেলে সর্বজ্ঞের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর হাতে কিছুটা ধুলি ছিল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন—আপনি সর্বজ্ঞ, বলুন তো আমার হাতে কতগুলি ধুলি আছে?

পণ্ডিত এই বালকের প্রশ্ন শুনে চমৎকৃত হলেন। তিনি নিজের অভিমানকে তুচ্ছ বলে মনে করলেন। তিনি বললেন—বৎস, তুমি আমার থেকে অনেক ছোটো, কিন্তু তোমার এই প্রশ্নে আমার চৈতন্যলাভ হল।

পরাশর এবং ব্যাসকে সকলেই ঈশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। বালক বয়স থেকেই পরাশর শাস্ত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করতে থাকেন। বেশ বোঝা গেল ভবিষ্যতে তিনি এক মহাপণ্ডিত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

চব্বিশ

শ্রীরঙ্গমে শুরু হবে গরুড় মহোৎসব। দূর—দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত সেই উপলক্ষ্যে মন্দিরে এসে ভিড় করেছেন। মন্দির দ্বারে সাজানো হয়েছে তোরণ। সকলে রঙ্গনাথস্বামীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। রঙ্গনাথস্বামী গরুড়ের স্কন্ধে সমাসীন। তাই গরুড় একটি পবিত্র পাখি হিসাবে চিহ্নিত। শোনা যাচ্ছে ভেড়ির শব্দ। সকলে উদগ্রীব হয়ে মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই সময় দ্রাবিড় বেদধ্বনি শোনা গেল। বেদপাঠীগণ ক্রমশ ভেতর থেকে মন্দির দ্বারের দিকে এগিয়ে এলেন। তাদের সামনে উড়ছে জয়পতাকা। মনে হল তাঁরা যেন এইভাবে শব্দসমুদ্রে আলোড়ন তুলবেন।

দ্রাবিড় বেদপাঠীরা মন্দিরদ্বার অতিক্রম করে রাজপথে উপস্থিত হলেন। তাদের অনুসরণ করছে কয়েকটি হাতি। তারা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এরপর সুসজ্জিত বৃষভদের দেখা যাচ্ছে। রক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারাও সুশৃঙ্খলভাবে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে। কয়েকটি অশ্ব দ্বার অতিক্রম করল। এবার চোখে পড়ল হরিনাম সংকীর্তনের দল। তারা নানা যন্ত্র সহযোগে মধুর স্বরে সংকীর্তন করতে করতে

রাজমার্গের দিকে গেল। রাজমার্গে প্রবেশ করার পর দেখা গেল গরুড় স্কন্ধে সমাসীন লক্ষ্মীনাথকে। অর্চকগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত নারায়ণ শত শত ভক্তিমান বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে বাইরে এলেন। তাঁকে দেখে জনগণের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। নর—নারীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তুমুল করতালির দ্বারা তাঁকে সংবর্ধিত করলেন। তাঁরই জয় ঘোষিত হল দিক দিগন্তে।

দ্বারের সামনে যে মণ্ডপ সেখানে শ্রীভগবান কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। তাঁর সামনে এবং পিছনে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংস্কৃত বেদ পাঠ করছেন। নারায়ণ যখন মণ্ডপে উপনীত হলেন তখন সকলে তাঁর দিকে তাকালেন অপলক দৃষ্টিতে। শত শত ভক্ত নানা পুজো উপহার নিয়ে ধারাবাহিকভাবে নারায়ণের পুজো করতে থাকলেন। কেউ বা নারকেল ফল ভেঙে সেই জল দিয়ে নারায়ণকে স্নান করালেন। কেউ নারায়ণের উদ্দেশে কলা নিক্ষেপ করলেন। কেউ কর্পূর প্রজ্জলন করে শ্রীহরির আরত্রিক বিধান করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। এবার শ্রীভগবানকে মণ্ডপ ত্যাগ করতে হবে। রাজপথে তখন আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সকলের দৃষ্টি গরুড়ের কাঁধে আসীন লক্ষ্মীনাথ নারায়ণের উপর।

রাজমার্গে বের হবার পর শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। পুরনারীরা অলিন্দ পথ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। কেউ কেউ অর্চকের হাতে তুলে দিলেন কর্পূর, ফল আর তাম্বুল। তাঁরা সকলে জোড় হাতে ভগবানকে নমস্কার করলেন। এই বিপুল জনতার মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই দেহমুক্তির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এখানে এমন এক উন্মাদনার সৃষ্টি হল যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

এই শোভাযাত্রার মধ্যে একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ল। সকলে যখন নাম সংকীর্তনে মগ্ন তখন এক যুবককে দেখা গেল একটি ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে। তিনি কিন্তু ওই ছাতাটির দ্বারা নিজের মস্তককে রক্ষা করছিলেন না। তার সামনে এক পরম লাবণ্যময়ী সুন্দরী ললনা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখলে মনে হয় সে বুঝি তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি এক তিলোত্তমা। এই যুবতির মনোহর বদনকে সূর্যের কিরণ থেকে রক্ষা করবার জন্য ছাতাটি তার মাথার উপরে রাখা হয়েছে। ওই পুরুষের ডান হাতে আছে একটি পাখা। মাঝেমধ্যে পাখা সঞ্চালন করে স্বেদ নিবারণ করছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে চিত্রার্পিতের মতো যুবতিটির দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন। পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর ঘটনাবলির প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। এমনকি সে যে নির্লজ্জের মতো যুবতিটির সেবা করছে তাতেও তার মনে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা ভ্রান্তি উপস্থিত হয়নি। চলমান জনস্রোত মাঝে মাঝে এই যুগল মূর্তির দিকে তাকাচ্ছে, কেউ কৌতুক বাক্য ছুড়ে দিচ্ছে। কেউ কটুবাক্য বর্ষণ করছে। কিন্তু যুবক যে কাজে ব্যস্ত আছে, সেই কাজে বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি ওই যুবতির প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট। তার সমস্ত সত্তা যুবতির পদতলে নিবেদন করেছে।

রামানুজ কাবেরী নদীতে স্নান সমাপন করে ফিরে আসছেন। তাঁকে এখন মঠের দিকে যেতে হবে। তিনি বিশাল জনস্রোতের দিকে তাকালেন। তাঁর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন ঈশ্বরের কৃপায় এত মানুষের মনে দেবভক্তি ভাবের উদয় হয়েছে। গরুড় মহোৎসবের দিনটিতে মানুষের মনের পরিবর্তন দেখা দেয়। চরম বিষয়ী মানুষও জীবন সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে ওঠে। সহসা ওই দৃশ্যটি রামানুজের চোখে পড়ল। তিনি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ওই যুবক ও যুবতির দিকে। তারপর এক শিষ্যকে বললেন তুমি ওই নির্লজ্জ লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

শিষ্যটি যুবকের কাছে উপস্থিত হয়ে বার বার আহ্বান করল, তখন যুবকের চৈতন্য হল। এতক্ষণ সে এক আচ্ছন্ন বোধের মধ্যে ছিল। এখন আবার পার্থিব জগতে ফিরে এল। সুপ্তোত্থিতের মতো সামনে ব্রাহ্মণকে দেখে যুক্তকরে বলল— বলুন আমাকে কী অনুমতি করছেন?

ব্রাহ্মণ বললেন— অদূরে যতিরাজ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে এসো।

যুবক রামানুজের নাম শুনে প্রণয়িনীর কাছ থেকে ক্ষণকালের জন্য বিদায় নিল। তারপর পরম ভক্তিভরে ব্রাহ্মণকে অনুসরণ করল। রামানুজ সন্নিধানে এসে সে রামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে থাকল। রামানুজ তাকে দর্শন করে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি ওই যুবতিটির মধ্যে এমন কী অমৃত পেয়েছ যে জগৎ সংসার সব ভুলে গেছ? তুমি এই বিপুল জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কামুকের মতো আচরণ কেন করছ? সকলে তোমাকে দেখে হাসাহাসি করছে। এসব দেখেও তোমার হুঁশ হয়নি?

এই কথা শুনে যুবক বলল, মহাত্মা, পৃথিবীতে যাবতীয় সুন্দর বস্তু বর্তমান। তার থেকে অনেক সুন্দর ওই সুন্দরীর দুটি নয়ন। যেটিকে দর্শন করলে আমি উন্মত্তের মতো হয়ে যাই। তখন আর কোনোদিকে আমার চোখ পড়ে না।

রামানুজ বললেন—এই যুবতি কি তোমার বিবাহিতা পত্নী? যুবক বলল— না, কিন্তু বিবাহিতা না হলেও আমি তাকে ছাড়া অন্য কোনো রমণীকে ভালোবাসবো না। এ জীবনে তাকে যদি আমি আমার স্ত্রী হিসাবে না পাই তাহলে সারাজীবন আমি অবিবাহিত থাকব। এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

রামানুজের প্রশ্নের উত্তরে যুবক নিজেকে ধনুর্দাস নামে অভিহিত করল। সে মল্লবিদ্যায় নিপুণ। আর তার প্রণয়িনীর নাম হেমাম্বা।

রামানুজ একথা শুনে বললেন— ধর্নুদাস, আমি তোমাকে ওই যুবতির নয়নের থেকে আরো সুন্দরতর নয়নযুগল দেখাব। তাহলে কি তুমি ওই যুবতিকে চিরকালের জন্যে ছেড়ে আসতে পারবে?

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্নুদাসের সমস্ত শরীরে এক আশ্চর্য শিহরণ অনুভূত হল। ধর্নুদাস ভাবতেই পারেনি যে রামানুজের মতো এক মহাত্মা ব্যক্তি তাঁকে এইভাবে কথা বলবেন। ধর্নুদাস বলল, মহাত্মা যদি আমার প্রণয়িনীর নয়নের থেকে অন্য কারো সুন্দরতর নয়ন থাকে তাহলে আমি তারই ভজনা করব।

রামানুজ একটু হেসে বললেন—আজ সন্ধ্যার সময় তুমি আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে এমন নয়নযুগল দেখাব যার তুলনা ত্রিভুবনে হবে না।

যুবকটি যথা আজ্ঞা বলে আবার যুবতির পাশে গিয়ে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

দেখতে দেখতে দেবদিবাকর গেল অস্তাচলে, সন্ধ্যা সমাগত হল। রামানুজাচার্য ধনুর্দাসের সঙ্গে রঙ্গনাথস্বামীর বিরাট মন্দিরের দ্বারগুলি একে একে অতিক্রম করতে থাকলেন। পাঁচটি গোপুর অতিক্রান্ত হলে তাঁরা মূল বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অর্চক যতিরাজকে দেখে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। এবার দেবতার আরাত্রিক বিধান শুরু হবে। কর্পুরালোকে ভগবানের পদ্মপলাশ সদৃশ বিশাল নয়নদ্বয় দেখে অবাক হয়ে গেল ধর্নুদাস। সে ভাবতেই পারেনি যে ঈশ্বরের চোখ এত সুন্দর। তার চোখ থেকে অবিরল ধারায় প্রেম অশ্রু নির্গত হতে লাগল। হেমাম্বার নয়নমাধুরী আর তাঁর মনে পড়ল না। সে বুঝতে পারল যে এতকাল ভুল করে এক রমণীর প্রতি আসক্ত ছিল। সে যতিরাজের পায়ে পড়ে বলল—মহাত্মা, আপনি আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন। আমি সেজন্য চিরকাল আপনার কৃতদাস হয়ে থাকব। আমি এতদিন মহাসাগর তুচ্ছ করে ছোটো পুষ্করিণীর মধ্যে স্নান করছিলাম। সর্বসৌন্দর্য এবং বীর্যের আকর ভগবান অংশুমালিকে বহুমান না দিয়ে নিশাচর পেঁচার মতো আমি জোনাকির রূপে মুগ্ধ ছিলাম। আজ আমার মোহভঙ্গ হয়েছে। আমার তমো বিনাশ আপনার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আপনি আমাকে আদেশ করুন এবার কী করতে হবে?

পতিতপাবন রামানুজ তাঁর পদপ্রান্তে শুয়ে থাকা ধর্নুদাসকে টেনে নিলেন বুকে। তার ত্রিবিধ সন্তাপ চিরকালের জন্য হরণ করলেন। ধর্নুদাসের মধ্যে যে লাম্পট্য ছিল তা দেবত্বে পরিণত হল। শৈরিণী হলেও হেমাম্বা পতির মতোই ভক্তি করত ধর্নুদাসকে। যতিরাজের কৃপায় প্রিয়তমের দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে জেনে তার আর আনন্দের সীমা থাকল না। কেবল ইন্দ্রিয় লালসা পরিত্যাগ করে রামানুজের শরণাপন্ন হল। রামানুজ তাকেও কৃপা করলেন। সে মোহ অন্ধকার থেকে মুক্ত হল। এতদিন পর্যন্ত ধর্নুদাস ও হেমাম্বা কামনার জালে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এখন তারা অলৌকিক প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হল। পতি—পত্নীর মতো দিন

কাটালেও বাসনা—কামনা আর তাদের জর্জরিত করতে পারল না। তারা নীচুলনগর থেকে শ্রীরঙ্গমে চলে এল। যতিরাজ তাঁদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিলে তারা সেখানেই থাকতে শুরু করল।

ধর্নুদাসের ওপর রামানুজের স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ধর্নুদাসের চরিত্রে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক দিক আছে যা রামানুজকে অবাক করে দেয়। তার গুরুভক্তি, বিনয়, সারল্য শ্রীরঙ্গমের সমস্ত নরনারীকে মুগ্ধ করল। শুধু তাই নয়, এই দম্পতি সকলের কাছে আদর্শ দম্পতি হিসাবে পরিগণিত হল। ধর্নুদাস প্রতিদিন নিয়ম করে দেবার্চনার জন্য পুষ্প চয়ন করত। শ্রীরামানুজের কাছে পূজার বিভিন্ন উপকরণ পৌঁছে দিত। রামানুজও ধর্নুদাসের কাছ থেকে নানা উপাচার নিয়ে দেব বন্দনায় মগ্ন হতেন। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যরা কেউ কেউ অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে দুটি একটি কথাও বলেছিলেন। রামানুজ কিন্তু এই কথাগুলি না শোনার ভান করে থাকলেন।

একদিন মধ্যরাতে যখন মঠের সকলে নিদ্রিত তখন রামানুজ এক শিষ্যের বস্ত্রাঞ্চল থেকে কৌপীন উপযোগী কিছুটা বস্ত্র ছিন্ন করলেন। এইভাবে তিনি প্রতি শিষ্যের বস্ত্র থেকেই ছিন্ন করলেন। সকালে শিষ্যরা নিজেদের বস্ত্রের দুর্দশা দেখে পরস্পরের প্রতি খারাপ বাক্য প্রয়োগ করতে থাকলেন। এক প্রহরকাল এমন চলার পর রামানুজ সেখানে এসে সব বিবাদ মিটিয়ে দিলেন।

সেদিন রজনি সমাগমে তিনি কয়েকজন শিষ্যকে বললেন— দ্যাখো আমি আজ ধর্নুদাসকে কথার ছলে অনেকক্ষণ আমার কাছে বসিয়ে রাখব। এই সময়ের মধ্যে তোমরা তাঁর প্রণয়িনীর অঙ্গ থেকে সমস্ত অলংকার সংগোপনে হরণ করে আনবে। দেখবে এর ফলে ধর্নুদাস বা তার প্রেয়সীর কোনো মনোবিকার জন্মায় কি না।

গুরুবাক্য অনুসারে শিষ্যরা মধ্যরাতে ধর্নুদাসের ঘরেতে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর প্রণয়িনী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা।

ধর্নুদাসের আগমন প্রতীক্ষায় হেমাম্বা দ্বার মুক্তই রেখেছিল। ব্রাহ্মণগণ অতি সহজেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। অতি সতর্কতার সঙ্গে তার অঙ্গ থেকে একটি একটি করে অলংকার খুলে নিলেন। হেমাম্বা বিষয়টি বুঝতে পারল। কিন্তু সে নিদ্রামগ্নতার ভান করে থাকল। পাছে সে জেগে গেছে জানতে পেরে ব্রাহ্মণরা বিব্রত হয় তাই তার এই মিথ্যা অভিনয়। একপাশের অলংকার উন্মুক্ত হলে হেমাম্বা অপরপাশের অলংকারগুলি দেবার জন্য নিদ্রাবিভুতার মতো পাশ পরিবর্তন করল। ব্রাহ্মণরা একপাশের অলংকার নিয়েই প্রস্থান করলেন। রামানুজের কাছে হাজির হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন।

তখন রামানুজ ধর্নুদাসকে কাছে এনে বললেন রাত্রি এখন অনেক হয়েছে, এবার বাড়ি যাও। 'যথা আজ্ঞা ভগবন্' বলে মল্লবর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করল। রামানুজ শিষ্যদের বললেন— তোমরা অনুসরণ করো। শুনে এসো ওদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়।

ব্রাহ্মণ শিষ্যরা রামানুজের আদেশ অনুসারে তাই করলেন। ধর্নুদাস ঘরের ভিতর প্রবেশ করে হেমাম্বাকে বললেন—এ কি তোমার একপাশের অঙ্গের অলংকার গেল কোথায়? হেমাম্বা বললেন— প্রভু, কয়েকজন ব্রাহ্মণ এসে আমার বহুমূল্য অলংকার হরণ করে নিয়ে গেছেন। আমি তখন শয্যায় শয়ন করে ভগবানের নামাবলি মনে মনে জপ করছিলাম। আমি ভাবছিলাম কখন আপনি আসবেন। আমি নিদ্রামগ্ন জ্ঞান করে তাঁরা আমার শরীরের একপাশের অলংকার মুক্ত করেন। আমি অন্যপাশের অলংকারও তাঁদের হাতে তুলে দেবার জন্য পাশ পরিবর্তন করেছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁরা ভয় পেয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।

এই কথা শুনে ধর্নুদাসের আর ক্ষোভের সীমা থাকল না। ধর্নুদাস বললেন, তুমি পাশ ফিরতে গেলে কেন? এখনো তোমার মনের অহংকার দূরীভূত হয়নি। আমার দেহ, আমার অলংকার, আমি দান করব এইসব দুর্বুদ্ধির কারণেই তুমি এমন কাজ করলে। তুমি যদি শ্রীহরির প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারতে তাহলে নিদ্রিতা জেনে ব্রাহ্মণরা সবকিছু হরণ করতে পারতেন। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহলে নিজের আমিত্ব বর্জন করো। তা না হলে জীবনে অশেষ কষ্ট পাবে।

নিজের অপরাধ হেমাম্বা বুঝতে পারলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে প্রভু, আশীর্বাদ করুন এমন মোহ যাতে আমি বর্জন করতে পারি। আমি যেন আর কখনো অহংকারে অভিভূতা না হই।

ব্রাহ্মণগণ এই দেবতুল্য দম্পতির কথোপকথন শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা মঠে এসে রামানুজের কাছে আদ্যপ্রান্ত বিবরণ দিলেন। নিজেরা কত ছোটো মনের তা বুঝতে পারলেন। বেশি রাত হওয়ায় সেদিন রামানুজ আর কোনো কথা বললেন না। তিনি ব্রাহ্মণদের নিজেদের বিশ্রামকক্ষে যেতে নির্দেশ দিলেন। পরদিন সকালে যতিরাজের কাছে ব্রাহ্মণরা হাজির হলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করে বললেন —হে শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ, তোমরা আগের দিন বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন দেখে যেমন আচরণ করেছিলে, আর গত রজনিতে ধর্নুদাস সর্বলুণ্ঠিত হবার পর যেমন আচরণ করেছিল, এর মধ্যে কোনোটি শ্রেয় বলে মনে হয়?

এবার ব্রাহ্মণরা নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকলেন। তাঁরা বললেন প্রভু, ধর্নুদাসই ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করেছে। আমরা যে কাজ করেছি তা অত্যন্ত ঘৃণিত। যতিরাজ বললেন—অতএব ভক্তগণ জেনো, গুণই কল্যাণের কারণ, জাতি নয়, তাই সকলে জাত্যাভিমান পরিত্যাগ করো। জাতি হল অহংকারের প্রসূতি গৃহ। এখন থেকে আর কখনো জাতপাতের ভেদাভেদ কোরো না। এই পৃথিবীর সবাই ঈশ্বরের সন্তান—সন্ততি। আমরা মানবকুলজাত একথাই মনে রেখো।

এভাবেই রামানুজ ব্রাহ্মণদের মনের অন্ধকার দূর করলেন।

পঁচিশ

কিছুদিন পরে রামানুজ শুনলেন যে, তাঁর গুরু মহাপূর্ণ এক শূদ্র ভক্তের মৃতদেহের সৎকার করেছেন। এই অশাস্ত্রীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য সকলে তাঁকে উদ্দেশ করে কটূবাক্য প্রয়োগ করছেন। তাঁরা বলছেন জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও কেন মহাপূর্ণ এমন একটি অব্রাহ্মণোচিত কাজ করলেন। এই কথা শুনে রামানুজ তাঁর গুরুগৃহে পৌঁছে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে মহাপূর্ণের আত্মীয়স্বজন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। রামানুজ এই ঘটনা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁর গুরুর কাছে সব কথা জানতে চাইলেন। মহাপূর্ণ বললেন—বৎস, আমি জানি আমার কাজ ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী হয়নি, কিন্তু ধর্ম বলতে কী বোঝায়? মহাপুরুষগণ যে পথ দিয়ে গমন করেন তাকেই আমরা প্রকৃত ধর্মমার্গ বলতে পারি। দ্যাখো রামচন্দ্র জটায়ুর সংস্কার সাধন করেছিলেন। যুধিষ্ঠির জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও শূদ্র বিদুরের পুজো করতেন। এর কারণ কী? যিনি প্রকৃত ঈশ্বর অনুরাগী তাঁর কোনো জাতি নেই। তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অকৃপণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির হলেন ন্যায় ও বিশ্বাসের শাশ্বত প্রতীক। তাঁরা কখনো বিসদৃশ আচরণ করবেন কি? আমি যে ভক্তের দেহের সৎকৃত করেছি, তিনি ভক্তিপরায়ণ, তাঁকে এইভাবে সাহায্য এবং সেবা করে আমি নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করছি।

এই কথা শুনে রামানুজ খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁর গুরুর পা দুটি স্পর্শ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মহাপূর্ণ রামানুজকে একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। তখন রামানুজ এই ঘটনায় বিচলিত হন। শিষ্যেরা প্রশ্ন করেন যতিরাজ, আপনার গুরু আপনাকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন, কিন্তু আপনি কেন তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত করলেন না?

শুনে রামানুজ বললেন—প্রকৃত শিষ্যের লক্ষণ কী? অর্থাৎ গুরুর সমীপে গিয়ে শিষ্য কী আচরণ করেন তা শেখাবার জন্যই গুরুদেব স্বয়ং এই কাজ করেছেন। আমি গুরুদেব প্রদর্শিত পন্থাই অবলম্বন করব।

আর মহাপূর্ণকে এই বিসদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, আমি যতিরাজের মধ্যে মৃত যামুনাচার্যকে দেখতে পেয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

এইভাবে যতিরাজের চারিত্রিক অসাধারণত্বকে মহাপূর্ণ সকলের সামনে প্রকাশ করেন।

গোষ্ঠীপূর্ণকে রামানুজ দেবতার অংশ বলেই শ্রদ্ধা করতেন। একদিন দেখলেন গোষ্ঠীপূর্ণ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে ধ্যান করছেন। ধ্যান শেষ হবার পর রামানুজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন মন্ত্র উপাসনা

করছেন? এতক্ষণ ধরে কার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন?

গোষ্ঠীপূর্ণ উত্তর দিলেন, আমি শ্রীগুরু যামুনাচার্যের কথাই ভাবছিলাম। আমি সবসময় তাঁর উদ্দেশেই আমার মন্ত্র উচ্চারণ করে থাকি। তখন থেকে রামানুজও নিজের গুরুদেবকে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেয় হিসাবে জ্ঞান করতে থাকেন।

কিছুদিন পরে মহাপূর্ণ মহাপ্রয়াত হলেন। এই ঘটনায় রামানুজ খুবই শোক পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য অবলম্বন করে মহাপূর্ণের স্ত্রী অতুলাকে শোক সংবরণ করার উপদেশ দিলেন। তখন রামানুজের স্থৈর্যবান মূর্তি দেখে মনে হয়েছিল তিনি বুঝি সত্যিই এক প্রজ্ঞাবান পুরুষ।

এইসময় কৃমিকণ্ঠ নামে এক চোলাধিপতি তাঁর রাজধানী কাঞ্চীপুর সহ সমস্ত চোল রাজ্যকে শৈব মতাবলম্বী করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করলেন। তাঁর মতো সংকীর্ণমনস্ক নৃপতি ভারতবর্ষে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি স্থির করলেন যে করে হোক রামানুজকে শৈব মতে আনতে হবে, না হলে তাঁর স্বপ্ন সফল হবে না। রামানুজ সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। ওই অঞ্চলের জনমণ্ডলীর প্রায় সকলেই রামানুজকে পরম দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন। রামানুজ যে ধর্মমত পালন করবেন, তাঁর অনুগামীরাও সেই ধর্মমতের প্রচারক হবেন। আর যদি এই মহানুভব, রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ করে শৈবধর্ম গ্রহণ না করেন তাহলে তাঁকে হত্যা করতে হবে। রামানুজের মৃত্যু হলে বৈষ্ণবধর্মের আধিক্য এবং আধিপত্য ক্রমশ ক্ষীয়মান হবে। তখন সমস্ত চোল রাজ্যে শৈবধর্মের একাধিপত্য স্থাপিত হবে।

এই কথা চিন্তা করে তিনি রামানুজকে কাঞ্চীপুরে আনার জন্য কয়েকজন বলিষ্ঠ মানুষকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারা শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হয়ে রামানুজের কাছে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করল। রামানুজ তাদের সঙ্গে যেতে স্বীকার করলেন। তিনি প্রস্তুত হবার জন্য মঠের ভিতর প্রবেশ করলেন।

কুরেশ বললেন—লোকমুখে শুনলাম যে হয়তো আপনার প্রাণ সংহার করার জন্যই আপনাকে কাঞ্চীতে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছে। আপনি চোল রাজ্যে শৈবমত প্রচার করবেন, যদি না করেন, তাহলে আপনাকে হত্যা করা হবে। আপনার সেখানে যাওয়া কখনোই উচিত হবে না। আপনার প্রাণ রক্ষা হলে পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীর জীবনে মঙ্গল সাধিত হবে। আর যদি কোনো দৈব দুর্বিপাকে আপনার মৃত্যু হয় তাহলে পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার নেমে আসবে। আপনিই ভগবানের পাদস্পর্শ করার একমাত্র ব্যক্তি, আপনার মতো মানুষ আর কে আছে? আপনি পাপী লোককে পুণ্যের পথে নিয়ে যান। তাদের একমাত্র সহায় স্বরূপ বিরাজ করেন। তাই আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমি আপনার পরিবর্তে যাই। আমি আপনার বস্ত্র পরিধান করি আর আপনি আমার বস্ত্র পরিধান করে অন্য দ্বার দিয়ে শ্রীরঙ্গম থেকে চলে যান। আর কাল বিলম্বের অবকাশ নেই। এখনই তৈরি হতে হবে।

রামানুজ একথা ভালোভাবে চিন্তা করে কুরেশের মতকেই সমর্থন করলেন। তিনি কুরেশের বেশ ধারণ করলেন। কুরেশও তাঁর গৈরিক বস্ত্র পরিধান করলেন। তিনি মঠ থেকে পশ্চিম অভিমুখে অরণ্যের ভিতর দ্রুত পদসঞ্চারে প্রস্থান করলেন। গোবিন্দ এবং অন্যান্য শিষ্যরা তাঁর অনুবর্তী হলেন।

কুরেশ তাঁর মহানুভব গুরুদেবের গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেন। তাঁর হাতে দণ্ড, কমণ্ডলু। তিনি রাজার প্রেরিত দূতদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। দূতেরা তাঁকেই রামানুজ জ্ঞান করে কাঞ্চীপুরে নিয়ে গেল। চোলরাজ তাঁকে দর্শন করে বড়োই সমাদর করলেন। তিনি জানেন যে রামানুজ হলেন জ্ঞানী ব্যক্তি। কারণ যখন তার বয়স ছিল ৮ বছর, সেইসময় তাঁর ভগিনী পিশাচগ্রস্তা হলে রামানুজ তাকে সুস্থ করেছিলেন। কুরেশকে রামানুজ জ্ঞান করে তিনি বললেন—মহাত্মা, আপনি অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। আপনার মুখ থেকে শ্রীবাক্য শোনার জন্যই আমি আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি। আমার সভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গেও শাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা আপনি করবেন। আমার বহুদিনের স্বপ্ন আজ সফল হচ্ছে, এখন আপনিই বলুন, আমার মতো মানুষের কী করা উচিত?

কুরেশ একথা শুনে বললেন—হে রাজন, হে সুধীমণ্ডল, আপনারা জানেন যে সর্বলোক পবন বিষ্ণু হলেন এই জল স্থল অন্তরিক্ষের ধারক এবং পরিচালক।

এই কথা শুনে কৃমিকণ্ঠ ক্রোধে একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন—আমি ভেবেছিলাম আপনি মহাপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ। কিন্তু আপনি যখন শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার কথা বলছেন, তখন মনে হচ্ছে আপনি স্বয়ং পরম ভণ্ড। কারণ আপনি হরকে পরিত্যাগ করে হরির সাধনায় মগ্ন আছেন।

যিনি সর্বলোক সংহারকারী কালকেও সংহার করে থাকেন, তিনি মহাকাল নামে খ্যাত, তাঁকে আপনি অগ্রাহ্য করছেন? একদিন বিষ্ণুকেও তাঁর হাতে নাশ হতে হবে, আপনি সেই সর্বশক্তিমান শিবকে পরিত্যাগ করে দুর্বল বিষ্ণুর উপাসনা করার পরামর্শ দিলেন কেন? আপনি অবিলম্বে এই মত ত্যাগ করুন। এখানে যেসমস্ত পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত আছেন তাঁরা শিবতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান দেবেন। আপনি এখানে শৈবমতে দীক্ষিত হন। তা না হলে আপনার আর নিস্তার নেই।

কৃমিকণ্ঠে এইকথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ একত্রে কুরেশকে আক্রমণ করল। তারা কুরেশের সঙ্গে তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হল। কুরেশ নির্ভয়ে নিজের মত সমর্থন করতে লাগলেন। এইভাবে অনেকক্ষণ চলে গেল, শেষ অবধি কৃমিকণ্ঠ আর সহ্য করতে না পেরে বললেন—হে পণ্ডিত, আপনি যদি আপনার প্রাণ রক্ষা করতে চান তাহলে বলুন শিবের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

এই কথা শুনে নির্ভীক কুরেশ একটু হেসে বললেন—শিবের অপেক্ষা দ্রোণ বড়ো, এখানে শিব এবং দ্রোণ দুটি পরিমাণবাচক শব্দ বলা হল। প্রায় বত্রিশ শের পরিমিত দ্রব্যকে এক দ্রোণ বলা হয়। কুরেশের এমন উপহাসের কথা শুনে চোলরাজ এবং তাঁর সভাসদ বর্গ অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে অবিলম্বে রামানুজ অর্থাৎ কুরেশের মুখ বন্ধ করতে হবে।

এই পৃথিবীতে ধর্মের নামে কত রক্তপাত হয়েছে, কুরেশ বুঝতে পারলেন এখন তাঁকে ঈষৎ বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে। তিনি রামানুজের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে আপনার মন, প্রাণ, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, দেহ এবং আত্মা সবকিছুই সমর্পণ করেছিলেন। তিনি মনে মনে রামানুজকে স্মরণ করলেন। তিনি জানতেন যে চোলরাজের কাছে এলে তাঁর জীবন সংশয় হতে পারে। তবে গুরুর মহামূল্য জীবন রক্ষার করার জন্য কুরেশ এই জীবনকে পরিত্যাগ করতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তিনি হলেন পরম ভক্ত। তিনি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করলেন। তাই এই বিপদের ক্ষণে ভগবানকে স্মরণ করে বললেন—হে ঈশ্বর, আমার প্রতি তোমার করুণা একই রকম আছে। আমি তোমাকে বারবার নমস্কার করছি। এই রাজচক্রবর্তী এবং এখানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তোমার মহিমা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তুমি এই নগণ্য জীবদের রক্ষা করো। এদের হৃদয়ে যেন সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা আসে সেদিকে নজর দাও।

কুরেশ তখন ছিলেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। এইসময় কৃমিকণ্ঠ এবং তাঁর সভাসদবর্গরা কুরেশের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। চোল নৃপতি তীব্রস্বরে কুরেশকে বন্ধন করতে আদেশ দিলেন। তিনি রাজপুরুষদের বললেন—তোমরা এই দুরাত্মাকে এখনই আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও। ওঁর চোখদুটি উপড়ে ফেলো। আমার ভগিনী পিশাচগ্রস্তা হলে এই দুরাত্মা তাঁর আরোগ্য বিধান করেছিলেন, তাই এর প্রাণনাশ করো না। কিন্তু তার থেকেও বেশি শাস্তি তোমরা একে দাও। শিবদ্বেষী ইহজীবনেই যেন অনন্ত নরকভোগের যন্ত্রণা পায়।

রাজার নির্দেশক্রমে রাজপুরুষরা কুরেশকে কান্তারদেশে নিয়ে গেল। তারপর তাঁর দুটি চোখ উৎপাটিত করলেন। কিন্তু এত দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা—যন্ত্রণার মধ্যেও কুরেশ কোনোরকম ভয় প্রকাশ করলেন না। এমনকি তিনি অসন্তুষ্টও হলেন না। তিনি সুখ এবং দুঃখকে একই মুদ্রার এপিঠ—ওপিঠ স্বরূপ গণ্য করতেন। উৎপীড়নকারীদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে বার বার প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি জানেন সুখ—দুঃখ সবই ঈশ্বরের দান। তাই শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা তাঁকে বিন্দুমাত্র আঘাত করতে পারল না। এই জাতীয় দুঃখ—যন্ত্রণা না পেলে আমাদের পরম উপলব্ধি হয় না। তাই ঈশ্বর আমাদের মাঝেমধ্যে এমন

দুঃখের সাগরে ফেলে দেন। প্রকৃত সাধকরা এই দুঃখের মুহূর্তকে মোটেই অস্বীকার করতে চান না। পৃথিবীতে সুখ কখনোই চিরকাল স্থায়ী হতে পারে না।

এইসব কথা চিন্তা করতে করতে কুরেশ ওই মুহূর্তগুলিকে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। তিনি অবিচলিত চিত্তে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করছেন দেখে পাষাণতুল্য রাজপুরুষদের হৃদয়ে কী ভয় এবং ভক্তির সঞ্চার হল? শুধু তাই নয়, অন্ধ কুরেশ রাজপুরুষদের প্রতি আশীর্বাদ বাক্য প্রদান করছেন দেখে তাঁরা একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা কুরেশের ওপর আর বেশি অত্যাচার না করে রাস্তার পাশে এক ভিক্ষুককে ডেকে আদেশ করলেন তুই এই সাধুর হাত ধরে একে শ্রীরঙ্গমে নিয়ে যা। তোকে কিছু অর্থ দিচ্ছি। তা তুই পথে খরচ করিস। ভিক্ষুকও খুবই আনন্দের সঙ্গে কুরেশকে শ্রীরঙ্গমের দিকে নিয়ে চলল।

কথিত আছে যে এই ঘটনার কিছুদিন বাদে এক ভয়ংকর রোগে কৃমিকণ্ঠের মৃত্যু হয়েছিল। চোলরাজ শিবভক্ত ছিলেন। কিন্তু হরি এবং হরের মধ্যে অভেদজ্ঞান না থাকায় তিনি বৈষ্ণব বিদ্বেষী হয়েছিলেন। এই দোষটি যে শুধুমাত্র শৈবদের মধ্যে ছিল তা নয়। অনেক বৈষ্ণব ছিলেন শৈববিদ্বেষী। কুরেশের মতো মহাপুরুষ সংকীর্ণমনা না হতে পারেন, কিন্তু শিবকে লক্ষ্য করে মাঝে মধ্যে উপহাস করেছেন। আর এইভাবেই তিনি শিবের ক্ষুদ্রত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন। তিনি ভাবতেন কোনো বৈষ্ণবের শিবভক্তি থাকা উচিত নয়। শিব মন্দিরে যাওয়া তো দূরের কথা, শিবদর্শনও মহাপাপ। অনেকে এইভাবে পারস্পরিক হিংসা—দ্বেষ রচনা করেছেন।

শ্রীরামানুচার্যের দু—দল শিষ্য আছেন। একদলের নাম তেঙ্গেলে এবং অপরদলের নাম বাড়কেলে। এঁরা সকলেই নিরামিশাষী এবং জীবহিংসাকে মহাপাপ বলে মনে করেন। তবে এঁরা মনে করেন শৈব হিংসায় কোনো দোষ নেই। বারকেলে বলে তেঙ্গেলের মৃত্যু হলে দোষ নেই। আবার তেলেঙ্গরাও বলে থাকেন বারকেলের সর্বনাশ করাই হল তাদের জীবনের অস্তিত্ব। শিবনিন্দা করলে এমনই অবস্থা হয়।

রামানুজ শ্রীরঙ্গমের পশ্চিমে অবস্থিত একটি বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি জানেন এখন এখানে তাঁকে বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে হবে। নাহলে প্রাণনাশের সমূহ সম্ভাবনা। ভক্তরা ধীরে ধীরে তাঁর সমীপে উপস্থিত হলেন। এলেন গোবিন্দ, দাশরথি, ধনুর্দাস। কৃমিকণ্ঠ ইতিমধ্যেই রামানুজের খোঁজে অসংখ্য চর প্রেরণ করেছেন। তাই রামানুজ এবং তাঁর ভক্তবৃন্দ সারাদিন অবিশ্রান্তভাবে খেটে চললেন। যে করেই হোক একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছোতে হবে। শেষপর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন তখন ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। অনিদ্রার ফলে তাঁদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেছে। সমস্ত শরীরে দেখা দিয়েছে তীব্র বেদনা। কণ্টকাকীর্ণ ভূমির ওপর দিয়ে চলার ফলে পায়ে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেই শিলাতলের সুন্দর ও মনোময় পরিবেশের মধ্যে তাঁরা সকলে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

এটি ছিল এক চণ্ডালপল্লি। চণ্ডালদের আমরা নীচজাতীয় বলতে পারি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে যা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা দেখলেন যে ব্রাহ্মণগণ সেখানে নিদ্রিত, তাঁরা বুঝতে পারলেন যে এঁরা সকলে অত্যন্ত বিপন্ন এবং ক্ষুধার্ত। তাই এখানে এসে এঁরা নিদ্রাসুখ ভোগ করছেন। চণ্ডালগণ তাৎক্ষণিক নানা ফল সংগ্রহ করলেন, সেই ফল নিদ্রিত ব্রাহ্মণদের কাছে রেখে এলেন। রেখে দিলেন রাশিকৃত শুকনো কাঠ। আগুন জ্বালিয়েও রেখে দিলেন। তারপর ভক্তি সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁদের জন্য।

কিছুক্ষণ পরে রামানুজের নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি চারপাশের পরিবেশ অবলোকন করলেন। দেখলেন কিছুটা দূরে একাধিক চণ্ডাল অপেক্ষারত। অসংখ্য ফলের সমাবেশ। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। তিনি বুঝতে পারলেন যে ঈশ্বরের কৃপায় তাঁরা সৎ স্বভাবযুক্ত চণ্ডালদের সংস্পর্শে এসে পড়েছেন। রামানুজ এবং তাঁর সঙ্গীগণ নির্মলজলা নদীতে অবগাহন করলেন। ফলসমূহ শ্রীহরির উদ্দেশে নিবেদন করলেন। দু—তিন দিন তাঁরা অনাহারে ছিলেন। এখন ফলাহার করে তৃপ্তি লাভ করলেন। রামানুজ সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। চণ্ডালদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন যে তাঁরা চোলরাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে এসেছেন।

তিনি চণ্ডালদের আশীর্বাদ করলেন। তাঁকে এখন ব্রাহ্মণপল্লির সন্ধান করতে হবে। বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তাঁরা এক ব্রাহ্মণের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। গৃহস্বামী মাধুকরী বৃত্তির উদ্দেশে বের হয়েছেন। প্রিয় পত্নী কেদাম্ব্য তাঁদের দেখে একেবারে আত্মহারা হলেন। যথাবিহিত পূজাপাঠ করে রন্ধনের উদ্দেশে রন্ধনশালায় প্রবেশ করলেন। ভিক্ষা করে গৃহস্বামী রঙ্গদাস ফিরে এলেন। তিনি এতজন বৈষ্ণবকে দেখে খুবই খুশি হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর পত্নী বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করে আনলেন। প্রায় তিন দিন রামানুজ এবং তাঁর সঙ্গীগণ ছিলেন অনাহারে বা অর্ধাহারে। তাঁরা আকণ্ঠ ভোজন করলেন। সকলেই হলেন পরিতুষ্ট। এখানে তাঁরা দিন দুই অবস্থান করলেন। তারপর রঙ্গদাস ও তাঁর স্ত্রীকে রামানুজ বৈষ্ণব মতে দীক্ষা দিলেন।

চণ্ডালগণ তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন। এবার তাদের বিদায় হতে হবে। তারা বহ্নি পুষ্করিণী নামে একটি স্থানে উপস্থিত হলেন। রঙ্গদাসও তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন। রঙ্গদাসকে বিদায় দিয়ে রামানুজ শালগ্রামে পৌঁছোলেন। দেখা হল পরম তপস্বী আন্ধ্রপূর্ণ নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। এই আন্ধ্রপূর্ণ ছিলেন বৈরাগ্যের এক মূর্ত প্রতীক। রামানুজ তাঁকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষা দিলেন। আন্ধ্রপূর্ণকে তিনি নিজের সহচর হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। সেইদিন থেকে আন্ধ্রপূর্ণ সর্বান্তকরণে রামানুজের সেবা করতে থাকেন। তিনি রামানুজকে তাঁর ইষ্টদেবতা জ্ঞান করতেন।

কিছুদিন শালগ্রামে থেকে তাঁরা নৃসিংহক্ষেত্রে এলেন। সেখানে তিনি এক ভক্তের কথা জানতে পারলেন। রামানুজ ওই ভক্তকে দর্শন দিতে এক গ্রামে এলেন। দেখা হল পূর্ণনামা নামে এক ভক্তের সঙ্গে। রাজা বিট্ঠলদেব তাঁকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন। এই রাজা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তিনি প্রতিদিন শ্রদ্ধা সহকারে অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সেবা করতেন। রাজার এক কন্যা রাক্ষসগ্রস্তা হয়েছিল। তাকে কিছুতেই সুশ্রূষা করা সম্ভব হয়নি। দেশ—বিদেশ থেকে অনেক চিকিৎসক এবং বৈদ্য আনা হয়। সকলেই বিফল হন। বিট্ঠলদেব শুনেছিলেন যে কয়েকজন বৈষ্ণব পূর্বদেশ থেকে এসেছেন। তিনি ওই বৈষ্ণবদের আমন্ত্রণ জানালেন।

রামানুজ রাজকুমারীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর অসুখ সেরে গেল। বিট্ঠলদেব চোখের সামনে এই অলৌকিক ঘটনা দেখে রামানুজের একজন অনুগামী হয়ে ওঠেন। রামানুজ তাঁকে বৈষ্ণবধর্মের নানান দিক বুঝিয়ে বলেছিলেন। এইসকল কথা শুনে রাজা বিট্ঠলদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এমন কিছু অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে যা এই ধর্মকে সকলের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছে। বৈষ্ণবধর্মের সবথেকে বড়ো বিষয় হল ভক্তিভাব।

রাজার আমন্ত্রণে বৌদ্ধ আচার্যগণ তাঁর রাজপ্রাসাদে এলেন। এক মহাসভা আহূত হল। রামানুজ সেই মহাসভায় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে উৎসাহী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু দুষ্ট স্বভাবসম্পন্ন বৌদ্ধপণ্ডিত তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল। তারা বিকট শব্দ করে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করল। বিট্ঠলদেবের আদেশ অনুসারে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ওই সভাগৃহ থেকে বের করে দেওয়া হল। এতে অন্যান্য বৌদ্ধগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তারা নীচ উপায় পরিত্যাগ করে। রামানুজ ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্য সভায় সকলের কাছে উপস্থাপিত করলেন।

এবার বৌদ্ধদের প্রধান পণ্ডিতের বলার পালা। তিনি যতিরাজের বাক্যের প্রতিবাদ করার জন্য সমুত্থিত হলেন। কিন্তু তিনি রামানুজের যুক্তিকে খণ্ডন না করে অযথা সনাতনধর্মের ওপর নানাভাবে কটাক্ষ করতে লাগলেন। এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাদেরও তিনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে থাকলেন।

বিট্ঠলদেব বললেন—হে মহাত্মা, আমি জানি আপনি কত বড়ো পণ্ডিত। বৌদ্ধশাস্ত্রে আপনার ব্যুৎপত্তির কথাও সর্বজনবিদিত। কিন্তু এভাবে আপনি কেন নিন্দা করছেন? আপনার মুখ থেকে নিন্দা শোনার জন্য আমরা এখানে মিলিত হইনি। আপনি নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করুন। দুর্লভ যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা আপনার বিরুদ্ধ

পক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করুন। আর যদি তা না করতে পারেন তাহলে অবিলম্বে ওই মিথ্যা ধর্ম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন।

বৌদ্ধাচার্য বুঝতে পারলেন যে রামানুজের প্রবল ব্যক্তিত্ব রাজাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে। তিনি আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ ধরে কিছু প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করলেন। তারপর বিদায় গ্রহণ করলেন। অন্যান্য বৌদ্ধ প্রতিবাদীরাও তাদের সমাজ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করল, তবে তারাও কৃতকার্য হতে পারল না।

তখন রাজা বিট্ঠলদেব বললেন—সভ্যগণ, আপনারা সকলে প্রত্যক্ষ করলেন যে আজ বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বৈষ্ণবাচার্যকে পরাস্ত করতে পারেননি। তাঁদের কারোর এমন সামর্থ নেই যে তাঁরা রামানুজের উত্থিত বিষয়গুলিকে খণ্ডন করবেন। এই অবস্থায় আমাদের কী কর্তব্য? আমরা কি মিথ্যা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে জীবনে দুঃখ ডেকে আনব? না কি আমরা পরমজ্ঞান লাভ করব। বুদ্ধিমান মানব মাত্রেই স্বীকার করবেন যে দুঃখের থেকে সুখ এবং অজ্ঞান থেকে জ্ঞান সর্বদা ও সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। তাহলে আসুন আমরা সকলে মিলে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হই।

প্রজাবৎসল নরপতি এমন আদেশ করলে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়া সভায় উপস্থিত সকলে সানন্দে এবং সানুগ্রহে রামানুজের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিলেন। আর রামানুজ এই মহান কাজটির নাম দিলেন বিষ্ণুবর্ধন। যে কয়েকজন বৌদ্ধ এই মত মানতে পারলেন না তারা সবলে রাজগৃহ থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

এইভাবে রামানুজ সহস্র সহস্র বৌদ্ধকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করলেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ বিট্ঠলদেবের কাছে কাটানোর পর শিষ্যদের নিয়ে যাদবাদ্রিতে উপনীত হলেন। এই স্থানের বর্তমান নাম মেলকোট। ১০২০ শকাব্দে তিনি এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন। ওই বৎসরের পৌষমাস শুক্লা চতুর্দশী বৃহস্পতিবারের প্রাতঃকালে ভ্রমণ করতে করতে তুলসী কাননে এক বল্মীস্তূপের নীচে এক দেববিগ্রহ অবলোকন করেন। সেই বিগ্রহকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। তাকে জলে ধুয়ে পবিত্র পীঠের ওপর স্থাপন করেন। এই জীবন্ত মনোহর মূর্তি দেখে সকলে অত্যন্ত কৃতার্থ হলেন। বৃদ্ধ লোকেরা বলতে লাগলেন আমরা বাল্যকালে বৃদ্ধ লোকেদের কাছে শুনেছিলাম যে আগে এই শৈলে যাদবাদ্রিপতির পুজো হত। কিন্তু মুসলমানরা এখানে এসে সব বিগ্রহ ভেঙ্গে দেয়। তখন বিষ্ণু বিগ্রহের সেবকরা বিগ্রহটিকে গুপ্তস্থলে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর আর পুজো ও উৎসব হয় না। আমাদের নিশ্চিত বোধ হচ্ছে ইনিই সেই যাদবাদ্রিপতি। আপনার মতো এক মহানুভবের আগমনে আবার তিনি ভক্তসেবা পাবেন। সেই কথা শুনে রামানুজ বললেন—আপনারা ঠিকই বলেছেন। ইনিই সেই যাদবাদ্রিপতি। রজনিতে ইনিই স্বপ্নে আমার কাছে এসে সেবার্থ আদেশ করেছেন। আপনারা সকলে একত্র হয়ে যাতে সুন্দর ও সুনিপুণ মন্দির তৈরি হয় সেই ব্যাপারে যত্নবান হন। কাল থেকেই এঁর সেবাকার্য শুরু করুন।

রামানুজের আদেশ অনুসারে গ্রামের সকলে পর্ণশালা নির্মাণ করলেন। যাদবাদ্রিপতিকে স্থাপন করে তাঁর পূজা শুরু হল। অল্পকালের মধ্যেই এক বিরাট মন্দির তৈরি হল। কল্যাণী নামে এক পুষ্করিণীর পাশে ওই মন্দিরটি ছিল। কল্যাণী পুষ্করিণীর জলে যাদবাদ্রিপতির স্নান ও অন্যান্য কার্য হল। এই পুষ্করিণীর উত্তরভাগে রামানুজ একদা বিচরণ করতে করতে একটি শ্বেতমৃত্তিকা আবিষ্কার করেন। কারণ বৈষ্ণবভক্তরা এই শ্বেত মৃত্তিকার দ্বারা তাঁদের ঊর্ধ্বপুণ্ড্র রচনা করেন। এতদিন তাঁরা এই মৃত্তিকা ভক্তগ্রাম থেকে আনছিলেন। কিন্তু সেই মৃত্তিকা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। রামানুজ এমন মৃত্তিকার অন্বেষণে অনেক জায়গায় অনেককে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কেউই কৃতকার্য হননি। তাই এই মৃত্তিকা আবিষ্কার করে তাঁরা যারপরনাই খুবই সুখী হলেন।

দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরে এক দেবতার দুটি করে মূর্তি থাকে। একটি অচল। অর্থাৎ মন্দির থেকে তিনি কখনো বাইরে গমন করেন না। আর—একটি সচল। অর্থাৎ উৎসবের সময় তিনি বহির্দেশে বিমান যোগে

চলে যান। এইজন্য সেই বিগ্রহের আর এক নাম হল উৎসব বিগ্রহ। রামানুজ এক দাদ্রিপতি কর্তৃক আদৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—বৎস রামানুজ, আমি তোমার সেবায় অতিশয় প্রীত হয়েছি। কিন্তু আমার কোনো উৎসব বিগ্রহ না থাকায় আমি মন্দিরের বাইরে যেতে পারি না। ফলে আমি ভক্তগণ এবং পতিতদের আশীর্বাদ দিতে পারছি না। তুমি দিল্লির সম্রাটের কাছে রক্ষিত আমার সম্পদকুমার নামের দ্বিতীয় বিগ্রহটি নিয়ে এসো।

এই স্বপ্ন পাবার পর রামানুজ তাঁর কিছু শিষ্য নিয়ে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রায় মাস দুই অতিবাহিত হলে তিনি দিল্লি গিয়ে উপনীত হলেন। কথিত আছে যে, সেই সময়ের সম্রাট তাঁর দেহের সৌন্দর্য, পাণ্ডিত্য এবং প্রভাব দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি রামানুজের কাছে জানতে চান তাঁর দিল্লি আসার উদ্দেশ কী। তাতে তিনি সম্পদকুমার নামে দেববিগ্রহটি প্রার্থনা করলে দিল্লিশ্বর সেটি নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। রামানুজ সেটি নেওয়ার জন্য দেবশালায় চলে গেলেন। কিন্তু সেখানে ভারতের বিভিন্ন দেবালয় থেকে লুণ্ঠিত অসংখ্য দেববিগ্রহ ছিল। রামানুজ তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করেও অভীষ্ট বিগ্রহটি খুঁজে পেলেন না। তখন সম্রাট তাঁর মেয়ে লচিমার অতি প্রিয়তম একটি বিগ্রহ এনে রামানুজকে দেখালেন। রামানুজ দেখেই বুঝতে পারলেন যে ইনিই হলেন সম্পদকুমার। দিল্লির সম্রাটের আদেশ অনুসারে তাঁর কাছ থেকে বিগ্রহটি গ্রহণ করে তিনি দিল্লি নগর থেকে সশিষ্য যাত্রা করলেন। তাঁরা বিশ্রাম গ্রহণ না করে দিবানিশি চলতেই থাকলেন। রামানুজ স্থির করেছিলেন সম্রাট নন্দিনী যদি এই বিগ্রহের জন্য বায়না করেন তাহলে দিল্লিপতি হয়তো এই বিগ্রহ তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। রাজকন্যা যখন শুনলেন তাঁর ভালোবাসার জিনিসটি কোনো ব্রাহ্মণ নিয়ে গেছেন তখন তার শোকের কোনো সীমা থাকল না। তিনি শোকে অধীরা হয়ে পড়লেন। পিতার নানা উপদেশ বাক্য তাকে শান্তি দিতে পারল না। তিনদিন কিছু না খেয়ে তিনি উন্মাদিনীর মতো আচরণ করলেন। সম্রাট বাধ্য হয়ে তাঁর একদল সৈন্যকে বললেন তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ওই দেববিগ্রহটি নিয়ে এসো।

রাজকন্যা বললেন পিতা, আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি ওই ব্রাহ্মণদের কাছে যাই।

সম্রাট কন্যার বাক্যে স্বীকৃত হলেন।

দাসদাসীদের সঙ্গে একটি সুসজ্জিত শিবিকা দেওয়া হল। সৈন্যগণও চারপাশে থাকলেন। এইসময় কুবের নামক এক রাজকুমার সম্রাট কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পাণি গ্রহণের বাসনায় এলেন। তিনি বেশ কিছুদিন সম্রাটের ভবনে বসবাস করছিলেন। তিনি নানাভাবে তার প্রণয়িনীর মন পাবার চেষ্টা করছিলেন। যখন দেখলেন সম্রাট—কন্যা লচিমার উন্মাদিনীর মতো ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে ধাবিতা হয়েছেন, তিনিও তার প্রিয়তমাকে অনুসরণ করলেন।

এদিকে রামানুজ সশিষ্য গমন করতে করতে সম্রাটের রাজ্যসীমা পার হয়ে গেলেন। অনুসরণকারিণী সম্রাটকন্যা তখনো অনেক দূরে অবস্থান করছেন। অল্পদিনের মধ্যেই সম্পদকুমারকে নিয়ে রামানুজ মেলকোটা বা যাদবাদ্রিতে পৌঁছোলেন। শ্রীবিষ্ণুর উৎসব বিগ্রহকে মন্দিরের মধ্যে গুপ্তদেশে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পথে আসতে তাঁকে চণ্ডালরা বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের সহায়তা না পেলে রামানুজ অতি দ্রুত যাদবাদ্রিতে পৌঁছোতে পারতেন না।

এই দিন থেকে একটি নিয়ম সেখানে প্রচলিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে বছরের মধ্যে তিনদিন চণ্ডালগণ যাদবাদ্রিপতির মন্দিরে যেতে পারবেন।

শ্রীহরির অনন্ত, অখণ্ড, অদ্বিতীয় রূপের মতো অসংখ্য সাকার রূপগুলিও নিত্য। এই রূপগুলি কখন কোথায় কীভাবে আসে তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কোনো একটি রূপ প্রতিমা আকারে অবতীর্ণ হয়। এই পবিত্র রূপগুলিকে আমরা শ্রীহরির অর্চাবতার বলতে পারি। এই তালিকাতে আছেন শ্রীঅমরনাথ, শ্রীকেদারনাথ, শ্রীবদ্রিনারায়ণ, শ্রীচন্দ্রনাথ, শ্রীজগন্নাথ শ্রীদ্বারকানাথ, শ্রীনাথ, শ্রীওঁকারনাথ, শ্রীপশুপতিনাথ,

শ্রীতারকনাথ, শ্রীহিংলাজেশ্বরী, শ্রীকালিকামাতা, শ্রীরামনাথ ইত্যাদি। এঁরা সকলেই একই দেবতার বিভিন্ন রূপ।

যাঁরা স্থূলদর্শী তাদের দৃষ্টিতে ওই দেববিগ্রহটি অন্যান্য বিগ্রহ থেকে কোনোভাবে পৃথক বা আলাদা বলে অনুভূত হত না। কিন্তু যতিরাজ রামানুজ ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা পুরুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শ্রীবিষ্ণু এই রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। পরম ভক্তিমতী সম্রাট কন্যা লচিমারকে কৃতার্থ করার জন্যই তিনি তাঁর পিতার হাতে বন্ধনপ্রাপ্ত হয়েছেন। রাজভবনে গিয়ে তিনি সম্রাট কন্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

লচিমার জন্মজন্মান্তর অর্জিত ভক্তিবলে দিব্যচক্ষু লাভ করেছিলেন। সম্পদকুমারকে তিনি নিজের অভীষ্ট দেব বলে জানতে পেরেছিলেন। সম্পদকুমারকেই তিনি তাঁর পতি হিসাবে বরণ করেন। রামানুজ যখন তাঁর প্রিয়তমকে নিয়ে গেলেন, তখন লচিমার শোক সাগরে নিমগ্ন হলেন। উন্মাদিনী হয়ে ইষ্টদেবতার অন্বেষণে জীবনের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁর এমন আচরণ দেখে সকলে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জন্মসূত্রে মুসলমানি, কিন্তু এক হিন্দু দেবতার প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ কেন? সম্রাট তাঁর কন্যার মনোভাব বুঝতে না পেরে তাঁকে উন্মত্তা বলে স্থির করেন। অভীষ্ঠ বস্তুলাভে উন্মাদনার উপশম হতে পারে ভেবে কন্যার কোনো আবদারে সম্রাট আপত্তি জানাননি। এমনকি কন্যা যাতে যথাযথ স্থানে পৌঁছোতে পারে সেইজন্য তিনি যথেষ্ট সেনাবাহিনীও সঙ্গে দিয়েছিলেন। সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে কন্যা লচিমার রামানুজকে অনুসরণ করলেন।

তাঁরা দক্ষিণ অভিমুখে চলতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও সম্পদকুমারের সন্ধান পাওয়া গেল না। অনাহারে অনিদ্রায় লচিমার অবস্থা হয়েছে ভয়ংকর। পিতৃরাজ্যের সীমা অতিক্রম করেও সম্পদকুমারের কোনো হদিশ করতে না পারায় লচিমার জীবন বিসর্জন দেওয়াই স্থির করলেন। তাঁর হৃদয়ে তখন বিরহের অনল জ্বালা জ্বলে উঠেছে। তিনি কিছুতেই ধৈর্য গ্রহণ করতে পারলেন না। এমনকি যে মানুষটি জীবনের প্রতিটি বসন্ত প্রহর তাঁর সান্নিধ্যলাভে উন্মুখচিত্তে অপেক্ষামান ছিলেন, সেই কুবেরের আশ্বাসবাক্যও তাঁর কানে প্রবেশ করল না। তিনি শুধু 'হে নাথ' 'হে নাথ' বলে আর্তনাদ করতে থাকেন। সৈন্যদের অজ্ঞাতসারে বিবি লচিমার দক্ষিণদিকে এক নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করলেন। সকলের অলক্ষে কুবেরও তার অনুগামী হলেন। উন্মাদিনীর মতো কোনোদিক লক্ষ না করে আরাধ্য দেবতার ধ্যান করতে করতে এগোতে লাগলেন তিনি। মাঝে মধ্যে কুবের কিছু ফলমূল এনে তাঁর হাতে দিতেন। এই ফলমূল খেয়ে ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্ত করে অবিশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে চললেন সম্রাট কন্যা লচিমার।

রাত্রি হলে তিনি বিশ্রাম করতে বাধ্য হতেন। অনেকদিন কেটে যাবার পর তিনি মেলকোটা বা যাদবাদ্রিতে উপনীত হলেন। যাঁদের চোখ আছে তাঁরা যেমন পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করতে পারেন ঠিক সেইভাবে কন্যা লচিমার বুঝতে পারলেন যে কোথায় তাঁর প্রিয়তম সম্পদকুমারকে রাখা হয়েছে। তাঁর মধ্যে যে উন্মুখতা ছিল তা প্রশংসনীয়। শেষপর্যন্ত তিনি যেন মোহনার সন্ধান পেলেন।

তাঁর অমানুষী ভক্তি দেখে রামানুজ চমৎকৃত হলেন। মুসলমান কুলোদ্ভবা হলেও তিনি তাঁকে মন্দিরে যেতে নিষেধ করলেন না। রামানুজ বুঝতে পেরেছিলেন স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু তাঁর প্রিয়তমাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন।

লচিমারের অরণ্যভ্রমণ সমাপ্ত হল। এতদিন পর্যন্ত যে উদ্দেশ নিয়ে তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসছিলেন, সেই উদ্দেশ তাঁর শুভ পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে গেল। তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ অনির্বচনীয় সুখে শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্যে বিভাষিত হল। শেষে তাঁর পবিত্র অঙ্গ সম্পদকুমারের অঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। রাজকুমার কুবের দেবীর মতোই লচিমারকে সেবা করতেন। তিনি আর কোনো দেবতার উপাসনা করতেন না। লচিমার ছিলেন তাঁর হৃদরাজ্যের একমাত্র অধিশ্বরী। তিনি সেখানে আর এক মুহূর্তও অবস্থান করলেন না। তাঁর মধ্যে যেসমস্ত যাবনিক ভাব ছিল তা তিনি পরিত্যাগ করলেন। শ্রীরঙ্গমে গিয়ে শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর শরণাগত হলেন। মন্দিরে যাবার অধিকার তাঁর ছিল না। তিনি বাইরে থেকেই পলকহীন নয়নে দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে

থাকতেন। ভিক্ষার জন্যও কোথাও যেতেন না। যদি কেউ দয়াপরবশ হয়ে তাঁর হাতে সামান্য আহার্য্য দিতেন তাহলে তিনি তা কিঞ্চিৎ গ্রহণ করতেন। এইভাবে বেশ কিছুকাল কেটে গেল। একবার গভীর রাতে তিনি এক দৈববাণী শ্রবণ করলেন—আমি শরণাগত বৈষ্ণবগণের মোক্ষদানে দীক্ষিত হইয়াছি, জগন্নাথ পণ্ডিতগণের মোক্ষদানে দীক্ষিত হইয়াছেন।

এই কথা শুনে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁকে জগন্নাথ ক্ষেত্রে পৌঁছোতে হবে। বেশ কয়েকমাস কেটে যাবার পর তিনি পুরীধামে সমাগত হলেন। পতিত পাবন পুরুষোত্তমের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত জীবের মধ্যে এক পরমাত্মা উপলব্ধি করেছিলেন।

মহাত্মা কুবের একবার লোহার পাত্রের ওপর রুটি তৈরি করছিলেন। এই সময় একটি কুকুর এসে ওই রুটিখানি তুলে নিয়ে যায়। এই ঘটনা ঘটতে দেখে তিনি ঘিয়ের পাত্র নিয়ে কুকুরের পিছনে যেতে থাকেন এবং বলতে থাকেন হে নারায়ণ, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন। আমি রুটিখানি ঘৃতসিক্ত করি। না হলে আপনার ভোজনে কষ্ট হবে।

ঈশ্বরের প্রতি কতখানি আনুগত্য ও ভালোবাসা থাকলে এমন উপলব্ধি সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। আমরা জানি, আমাদের মধ্যে যতদিন দেহাত্মবুদ্ধি থাকবে ততদিন আমরা জাত্যাভিমান থেকে মুক্ত হতে পারব না। দেহ আছে বলেই ধর্ম, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি আছে। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ শূদ্র, কেউ বৈশ্য, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রিস্টান, কেউ শিখ, কেউ বৌদ্ধ ইত্যাদি বোধ আছে। আর দেহ না থাকলে এইসব বোধও থাকবে না। বিবি লচিমার এবং কুবের ঈশ্বরের কৃপায় দেহাত্মস্থানের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। তাই স্বয়ং রামানুজও তাঁদের পূজা করতেন। ভাবতে ভালো লাগে যে আজও সম্রাট দুহিতার পবিত্র বিগ্রহ দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বৈষ্ণব মন্দিরে পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূজিতা হয়। আর এতেই প্রমাণিত হয় যে কেন হিন্দুধর্মকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শের ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ছাব্বিশ

কুবের শ্রীক্ষেত্রে প্রস্থান করার পর কুরেশ তাঁর স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে ভগবান সুন্দরভুজের পূজার বাসনায় শ্রীরঙ্গম থেকে কৃষ্ণাচলে এলেন। এখানে বেশ কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। সেখানে তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠস্তব রচনা করেন। সেখান থেকে যতিরাজের পাদস্পর্শ বাসনায় যাদবাদ্রিতে গমন করলেন। যখন অভীষ্ট দেবের সম্মুখীন হলেন তখন তাঁকে ভক্তিভরে পুজো করলেন।

রামানুজ সস্নেহে বললেন আজ আমি আমার পরম ভক্তের সংস্পর্শে পবিত্র হলাম। এই দিনটি কখনো ভুলতে পারব না।

রামানুজের আলিঙ্গন এবং মধুর সম্ভাষণে কুরেশ আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। তিনি কোনোরকম কথা বলতে পারলেন না। তাঁর পত্নী এবং সন্তান পরাশর রামানুজের অনুগ্রহে অনুগৃহীতা হলেন। তাঁরা পরম সুখে রামানুজের সান্নিধ্যে দিন অতিবাহিত করতে থাকলেন।

কিছুদিন বাদে রামানুজ কুরেশকে বললেন—বৎস তুমি কাঞ্চীপুরে গিয়ে বরদারাজের কাছে চোখের জন্য প্রার্থনা করো। আমার স্থির বিশ্বাস যে বরদারাজ তোমার অন্ধত্ব নাশ করবেন। দুরাচারী কৃমিকণ্ঠ পরলোকগত হয়েছে। আর কোনো ভয়ের কারণ নেই, তুমি আর দেরি কোরো না।

গুরুর আদেশ শুনে কুরেশ যথা আজ্ঞা বলে কাঞ্চীপুরে চলে গেলেন। বরদারাজ সন্নিধানে গিয়ে কায়মনোবাক্যে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। বরদারাজ কুরেশের ভক্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে বললেন— বৎস কুরেশ, তোমার কী প্রার্থনা তা বলো। আমি এখনই তা পূর্ণ করব।

মহামতি কুরেশ বললেন— হে ভগবান চর্তুগ্রাম যেন আপনার প্রসাদে পরম বর প্রাপ্ত হয়। বরদারাজ বললেন— তথাস্তু।

কুরেশ আবার স্তব করতে লাগলেন। বরদারাজ বললেন— কুরেশ তুমি আর কী প্রার্থনা করো। বলো তোমার কী চাই। আমি তা পূর্ণ করব। কুরেশ বললেন, হে ভগবন যারা চর্তুগ্রামের নির্দেশকর্তা তাঁরা যেন

পরমপদ প্রাপ্ত হন। বরদারাজ বললেন— তথাস্তু। কুরেশের আর আনন্দের সীমা থাকল না। নিজেকে তিনি কৃতার্থ বলে মনে করলেন। অন্ধত্বর বিষয় সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মন্দির থেকে স্বস্থানে এলেন।

এই চর্তুগ্রামের নির্দেশকর্তাই ছিলেন পাষাণ হৃদয়ের দুরাচারী যে কুরেশের দুই চক্ষু উৎপাটিত করেছিল। এই ভয়ংকর শত্রুকে কুরেশ কেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের জন্য উপযুক্ত বলে চিন্তা করলেন? তাই মনে হয় কুরেশ বোধহয় দেবতারও শ্রেয়, দেবগণও সর্বদা দৈত্যগণের বিনাশ সাধনে যত্নবান থাকেন। তাই তাঁদের হৃদয়কে আমরা কুরেশের হৃদয়ের সমতুল্য বলে বলতে পারি না। কুরেশের মতো মহাপুরুষ পৃথিবীতে খুব কমই এসে থাকেন।

যাদবাদ্রিতে অবস্থিত রামানুজ যখন লোকমুখে শুনলেন যে, কুরেশ নিজ শত্রুগণের পরম কল্যাণ বিধান করেছেন, কিন্তু নিজের অন্ধত্ব নাশের জন্য কোনো প্রার্থনা করেননি, তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি এক শিষ্য দ্বারা তাঁকে আদেশ করে বললেন—বৎস কুরেশ, তোমার অলৌকিক আনন্দলাভের বিষয়ে অবগত হয়ে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু তাতে তুমি নিজে আনন্দলাভ করে স্বার্থপরতার কাজ করেছ। আমি তোমায় এই আদেশ করছি যে আমাকে পরম সুখী করার জন্য তুমি বরদারাজের শ্রীচরণে তোমার দুটি চোখ ভিক্ষা চাও। তুমি কি জানো না যে তুমি, তোমার শরীর এবং মন—এ সমস্তই আমার, তোমার বলে কিছু নেই।

কুরেশ এই কথা শুনে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বললেন, আজ আমি কৃতার্থ হলাম। যতিরাজ এই মহাবিষয়ীকে অঙ্গীকার করেছেন। এতে তাঁর হৃদয়ের অনন্ত মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। আমি এখনই বরদারাজের কাছে যাব। আর রামানুজের জন্য নিজের চোখদুটি ভিক্ষা করব।

এরপর তিনি বরদারাজের কাছে পৌঁছে গেলেন। তাঁর শ্রীমূর্তির সামনে উপনীত হলেন। পরম শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। কুরেশের প্রতি পরিতুষ্ট হয়ে বরদারাজ বললেন—বৎস কুরেশ, তুমি আবার কী প্রার্থনায় এসেছ? তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই। বলো এখনই আমি তোমার সকল মনোবাসনা পূর্ণ করব।

কুরেশ নিজেকে কৃতার্থ মনে করে বললেন— ভগবন্, কিছুকাল আগে আমার অভীষ্টদেবের দুটি আদরের সামগ্রী আমি হারিয়ে ফেলেছি। আপনার অনুগ্রহে তা যেন পুনর্লাভ করতে পারি। বরদারাজ বললেন—বৎস দিব্যনয়নদ্বয় তোমার পরম পবিত্র দেহের শোভা বর্ধনপূর্বক এই মুহূর্তেই তোমার অভীষ্টদেবের পরম আনন্দের কারণ হোক। তোমার মতো এক পবিত্র ভক্তের দর্শনার্থেই আমি এই মর্ত্যধামে অবস্থান করছি। ভক্তগণ যেমন আমায় দর্শন করার জন্য অপেক্ষামান থাকেন, আমিও ঠিক সেইভাবে ভক্তদর্শনকে আমার আনন্দলাভের উপায় বলে জানি।

শ্রীহরির এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করে কুরেশ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি সংজ্ঞালাভ করলেন। তখন নিজের নয়নদ্বয় পুনঃপ্রাপ্তি উপলব্ধি করে অত্যন্ত খুশি হলেন। তাঁর দু—চোখ থেকে আনন্দাশ্রু বিসর্জিত হতে থাকল। তিনি বললেন— হে ভগবন, তুমি দিয়েছিলে, তুমি গ্রহণ করেছিলে। আজ আবার তুমিই প্রত্যর্পণ করলে। হে ইচ্ছাময়, তোমার দুর্বোধ্য লীলার তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার সৃষ্টি আনন্দময়ী। তোমার পালনক্রিয়া আনন্দময়ী এমনকি তোমার প্রলয় প্রসবিনী নিদ্রাতেও আনন্দ আছে। অজ্ঞান বলে আমি সেই আনন্দের সন্ধান করতে পারি না। আজ আমার কী ভাগ্য, আজ তোমার অনুগ্রহ লাভ করলাম।

ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে কুরেশের অন্ধত্ব নাশ হয়েছে, এই শুভ সংবাদ প্রজ্জ্বলিত আগুন শিখার মতো সর্বত্র প্রচারিত হল। দলে দলে ভক্তগণ তাঁকে দেখার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে রামানুজ এবং কুরেশ হলেন দুই মহান ভক্ত। তা না হলে এমন ঐশ্বরিক ঘটনা ঘটল কেমন করে?

সাতাশ

রামানুজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্তন করার জন্য যাদবাদ্রি ত্যাগ করলেন। সুন্দরবাহুর সেবায় বৃষভাচলে কিছুদিন অবস্থান করলেন। এটি হল মাদুরার সন্নিকটবর্তী একটি স্থান।

আগে অণ্ডাল তাঁর রচিত স্তবে ভগবান সুন্দরবাহুর নিকট প্রার্থনা করে বলেছিলেন— হে হরে, তুমি যদি আমার পাণিগ্রহণ রূপ মঙ্গল বিধান করো তাহলে আমি তোমায় শত কলস পরিপূর্ণ ক্ষীর ইত্যাদি উপাদেয় দ্রব্য এবং শত ঘট পরিপূর্ণ নবনীড় সম্পাদন করব।

ভগবান অন্ডালের এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সেই দেবপমা সতী শ্রীহরিকে স্বীয় পতিরূপে পেয়েছিলেন। তাই তিনি শ্রীহরির দেহেই বিলীন হয়ে যান। সেইজন্য তাঁর বাক্যকে কাজে পরিণত করতে পারেননি। শ্রীরামানুজ সুন্দরবাহুকে শতঘট গুড়ান্ন এবং শতঘট নবনীড় সমর্পণ করেন। এইভাবেই তিনি অণ্ডালের মানসিক সংকল্প পূর্ণ করলেন। এই সহোদরোচিত কাজ করার জন্য তিনি অণ্ডালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে খ্যাত।

এবার তিনি অণ্ডালের জন্মভূমি দেখার জন্য শ্রীবিল্লিপুত্তরে এলেন। সেখানে শেষশায়ী নারায়ণ দর্শন করলেন। অণ্ডালের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পুজো এবং স্তব করে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করলেন। কিছুদিন বিল্লিপুত্তরে অবস্থান করে এলেন কুরকানগরে। আরো কয়েকটি পবিত্র স্থান দর্শন করে শেষশায়ী নারায়ণ দর্শন করে শ্রীরঙ্গমের মঠে উপনীত হলেন। সেখানকার শিষ্য এবং ভক্তরা তাঁর শুভ আগমনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান।

মহাত্মা কুরেশ প্রভুর আগমনবার্তা শুনে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলেন। তাঁর সহধর্মিণী এবং পুত্র পরাশর তাঁকে অনুসরণ করলেন। যতিরাজের মঠের দিকে জনস্রোত প্রবাহিত হতে থাকল। তাঁর শুভ আগমন উপলক্ষ্যে হল মহোৎসব। কুরেশ যতিরাজের সঙ্গে এবং যতিরাজ কুরেশের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করলেন। এইভাবে দু—বছর কেটে যাবার পর কুরেশের শরীর জরাগ্রস্ত হল। তাকে শয্যাশায়ী হতে হল। এই অবস্থায় কিছুদিন অবস্থান করে তিনি ধরাধাম পরিত্যাগ করলেন। তাঁর মতো এক মহাত্মা ব্যক্তির মৃত্যুতে সকলে ক্ষণকালের জন্য ব্যথিত হয়েছিলেন। রামানুজের চোখ থেকে অবিরল অশ্রু নির্গত হতে থাকল। অবশেষে আত্ম—সংযম করে তিনি সকলকে সান্ত্বনাবাক্য দিলেন। তিনি বললেন—আজ থেকে হে ভক্তগণ, তোমরা এই কুরেশনন্দন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর সন্তান পরাশরকে নিজেদের রাজা বলে গ্রহণ করো। তিনিই ভবিষ্যতে বিপুল বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে পরিচালনা করবেন। এঁর পিতৃতুল্য ভক্তি এবং স্বাভাবিক জ্ঞান গাম্ভীর্য আছে।

এই কথা বলে রামানুজ পরাশরকে সিংহাসনে বসালেন। তাঁর মাথায় পুষ্পক মুকুট পরিয়ে দিলেন। তাঁর গলায় দিলেন পুষ্পমালা। তাঁকে আশীর্বাদ প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন। আলিঙ্গন করলেন। নিজে বৈষ্ণবী শক্তি দ্বারা তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।

কুরেশের দেহ কাবেরী তীরে দাহ করা হল। সমস্ত রাত ধরে চলল সংকীর্তন। রামানুজের বাক্য মানুষের শোক অনলকে প্রশমিত করেছিল। একমাস ধরে হল মহান উৎসব। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শত শত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দরিদ্র, অজ্ঞা, পুঙ্গা ব্যক্তি এসো রঙ্গনাথস্বামীর প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

এরপর শ্রীরামানুজ আর শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করে কোথাও যাননি। তখন ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি স্থির করলেন যে এখান থেকেই ঈশ্বরের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেবেন। আন্ধ্রপূর্ণ তাঁকে সেবা করতেন। রামানুজই ছিলেন তাঁর স্মৃতিসত্তা এবং ভবিষ্যতের অধীশ্বর।

একদিন শ্রীরঙ্গনাথস্বামী ভক্তদের দর্শনে কৃতার্থ করার জন্য মন্দিরের বাইরে এসেছেন। সশিষ্য রামানুজ মঠ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি ভগবানকে দর্শন করলেন। এইসময় আন্ধ্রপূর্ণ রামানুজের জন্য দুধ গরম করছিলেন। তিনি তা চুল্লি থেকে নামিয়ে রেখে বাইরে গিয়ে রঙ্গনাথস্বামীর পুজো করতে পারতেন। কিন্তু

একমুহূর্তের জন্য তা করতে তাঁর বাসনা হল না। গুরু সেবাকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতেন। তাই গুরুসেবা পরিত্যাগ করে অন্য কোনো কাজ করবেন কেমন করে?

পরে রামানুজ জিজ্ঞাসা করলেন, দেবকে দর্শন করার জন্য আমরা সকলে বাইরে এসেছিলাম, তুমি একা মঠের মধ্যে কেন অবস্থান করছিলে?

মহাত্মা আন্ধ্রপূর্ণ বললেন—হে দীনশরণ, বাইরে দেবতার উপাসনায় গৃহ দেবতার সেবায় ত্রুটি হবে এই ভেবে আমি বাইরে যাইনি। আমি তখন পাককাজে ব্যাপৃত ছিলাম।

এই কথা শুনে রামানুজ পরম বিস্মিত হন।

রামানুজের সব শিষ্যই ছিলেন পরম গুণবান। অনন্তাচার্য নামে তাঁর এক পরম শিষ্য গুরুর আদেশ শিরোধার্য করতে গিয়ে সস্ত্রীক তিরুপতিতে বাস করেন। তিনি ভগবৎ কাজকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশৈলে গিয়ে দেখলেন সেখানকার ভক্তরা জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। নিজের হাতে তিনি একটি সরোবর খনন করার কথা চিন্তা করলেন। তিনি এই খননকাজ শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রী মৃত্তিকা মস্তকে নিয়ে তা দূরে নিক্ষেপ করতেন। বছরের পর বছর ধরে স্বামী—স্ত্রী মিলে কায়িক পরিশ্রম করতে থাকেন। তারপর তাঁর সহধর্মিণী হলেন গর্ভবতী। তখনো মৃদু পদসঞ্চারে মৃত্তিকাভার বহন করে দূরে ফেলে আসতেন। তিনি তখন অত্যন্ত শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হতেন। কয়েকবার বহন করার পর বিশ্রাম করার জন্য একটি গাছের ছায়ায় এসে বসলেন। প্রগাঢ় নিদ্রা এসে তাঁকে অভিভূতা করল। কথিত আছে যে তখন হরি তাঁর দেহ ধারণ করে ওই মৃত্তিকা বহন করতে লাগলেন। তিনি এত তাড়াতাড়ি কাজ সম্পাদন করতে লাগলেন যে খননকার্যে ব্যাপৃত অনন্তাচার্য অবাক হলেন। বললেন—গুরুভার গর্ভে নিয়ে তুমি আগে মৃদুভাবে বহন করছিলে, এখন তো আরো ক্লান্ত হবার কথা, কিন্তু তুমি এক যুবকের মতো কাজ করছ কী করে?

এই কথায় ভগবান কোনো উত্তর দিলেন না। হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অনন্তাচার্য সন্দেহভরে তাকালেন। সরোবর গর্ভ থেকে উঠে এলেন। দেখলেন বৃক্ষমূলে তাঁর সহধর্মিণী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। তখন তিনি পত্নীকে জাগিয়ে তুললেন। তারপর স্ত্রী রূপী হরির উদ্দেশে বললেন, তুমি মহামায়াবী, তোমার মধ্যে এক অলৌকিক মায়া আছে। সেই মায়ার দ্বারা তুমি সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন করতে চাও।

তিনি আরো বললেন—আমি তোমার ছলনা আরো বুঝতে পেরেছি, তুমি ছলপূর্বক স্ত্রীবেশ ধারণ করেছ। তোমার মায়ায় এমন কী শক্তি আছে যা আমাদের অপকার করতে পারে? তুমি স্বয়ং মঙ্গলময়, অথচ ভক্তের অমঙ্গল করছ কেন?

এই কথা বলতে বলতে অনন্তাচার্য কাঁদতে লাগলেন। তাঁর হাত থেকে কুঠার মাটিতে পড়ে গেল। তখনই তাঁর চোখের সামনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। সেই হাস্যময়ী নারী অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হলেন। কৃষ্ণের মনোমোহিনী মূর্তি দর্শন করে অনন্তাচার্য অচেতন হলেন। একটু বাদে জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। তিনি বুঝতে পারলেন যে এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিলেন।

অনন্তাচার্য যে সরোবর খনন করেছিলেন তা শ্রীশৈলে অনন্ত সরোবর নামে বিখ্যাত। একদিন এক সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ রামানুজ সন্নিধানে এলেন। তিনি রামানুজের সেবা করে নিজের হাতকে পবিত্র করতে চেয়েছিলেন।

এইসময় রামানুজ বললেন—হে বিপ্র, আপনি সমুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অপরের সেবা ছাড়া জীবের পক্ষে দ্বিতীয় আর কোনো পথ নেই। তবে যদি আপনি আমার সেবা করতে চান তাহলে আপনাকে কী করতে হবে তা আমি এখনই বলছি।

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ আগ্রহের সঙ্গে বললেন, প্রভু এখনই বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।

রামানুজ বললেন বিপ্রবর্য, আমি আজ থেকে এমন সংকল্প করেছি যে, ব্রাহ্মণের পায়ের জল পান করে দেহ—মনকে পবিত্র করব। তারপর পূজার আসনে বসব। আজ আমি ভাগ্যক্রমে আপনার মতো এক ব্রাহ্মণকে পেয়েছি। আপনি এখানে অবস্থান করুন। আপনার পায়ের জল দিয়ে আমায় কৃতার্থ করুন। এমন করলেই আমার সেবা করা হবে।

সরল ব্রাহ্মণ এই কথায় স্বীকৃত হলেন। তিনি প্রতিদিন রামানুজের জন্য মঠে অপেক্ষা করতেন। মধ্যাহ্নে পরম পবিত্র কাবেরী জলে স্নান সম্পাদন করতেন। শ্রীরামানুজ এই ব্রাহ্মণের পাদতীর্থ সেবা করতেন।

একদিন তিনি কাবেরীতে স্নান করে দীক্ষার্থে গমন করলেন। সেখানে পুজো শেষ করলেন। নারায়ণের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করলেন। তারপর বহু ভক্তের সঙ্গে কথা বলে মঠে ফিরে এলেন। সেখানে গিয়ে যতিরাজ অবাক হয়ে দেখলেন যে ওই ব্রাহ্মণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। এই ঘটনায় রামানুজ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—মহাত্মা, আপনি এখনো আমার জন্য অপেক্ষা করছেন? আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো? ব্রাহ্মণ বললেন— আপনার সেবা না করে আমি কী করে প্রসাদ গ্রহণ করব?

যতিরাজ বললেন—ধন্য আপনি, আপনি দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠায় উন্নীত হয়েছেন। আপনার মতো মহাপুরুষ জগতে বিরল। এই বলে তিনি বারবার তাঁর পায়ের জল সেবন করলেন। অন্য শিষ্যদেরও করালেন। রামানুজের প্রভাবে ওই ব্রাহ্মণ অনুগৃহীত হয়েছিলেন।

শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাদবাদ্রি থেকে চলে আসার সময় সেখানকার ভক্তরা রামানুজের বিচ্ছেদ ভয়ে কাতর হন। রামানুজ তাঁর প্রস্তরময় প্রতিরূপ নির্মাণ করে তার মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করেন। সেইটি ভক্তদের হাতে সমর্পণ করে বললেন—প্রিয় ভক্তগণ, এই প্রতিরূপকে তোমরা আমার স্বরূপ বলেই জানবে। যখন আমাকে দেখবার ইচ্ছা বশবর্তী হবে, তখন এই প্রতিরূপ দর্শন করবে। এই কথা বলে তিনি ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

তাঁর জন্মভূমি মহাভূতপুরী নিবাসী তাঁর ভক্তগণও এই ঘটনার পরে তাঁর একটি প্রস্তরময় মূর্তি নির্মাণ করেন। বেদের বিধান অনুসারে সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই মূর্তিটি এক বিশাল মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করা হয়। কথিত আছে শ্রীরামানুজ তখন শ্রীরঙ্গমের মঠে উপবিষ্ট হয়ে শিষ্যগণের সঙ্গে শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ব্যাখ্যা করতে করতে হঠাৎ তাঁর সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল। দুটি চোখ থেকে দু—বিন্দু রক্ত ঝরে পড়ল। তারপর সংজ্ঞা হারালেন। শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন আজ আমাকে মহাভূতপুরী নিবাসী ভক্তরা প্রেমপাশে বদ্ধ করে ফেলেছেন। আমার প্রস্তরময় প্রতিরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শ্রীরঙ্গমবাসী ভক্তরা ছিলেন পরম সৌভাগ্যশালী। কারণ যতিরাজ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি সেখানেই অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তখন জ্ঞানমার্গের সূর্যসোপানে অবতরণ করেন। কিছুদিন বাদে সমস্ত দাক্ষিণাত্য থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হন। রামানুজ এইসময় একাধিক শাস্ত্র আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবন এবার ধীরে ধীরে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে। কোনো এক ভক্তের কাছে তিনি তাঁর মনোগত বাসনার কথা বলেছিলেন। ভক্তরা তখন শোকসমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। রামানুজ বললেন—তোমরা অজ্ঞানের মতো আচরণ করছ কেন? আমি তোমাদের ছেড়ে এক মুহূর্তও অন্য কোথাও যেতে পারব না। কিন্তু জীবন থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। তাই আমি চলে গেলে তোমরা দুঃখ পেও না। মনে রেখো আমি সদাসর্বদা তোমাদের মধ্যেই থাকব।

যতিরাজ রামানুজ শিষ্যগণকে বললেন আশা করি আমার শাস্ত্র আলোচনায় তোমাদের অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে। তোমরা সম্যক উপলব্ধি করেছ যে ভগবৎ ভক্ত এবং ভগবান এক। প্রকৃত ভক্ত কখনো ভগবান থেকে পৃথক হয়ে থাকতে পারেন না। তাই এই নশ্বর দেহের অদর্শনে ব্যথিত হয়ো না।

এই কথা শুনে দাশরথি, গোবিন্দ, আন্ধ্রপূর্ণ প্রমুখ শিষ্যরা বললেন, যে শ্রীচরণের স্পর্শে আমাদের অজ্ঞান অবিদ্যা দূর হয়েছে। সেই চরণ আর স্পর্শ করতে পারব না? তা কেমন করে সম্ভব? যাতে আপনার মূর্তি দর্শনে আমরা বঞ্চিত না হই এমন বিধান করুন।

এই কথা শুনে রামানুজ বলেছিলেন—কয়েকজন সুনিপুণ শিল্পীকে এখানে নিয়ে এসো, তারা আমার প্রস্তরময় মূর্তি প্রস্তুত করবে। এইরূপ আদিষ্ট হয়ে শিষ্যরা এমন বিধান করলেন। তিনদিনের মধ্যে তাঁর প্রতিরূপ গঠন সমাপ্ত হল। তিনি স্বীয় প্রতিকৃতিকে শুদ্ধ কাবেরীর জলে সুস্নাত করালেন। তারপর বললেন

—প্রিয় ভক্তরা, ইনি আমার দ্বিতীয় স্বরূপ। এতে এবং আমাতে কোনো ভেদ নেই। আমি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ আশ্রয় করলাম।

এই কথা বলে রামানুজ গোবিন্দের কোলে মাথা এবং আন্ধ্রপূর্ণের কোলে তাঁর পা দুটি রেখে মহাপ্রয়াত হলেন। ১০৫৯ শকাব্দ বা ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে মাঘী শুক্লা দশমীতে শনিবার মধ্যাহ্নে তিনি শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে তখন এক ধর্মবাণী শোনা গিয়েছিল—বিগ্রহবান ধর্ম অদ্য জীবচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীরামানুজ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যখনই আমরা ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের কথা বলি তখন বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের কথা মনে পড়ে যায় আমাদের। ভারতীয় দর্শন চিন্তার ইতিহাসে তিনি এক নতুন দর্শনমতের প্রবক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা রূপে আজও আমাদের মধ্যে সশ্রদ্ধ আসনে বিরাজ করছেন।

রামানুজের দর্শনচিন্তা

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। অধিবিদ্যায় কায়ব্রহ্মবাদ এবং ধার্মিকের ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করাই এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। রামানুজের মতে দার্শনিকের চরম তত্ত্বই ছিল ভক্তের ভগবান। ভাগবতের ঈশ্বরবাদ এবং উপনিষদের সপ্রপঞ্চ মত বা ব্রহ্ম—পরিণামবাদের সমন্বয়ের ফলেই এই মতের প্রতিষ্ঠা। এই দর্শনের ভক্তিবাদ প্রধানত ভাগবতভিত্তিক। অবশ্য এই জাতীয় চিন্তা রামানুজ—দর্শনেই প্রথম প্রকাশিত হয়নি। □□□দ্□□□□, মহাভারতের নারায়ণীয় অধ্যায় এবং বিষ্ণুপুরাণে এই চিন্তার আভাস পাওয়া যায়।

এই মতবাদের উৎস দু—রকম। একটি বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা, পুরাণ প্রভৃতি; অন্যদিকে তামিল ভাষায় লিখিত দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্য। এই কারণেই রামানুজ দর্শনের নাম উভয়—বেদান্ত। বিশিষ্টাদ্বৈত মতের রামানুজ পূর্ব—প্রবক্তাদের মধ্যে নাথমুনির নাম সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমস্ত গ্রন্থই আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নাথমুনির পৌত্র আলবান্দার বা যামুনাচার্য (১০৫০ খ্রিস্টাব্দে) বিশিষ্টাদ্বৈত মত খুবই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রচার করেন। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে আগম প্রামাণ্য, মহাপুরুষ নির্ণয়, গীতার্থ—সংগ্রহ সিদ্ধিত্রয়—ই সর্বাধিক প্রচলিত। শ্রীস্তুতি এবং বিষ্ণুস্তুতি নামে তাঁর দুটি স্তোত্রগ্রন্থও আছে। সব জায়গাতেই তিনি শিবের থেকে বিষ্ণুর প্রাধান্য ও মাহাত্ম্যই কীর্তন করেছেন। কথিত আছে রামানুজ বা যতিরাজ যামুনাচার্যের শিষ্যের শিষ্য ছিল। তিনি ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করেছিলেন। রামানুজ বলেছেন যে —ভগবান বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন। (ব্রহ্মনন্দী টঙ্ক, দ্রমিড়, ভারচি, গুহদেব প্রমুখ) পূর্বাচার্যগণ সেই বিস্তৃত ব্যাখ্যারই সংক্ষেপ করেছেন। তাঁদের মত অনুসরণ করেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের আকরগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত ভগবদ্গীতায় একটি ভাষ্য আছে। বেদার্থ সংগ্রহও তিনিই রচনা করেছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করা হয় এবং প্রচারিত হয়। বেদান্তসার, বেদান্তদীপ, নিত্যগ্রন্থ প্রভৃতি আরো কয়েকটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। রামানুজের পরবর্তী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মধ্যে সুদর্শন মুর (১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি রামানুজের শ্রীভাষ্য—এর বেদার্থ সংগ্রহ টীকা রচনা করেছিলেন। এরপরই বেঙ্কটনাথ বা বেদান্ত দেশিকের (১৩৫০ খ্রি.) আবির্ভাব ঘটে। তিনিই রামানুজের দর্শনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একদিকে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের থেকে অনেক বেশি যোগ্যতার সঙ্গে অদ্বৈত মত খণ্ডন করেছিলেন, অন্যদিকে বিশিষ্টাদ্বৈত মত সুসমঞ্জস্য ও সুসংগত করে প্রচার করেছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠার দিক থেকে রামানুজের পরেই তিনি স্থান লাভ করেন। তিনি অগণিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে শ্রীভাষ্যের অসম্পূর্ণ টীকা তত্ত্বটীকা, রামানুজের গীতা ভাষ্যের টীকা, তাৎপর্যচণ্ডিকা, ন্যায় সিদ্ধাঞ্জন, তত্ত্বমুক্তাকল্প এবং এদের উপর নিজেরই টীকা, সর্বার্থ—সিদ্ধি এবং শতদূষণী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শ্রীনিবাসাচার্য (১৭০০ খ্রিস্টাব্দ) লিখিত যতীন্দ্র—মত —দীপিকা বৈশিষ্টাদ্বৈত দর্শনের একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়গ্রন্থ।

১। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, প্রমা, প্রমাণ ও প্রমেয়

অন্যান্য দার্শনিকগণের মতো রামানুজ মনে করেন, জ্ঞাত হতে গেলেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় আবশ্যক। তিনি আরও বলেন, সমস্ত জ্ঞানই বিশিষ্ট উত্তর—জ্ঞান। নির্বিশেষ বস্তুর কোনো জ্ঞানই হয় না। রামানুজের এই কথা অনেক দার্শনিকই মেনে নেন না। রামানুজ নির্বিকল্পক এবং স্ববিকল্পক প্রত্যক্ষের পার্থক্য স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বলেন, নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক উভয় প্রত্যক্ষেরই বিষয় বিশিষ্ট বস্তু। তবে কোনো বিশিষ্ট বস্তু যখন আমরা প্রথম গ্রহণ করি (প্রথম পিণ্ডগ্রহণবৎ) এবং এই বস্তুর কোনো পূর্ববর্তী সংস্কার থাকে না, তখন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। যখন একটি শিশু প্রথম গোরু দ্যাখে তখন সে তা কোনো না কোনো বিশেষণে বিশেষিত অবস্থাতেই দ্যাখে। এই দেখা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। পরে যখন শিশুটি আবার গোরু দ্যাখে তখন এই দেখা আগের দেখার সংস্কার সংযুক্ত হয়। এইভাবেই পুরাতনের আলোকে নতুনকে জানাই

রামানুজের মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। 'এইটি একটি গোরু' এই বাক্য প্রকাশ করে, স্ববিকল্পক প্রত্যক্ষ। ন্যায় বৈশেষিক মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বাক্যাকারে প্রকাশ করা যায় না, রামানুজ মতে যায়। শঙ্কর মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোনো বিশিষ্ট বস্তু প্রকাশিত হয় না। যে জ্ঞান বিশেষ্য, বিশেষণ সম্বন্ধ বিষয়ক নয়, তাই নির্বিকল্পক জ্ঞান। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, অনেকের মতে শঙ্কর এবং রামানুজের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ধারণার এই পার্থক্য থেকেই তাঁদের ব্রহ্ম বা আত্যান্তিক সত্তা সম্বন্ধে ধারণার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। রামানুজের মতে নির্বিশেষ বস্তুর জ্ঞানই হয় না বলে চরম সত্তা বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ হতে পারে না। তিনি বিশিষ্ট, শঙ্কর মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবিশিষ্ট সত্তা প্রকাশ করে থাকে। সকল বিকাশই পরমার্থতঃ মিথ্যা, সুতরাং চরম সত্তা ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও নির্গুণ।

অবশ্য কেউ কেউ এমনও বলতে পারেন যে, শঙ্কর নির্বিশেষ ও নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করতেন বলেই তিনি নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রামানুজের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের জ্ঞানটি তাঁর ব্রহ্ম বিষয়ক ধারণা অনুসারে। এদের দুজনেরই জ্ঞান সম্পর্কিত সব ধারণাই তত্ত্ব—ধারণা ভিত্তিক।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতেই পারে—রামানুজ যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষের এইরূপ ব্যাখ্যা দেন, তাহলে তাঁর মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যভিজ্ঞার পার্থক্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে একই বস্তু (যেমন গোরু) অতীতে এবং বর্তমানে দু—বার প্রত্যক্ষ হয় এবং তখন আমরা বলি 'এই সেই গোরু'। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে, একটি জাতীয় দুটি ভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ হয় এবং আমরা বলি, এইটিও একটি গোরু। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বেলায় প্রত্যক্ষের বিষয়ের দেশ—কালের পার্থক্যের দিকে বিশেষ লক্ষ করা হয় না। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের বিষয়ের দেশ—কালের পার্থক্য বিবেচনা করা হয়। কারণ, প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে একই বস্তু দু—বার ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ করা হয়।

রামানুজ মতে জ্ঞানের ধরন জানতে হলে রামানুজ সত্তার যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা জানা প্রয়োজন। চেতন ও জড় ছাড়াও তিনি আর—এক প্রকার সত্তার কথা বলেছেন। যা অজড় কিন্তু চেতন নয়। জ্ঞান হল এই তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত। জ্ঞান জড় নয়, কারণ অন্যের সাহায্য ছাড়া জ্ঞান নিজেকে এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করতে পারে, কিন্তু জড় তা পারে না। তবে জ্ঞান যা প্রকাশ করে তা নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু জানতে পারে না। চৈতন্য জানতে পারে এবং নিজেকে ছাড়া আর অন্য কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান চেতনাও নয়। একটি দীপশিখার সঙ্গে জ্ঞানের তুলনা করা যেতে পারে। দীপশিখা যেমন ঘর প্রভৃতি বস্তু এবং নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে, কিন্তু কিছুই জানতে পারে না, এবং দীপশিখা যা প্রকাশ করে তা জানে মানুষেরা, তেমনি জ্ঞান প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞান জানে না, জানেন জীব বা ঈশ্বর। রামানুজ মতে জ্ঞান জীব বা ঈশ্বরের গুণ বা ধর্মরূপে বর্তমান, একে ধর্মভূতজ্ঞান বলে। রামানুজ বলেন ধর্মভূতজ্ঞান ছাড়া আর—এক প্রকার জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানকে ধর্মীজ্ঞান বলা হয়। এই অর্থে জীব এবং ঈশ্বরই জ্ঞান। ধর্মীজ্ঞান এবং ধর্মভূতজ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধ একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। ধর্মীজ্ঞান যেন দীপশিখা এবং ধর্মভূতজ্ঞান যেন দীপশিখাগত কিরণমালা। কিরণমালা যেমন দীপশিখাতে থাকে, ধর্মভূতজ্ঞানও তেমনি করেই ধর্মীজ্ঞানেই থাকে। দীপশিখা থেকে যেমন কিরণমালা বেরিয়ে এসে বস্তু প্রকাশ করে, ধর্মভূতজ্ঞানও তেমনি ধর্মীজ্ঞান থেকেই বহির্গত হয়ে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে। ধর্মভূতজ্ঞান সব সময়ই থাকে। সুষুপ্তি অবস্থাতেও এই জ্ঞান বর্তমান। তবে তখন বিষয় থাকে না বলে নিজেকে প্রকাশ করে। ফলে যখন আমরা বিষয় জানি, তখনই জ্ঞান জানি এবং যখন বিষয় জানি না তখন জ্ঞানও জানি না। সুষুপ্তি অবস্থায় জীব তার অপ্রকাশিত ধর্মভূতজ্ঞান নিয়ে আত্মসচেতন হয়ে বর্তমান থাকে। স্বপ্নকালে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় থাকে। সুতরাং তখন ধর্মভূতজ্ঞান নিজেকেও প্রকাশ করে। আবার বিষয়ও প্রকাশ করে। ফলে, স্বপ্নে যেমন আমরা একপ্রকার বিষয় সম্বন্ধে জানি, তেমনি জ্ঞানও জানি। কিন্তু জাগ্রতকালের থেকে স্বপ্নকালে ধর্মভূতজ্ঞানের প্রকাশ ক্ষমতা বেশি বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে স্বপ্নকালের বিষয় জাগ্রতকালের বিষয়ের মতো স্পষ্ট হয় না। মোক্ষকালে জ্ঞানের সমস্ত বাধা সরে যায়। সেজন্য মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ হন।

জৈনদের কেবল জ্ঞানের সঙ্গে এই মতের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। জ্ঞান কোনো কোনো সময়ে শুধু মনের সাহায্যে আবার কখনো তা মনের সাহায্যে কোনো ইন্দ্রিয় মাধ্যমে কার্যকর হয়। রামানুজ বলেন, জ্ঞান—প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় জীব থেকে, তারপর মনের মধ্যে পোঁছোয় এবং সর্বশেষে কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে জ্ঞান যখন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এটি বিষয়ের আকার ধারণ করে এবং জীবের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে। অদ্বৈত মতের অন্তঃকরণের সঙ্গে রামানুজ দর্শনের ধর্মভূতজ্ঞানের কিছু মিল আছে। অদ্বৈত মতের অন্তঃকরণ যেমন ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত হয়ে বিষয়াকারে আকারিও হয়, রামানুজ মতে ধর্মভূতজ্ঞানও তেমনি বিষয়াকারে আকারিত হয়। কিন্তু অদ্বৈত মতে অন্তঃকরণ জড় এবং তার সাথী ভাস্বর হলেই জ্ঞানপদবাচ্য হয়। কিছু কিছু মানুষের মতে ধর্মভূতজ্ঞান নিজেই জ্ঞান।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, রামানুজ মতে জ্ঞানের পূর্বেই জ্ঞানের বিষয় থাকে এবং বিষয় না থাকলে জ্ঞান হয় না। সুতরাং রামানুজ মতে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতা বা জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা সম্পন্ন। এই দিক থেকে রামানুজ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। তিনি বলেন, যা—ই আমরা জানি তা—ই যথার্থ; বিষয় না থাকলে জ্ঞানই হতে পারে না। রামানুজের এই মত সৎখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। রামানুজ স্বত প্রামাণ্যবাদী। অর্থাৎ তিনি জ্ঞান স্বতই প্রমাণ বা যথার্থ বলে মনে করেন। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে —জ্ঞান যদি স্বতই প্রমাণ হয়, বিষয় ছাড়া যদি জ্ঞান হতেই না পারে, তবে আমাদের ভুল জ্ঞান হয় কেন? কখনো কখনো দড়িকে আমরা ভুল করে সাপ বলে জানি কেন?

রামানুজ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তেজ, অপ, ক্ষিতি ভূতের সমাহারে যেমন দড়ির সৃষ্টি, তেমনি সাপেরও সৃষ্টি। সুতরাং সাপ ও দড়ির মধ্যে উপাদানগত মিল বিদ্যমান। যখন আমরা একটি দড়িকে সাপ বলে জানি তখন দড়ি ও সাপ উভয়েতেই বর্তমান এই সাধারণ উপাদানই জানি, সাপ অংশের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং এর যে অন্যদিকও আছে তা অস্বীকৃত হয়। সুতরাং ভ্রমের ক্ষেত্রে যা আছে (সৎ) তাই জানি, যা নাই (অসৎ) তা জানি না। অর্থাৎ ভ্রমও সৎখ্যাতি।

একজন পান্ডুরোগী যখন সাদা শঙ্খকে সজীব শঙ্খ বলে জানে তখন রামানুজ পাণ্ডুরোগীর নয়নরশ্মি নয়ন থেকে যখন শঙ্খে পড়ে, তখন তার নয়ন গোলকের পীততত্ত্ব শঙ্খে যায় এবং শঙ্খ বস্তুতই পীত হয়। সুতরাং পাণ্ডুরোগী যে সবুজ শঙ্খ দেখে সে শঙ্খ সৎ, অসৎ নয়। এখানে প্রশ্ন উঠবে—সবুজ শঙ্খে যদি সত্যিই সবুজত্ব জন্মে তবে সকলেই সাদা শঙ্খকে সবুজ শঙ্খ বলে জানে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রামানুজ বলেন, সকলেই শঙ্খে সবুজত্ব সঞ্চারের প্রক্রিয়া লক্ষ করে না, সেই কারণেই জানে না। বক্তব্যটি তিনি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়েছেন। ছোটো পাখি যে পথে আকাশে চলে সে পথ ছোটো পাখি জানে; কিন্তু সকলে তা জানে না। তেমনি পাণ্ডুরোগীই সাদা শঙ্খে সবুজত্ব জানে, অন্যে জানে না। স্বপ্নের মাধ্যমে দেখা বস্তুর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামানুজ বলেন, পরম পুরুষ জাগ্রত অভিজ্ঞতার বিষয়ের মতোই স্বপ্নে দেখা বিষয় সৃষ্টি করেন। জীব যাতে কর্ম অনুসারে সুখ—দুঃখ ভোগ করতে পারে তার জন্যই পরম পুরুষের এই সৃষ্টি। তিনি আরও বলেন, স্বপ্নে দেখা বস্তু যে স্বপ্নের সময়ে ঠিকঠাকভাবেই থাকে, বেদেও একথা ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং বেদ—প্রামাণ্যের ভিত্তিতেও স্বপ্নে দেখা বস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা প্রমাণ করা যায়।

রামানুজের এই সব ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। তবে ভ্রমের বস্তু স্বতন্ত্র্যবাদী ব্যাখ্যা দেবার জন্য রামানুজ যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, একথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—সত্য জ্ঞানের বিষয়ের মতো ভ্রমের বিষয়ও যদি যথার্থই বিষয় হয়, তবে আমরা সত্য জ্ঞান বা প্রমা এবং ভ্রমে পার্থক্য করি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রামানুজ বলেন, প্রমা শুধু যথার্থ জ্ঞান নয়, ব্যবহারর্নুগুণও বটে। ভ্রমের বিষয়ের দ্বারা লোকব্যবহার হয় না বলেই ভ্রম প্রমা নয়। প্রমার বিষয়ের দ্বারা লোকব্যবহার হয়। ভ্রমে শুক্তিতে দৃষ্ট রজতের দ্বারা সমস্ত লোকের কোনো ব্যবহার হতে পারে না, কিন্তু প্রমার ক্ষেত্রে জ্ঞাত শুক্তি ও রজতের দ্বারা লোকব্যবহার সিদ্ধ। সুতরাং লোকব্যবহারের অভাবের ভিত্তিতে

জ্ঞানের অপ্রমাণ্য বা ভ্রমত্ব নির্ণয় করা যায়। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রামানুজ মতে জ্ঞান স্বতই প্রামাণ্য। কিন্তু অপ্রামাণ্য, পরত বা অন্য—নির্ভর।

রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে রামানুজের বক্তব্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। অনুমান সম্বন্ধে রামানুজের বক্তব্যে কোনো নতুনত্ব নেই। শব্দ সম্পর্কে রামানুজ মূলত মীমাংসকদের বক্তব্য মেনে নেন। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় না এমন বিষয়ই শব্দপ্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। অন্যান্য বেদান্তীদের মতো রামানুজও বেদের অর্থবাদমূলক বাক্য এবং বিধিবাক্য উভয়েরই তাৎপর্য স্বীকার করেন।

শঙ্করের সঙ্গে এই বিষয়ে রামানুজের মতের মিল লক্ষণীয়।

কিন্তু শব্দপ্রমাণ সম্পর্কে এবং অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে মতভেদ আছে। এখানে আমরা মতপার্থক্যের প্রধান দুটি মাত্র বিষয় আলোচনা করব। আমরা জানি বেদের ভাগ দুইটি। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। প্রত্যেক বেদান্তীই দুই ভাগের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। শঙ্করাচার্য বলছেন, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুই শ্রেণির অধিকারী পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। যে পুরুষ এখনো অবিদ্যায় আচ্ছন্ন তিনিই কর্মকাণ্ডের অধিকারী। যে পুরুষ অবিদ্যা অতিক্রম করার জন্য সাধনা করেন জ্ঞানকাণ্ডের অধিকার তাঁরই। রামানুজ এই মত গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড একই অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং কর্মকাণ্ড ঈশ্বরের উপাসনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। রামানুজ আরও বলেন, কর্মকাণ্ডে আদিষ্ট বিভিন্ন কর্ম ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্যই করা উচিত, কর্মফলের জন্য নয়। রামানুজের এই মত শঙ্কর এবং মীমাংসা উভয় মত বিরোধী। শঙ্কর জ্ঞানকাণ্ড উন্নত অধিকারী এবং কর্মকাণ্ড অনুন্নত অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করেন। মীমাংসা কোনো জ্ঞানকাণ্ডকে বেদের প্রধান অংশ হিসাবে মনে করেন না। তাঁদের মতে কর্মকাণ্ডই বেদের প্রধান অংশ। রামানুজ বেদ ছাড়াও পঞ্চরাত্রাগমকে শব্দ—প্রমাণের অন্তর্গত করেন, শঙ্কর তা করেন না। শব্দ—প্রমাণ প্রসঙ্গে শঙ্করের সঙ্গে রামানুজের এই দ্বিতীয় পার্থক্য। এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পঞ্চরাত্রাগমে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে। রামানুজও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন এবং তিনি বৈষ্ণব।

২। ব্রহ্ম সম্বন্ধে রামানুজের ধারণা

রামানুজ মনে করেন, ব্রহ্মই চরম সত্য ও সত্তা; চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের দুটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, কারণ ব্রহ্মের অতিরিক্ত বা ব্রহ্ম—ব্যতীত কোনো সত্তা নেই। ব্রহ্মের অচিৎ অংশই বিশ্বের বিভিন্ন জড়বস্তুরূপে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন জীবাত্মা ব্রহ্মেরই চিৎ অংশ। সুতরাং সবকিছুই ব্রহ্মেই বিধৃত। এক ব্রহ্ম বাহুকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে রামানুজের এই মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। এই মত অনুসারে ব্রহ্মের অদ্বৈত চিৎ ও অচিৎ অংশ বিশিষ্ট, এটি নির্বিশেষ অদ্বৈত নয়। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, রামানুজের মতে নির্বিশেষ বস্তু বলে কিছু জানাই যায় না। তিনি বলেন, তথাকথিত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যে বিশেষ বিষয় পাওয়া যায় তা বিশিষ্ট বস্তু। সবিকল্পক এবং নির্বিকল্পক উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের বিষয়ই বিশিষ্ট। এদের মধ্যে তফাৎ এই যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বিশিষ্ট বস্তু প্রথম জ্ঞাত হয়, এই ক্ষেত্রে এই বস্তুর কোনো পূর্ব সংস্কার কার্যকর হয় না, কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষে যখন বিশিষ্ট বস্তু জ্ঞাত হয়, তখন এই বস্তুর পূর্ব সংস্কার কার্যকর হয়ে থাকে। শঙ্কর প্রভৃতি কোনো কোনো দার্শনিক নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে নির্বিশেষ বস্তু জানা যায় বলে যে ঘোষণা করেছেন তা অযৌক্তিক ও অযথার্থ। সুতরাং নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে কিছু থাকতে পারে না। সগুণ বিশিষ্ট ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ও সম্ভব। রামানুজ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন তাঁর মতে অন্যান্য প্রমাণ এদের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি। পুনর্বার আলোচনার প্রয়োজন নেই।

রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম কোনো অভেদতত্ত্ব নয়; ব্রহ্মের সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ না থাকলেও স্বগত ভেদ আছে। একই জাতির অর্ন্তগত দুটি ব্যক্তির মধ্যে যে ভেদ তাকে বলে সজাতীয় ভেদ, যেমন একটি

গোরুর সঙ্গে অন্য আর—একটি গোরুর তফাত। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলে তার সজাতীয় ভেদ থাকতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে ভেদ তার নাম বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু না থাকায় ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ সম্ভব নয়। একটি জিনিষ বা ব্যক্তির বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গের যে ভেদ তাকে বলে স্বগত ভেদ। আমাদের হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গের ভেদ এই জাতীয়। ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ অংশের মধ্যে ভেদ দেখা যায়। চিৎ—এর মধ্যে বিভিন্ন জীবের পার্থক্য বর্তমান। সুতরাং ব্রহ্ম স্বগতভেদযুক্ত। ব্রহ্মের সঙ্গে চিৎ ও অচিৎ অংশের সম্বন্ধকে রামানুজ অপৃথক সিদ্ধি নামে অভিহিত করেছেন। রামানুজের অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধ অনেকটা নৈয়ায়িকদের সমবায় সম্বন্ধের ন্যায়। দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধকে নৈয়ায়িকরা সমবায় সম্বন্ধ বলেছেন, রামানুজ তার নাম দিয়েছেন অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধ। তার এই দুই মতের পার্থক্য এই যে, সমবায় সম্বন্ধে দুটি সম্বন্ধীয় একটি আর—একটি ছাড়া থাকতে পারে কিন্তু অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধে কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণগুণের আকর পুরুষোত্তম বাসুদেব। উপনিষদে ব্রহ্মকে যখন নির্গুণ বলা হয়, তখন তাঁর কোনো হেয় গুণ বা দোষ নেই, একথাই বোঝানো হয়ে থাকে। আসলে ব্রহ্মে নিখিল দোষ নিরস্ত বা নিষিদ্ধ হয়েছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক। প্রলয়কালে জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও অব্যক্তরূপে অচিৎ (জড়) ও চিৎ (আত্মা) ঈশ্বরের অংশরূপে অবস্থান করে। ঈশ্বরের চিৎ ও অচিৎ অংশ নিত্য। সুতরাং এদের কখনোই ধ্বংস হতে পারে না। চিৎ ও অচিৎ অংশ অব্যক্তরূপে যখন ঈশ্বরে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মকে কারণ ব্রহ্ম বলা হয়। জগৎ সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের অচিৎ অংশ জড়জগতে পরিণত হয় এবং চিৎ অংশ জীবাত্মারূপে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মের এই ব্যাপৃত রূপকে কার্যব্রহ্ম বলে। উপনিষদের যেসমস্ত বাক্য বস্তুর বৈচিত্র অস্বীকার করে এবং ব্রহ্মকে মনের অতীত বলে বর্ণনা করে, তারা ব্রহ্মের অব্যক্তরূপের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে।

এইক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে—চিৎ এবং অচিৎ যদি ব্রহ্মের অংশ হয় এবং অচিৎ অংশ যদি জগতে রূপান্তরিত হয়, তবে ব্রহ্মও কি পরিণামী হয়ে পড়েন না? জগতের সমস্ত অসম্পূর্ণতা কি ব্রহ্মেরই অংশ হয়ে উঠবে না? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে রামানুজ অংশ অংশীয় উপমা ব্যবহার না করে অন্য উপমা ব্যবহার করেন। কখনো বলেন, ব্রহ্ম আত্মা এবং চিৎ ও অচিৎ তাঁর শরীর, আবার কখনো বলেন, ব্রহ্ম রাজা এবং চিৎ ও অচিৎ তাঁর প্রজা। আত্মা যেমন শরীর বা দেহ নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি ব্রহ্ম চিৎ বা অচিৎ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রহ্ম বিশ্বের অন্তর্যামী নিয়ামক পুরুষ। ব্রহ্ম বিশ্বের অন্তর্যামী নিয়ামক পুরুষ। আত্মা যেমন দেহের পরিবর্তন এবং অপূর্ণতা বা পঙ্গুতার জন্য পরিবর্তিত এবং অপূর্ণ বা পঙ্গু বলে অভিহিত হয় না, ব্রহ্মও তেমনি অচিৎ—এর জগতে পরিণতির জন্য এবং জগতের অপূর্ণতার জন্য পরিণামী বা অপূর্ণ আখ্যাত হতে পারে না। প্রজার সুখ, দুঃখ, ব্যর্থতা, হতাশ, অপূর্ণতা, পরিণতি প্রভৃতি যেমন রাজার সুখ, দুঃখ, ব্যর্থতা, হতাশা, অপূর্ণতা, পরিণতি প্রভৃতি বোঝায় না। তেমনই অচিৎ—এর জগতে পরিণতি ঈশ্বরকে পরিণামী করে তোলে না।

ওপরে চিৎ ও অচিৎ—এর সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রকাশের জন্য রামানুজ প্রচারিত বিভিন্ন উপমার আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, চিৎ ও অচিৎ—এর সঙ্গে একের সম্বন্ধ কি অংশ—অংশীর সম্বন্ধ, না শরীর ও আত্মার সম্বন্ধ, না প্রজা ও রাজার সম্বন্ধ, না সবই একই সঙ্গে—এ বিষয়ে রামানুজ নিশ্চিত করে কিছু বলেননি। যখন যে উপমা ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে তিনি তখনই সেই উপমা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই কথা ভুললে চলবে না, অংশ—অংশীর সম্বন্ধ, শরীর—আত্মার সম্বন্ধ এবং প্রজা—রাজার সম্বন্ধ ঋণই এক জাতীয় সম্বন্ধ নয়। সুতরাং চিৎ ও অচিৎ—এর সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধটা ঠিক কী জাতীয়, তা সুস্পষ্ট করে রামানুজের বলা উচিত ছিল।

রামানুজের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের উপাস্য। তিনি ভক্তের ভগবান, করুণাঘন ও কৃপাসিন্ধু। তিনি কৃপা না করলে আমাদের পক্ষে দুস্তর দুঃখ—সাগর পার হয়ে মুক্তিলাভ অসম্ভব। সেইজন্যই তো আমরা সবাই তার কৃপার ভিখারি, উপাসনায় ঈশ্বরকে তুষ্ট করে তাঁর কৃপার অধিকার অর্জন করতে হয়। তিনি অপাত্রে কৃপাবর্ষণ করেন না।

৩। রামানুজ দর্শনে জগৎ

রামানুজ কার্য ও কারণের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সৎকার্যবাদের সমর্থক। তবে তিনি শঙ্করের মতো সৎকর্মবাদ বলতে বিবর্তবাদ বোঝেন না। তাঁর মতে সৎকার্যবাদের অর্থ পরিণামবাদ; কার্যকারণ পরিণতি বিশেষ। সুতরাং তিনি জগৎ—সৃষ্টি বিষয়ক ঔপনিষদিক বাক্যগুলির পরিণামবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম ঊর্ননাভের মতো নিজের অভ্যন্তর থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আমরা আগেই বলেছি, রামানুজের মতে ব্রহ্মের দুইটি অংশ—চিৎ ও অচিৎ। অচিৎ অংশের থেকে জড় জগতের সৃষ্টি। সেইজন্য অচিৎকে রামানুজ শ্বেতাশ্বতং উপনিষদ, পুরাণ ও স্মৃতি অনুসরণ করে প্রকৃতি নামে অভিহিত করেছেন। সাংখ্যকারদের মতো রামানুজও এই প্রকৃতিকে অজ এবং নিত্য বলে মনে করেন। কিন্তু সাংখ্যকর্তারা প্রকৃতিকে স্বনির্ভর স্বতন্ত্র সত্তা বলে উল্লেখ করলেও রামানুজ তা করেন না। তিনি বলেন, আত্মা যেমন ভিতর থেকেই দেহ নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি ব্রহ্ম তাঁর অংশ অচিৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অচিৎ স্বনির্ভর নয়, ঈশ্বরের উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। প্রলয়কালে অচিৎ বা প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং অবিভক্তরূপে বিরাজ করে। ঈশ্বর এই প্রকৃতি থেকে জীবের প্রলয় পূর্ববর্তী জগতে কৃত কর্মানুসারে বিচিত্র বস্তু বিশিষ্ট এই জগৎ সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অবিভক্ত প্রকৃতি তেজ, তপ এবং ক্ষিতি এই ত্রিভূতাকারে ব্যক্ত হয়। এই ত্রিভূতসত্তা রজঃ ও তমঃ নামে তিনটি গুণ প্রকাশ করে। ক্রমশ এই ত্রিভূত একত্রিত হয়ে আমরা জগতে যে সমস্ত স্থুল বস্তু দেখতে পাই তা সৃষ্টি করে। জগতের প্রত্যেক বস্তুই এই ত্রিভূতের সংমিশ্রণে তৈরি। এই সংমিশ্রণের নাম ত্রিবৃৎকরণ।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রামানুজের মতে ব্রহ্ম সত্যিই জগতের স্রষ্টা, জগৎ সৃষ্টি সত্য এবং সৃষ্ট জগতও সত্য। উপনিষদের যে সকল বাক্য বস্তুবৈচিত্র অস্বীকার করে তাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রামানুজ বলেন, বস্তুবৈচিত্র অস্বীকার করা এইসব বাক্যের তাৎপর্য নয়; বস্তুর পৃথকস্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মের ওপর নির্ভর না করেই বস্তুর অবস্থান অস্বীকার করাই এই সমস্ত বাক্যের উদ্দেশ। তিনি একটি উপমা ব্যবহার করে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, সমস্ত স্বর্ণালঙ্কারই যেমন তাদের অস্তিত্বের জন্য স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীল, তেমনই বিশ্বের সমস্ত বস্তুই অস্তিত্বের জন্য ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল। ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল নয় এমন গুণ নেই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বরকে যে মায়াবী বলা হয়েছে, একথা রামানুজ অস্বীকার করেন না। তবে তিনি বলেন, ঈশ্বর যে শক্তির সাহায্যে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন তা যাদুকরের যাদুশক্তির মতো আমাদের বুদ্ধির অতীত বলে এই শক্তির অধিকারী—ঈশ্বরকে মায়াবী বলা হয়। মায়া ঈশ্বরের বিচিত্রার্থ সৃষ্টিকারী শক্তি। ঈশ্বরের জগৎ—সৃষ্টি যেমন সত্য, তাঁর সৃষ্টিশক্তি বা মায়াও তেমন সত্য।

রামানুজ শঙ্করের অর্থে জগৎকে কখনোই মায়া বা ভ্রান্তি বলেন না। তাঁর মতে, যথার্থম সর্ব বিজ্ঞানম (সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ); তথাকথিত ভ্রান্তির বিষয়ও অযথার্থ নয়। আমরা যখন ভুল করে অন্ধকারে দড়িকে সাপ প্রত্যক্ষ করি, তখনও সাপকে কোনো অযথার্থ বস্তু বলা যায় না। তেজঃ অপ ও ক্ষিতি এই ত্রিভূত দিয়ে যেমন দড়ির সৃষ্টি তেমনি সাপেরও সৃষ্টি। যখন আমরা দড়িকে সাপ বলে জানি, তখন সাপের উপাদান ত্রিভূতই দড়িতে প্রত্যক্ষ করি।

তবে সেখানে সাপের উপাদান প্রাধান্য লাভ করে। জগতের প্রত্যেক জিনিসই ত্রিভূতের সৃষ্টি বলে একটি জিনিসের জায়গায় অন্য আর—একটি জিনিস প্রত্যক্ষ করা খুব অযথার্থ কিছু নয়। রামানুজের এই মতবাদ সংখ্যাতি নামে পরিচিত। আমরা এ মত পূর্বেই আলোচনা করেছি। পাশ্চাত্য দর্শনে বুদিন প্রমুখ দার্শনিকেরা অনুরূপ মতবাদের প্রচারক। তাঁরা বলেন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে একটি বস্তুর উপাদান কোয়ান্টাম অন্য সমস্ত বস্তুতেই থাকে, সুতরাং একটি জিনিসকে আর—একটি জিনিস বলে জানলে উপাদানের দিক থেকে খুব অযথার্থ কিছু হয় না।

আমরা আগেই বলেছি, রামানুজের মতে মায়া ঈশ্বরের বিচিত্র বস্তু—সৃষ্টি করার শক্তি। শঙ্করের মতো তিনি মায়াকে কখনোই অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলেন না। শুধু তাই নয়, রামানুজ শঙ্কর স্বীকৃত অবিদ্যার বিরুদ্ধে সাতটি অনুপপত্তি বা অভিযোগ উপস্থিত করেছেন। এবং, আমরা অতি সংক্ষেপে এই সমস্ত অনুপপত্তি এবং এদের বিরুদ্ধে শঙ্করপন্থীদের উপর আলোচনা করব।

১। **আত্রয়ানুপপত্তি** : রামানুজ বলেন, শঙ্কর স্বীকৃত অবিদ্যার কোনো আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ বলে তার মধ্যে অজ্ঞান থাকতে পারে না, আবার জীব অজ্ঞানের কার্য বলে অজ্ঞান তাতেও থাকতে পারে না। আশ্রয়হীন অবস্থায় কোনো কিছুরই থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং অবিদ্যা অসিদ্ধ। শঙ্করপন্থীরা এই অনুপপত্তির উত্তরে বলেন, অজ্ঞানের আশ্রয় ব্রহ্ম এবং জীব দুই—ই হতে পারে। অজ্ঞান বৃত্তিজ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু ব্রহ্ম যে অর্থে জ্ঞানস্বরূপ তার বিরোধী নয়। ঘটের বৃত্তিজ্ঞান ঘট বিষয়ক অজ্ঞান দূর করে। কিন্তু অজ্ঞান সাক্ষীচৈতন্য ভাস্বর, সাক্ষীচৈতন্য অজ্ঞান দূর করে না। সুতরাং অজ্ঞানের আশ্রয় ব্রহ্ম হতে পারে। জীবের পক্ষেও অজ্ঞানের আশ্রয় হতে বাধা নেই। বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, কিন্তু সেইজন্য অঙ্কুর কি বীজের আশ্রয় নয়? তেমনি জীব অজ্ঞান জন্য হলেও অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে।

২। **তিরোধানানুপপত্তি** : শঙ্করপন্থীদের মতে অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করে। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম তো স্বয়ং প্রকাশ। তিনি যদি আবৃত হন, তবে তার স্বয়ং প্রকাশত্ব বা স্বরূপই তো নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম তিরোহিত হবেন। শঙ্করপন্থীরা এই অনুপপত্তির জবাবে বলেন, সূর্য মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়ে, কিন্তু মেঘের আবরণ সূর্যকে নষ্ট করতে পারে না। তেমনি অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করলেও নষ্ট করে না।

৩। **স্বরূপানুপপত্তি** : শঙ্করপন্থীরা অজ্ঞানকে চিৎ বা জ্ঞানে একটি দোষরূপে উল্লেখ করেছেন। রামানুজ বলেন, এই দোষের স্বরূপ কী তা বোঝা যায় না। এটি জ্ঞান হতে পারে না, কারণ জ্ঞানের মধ্যে আবার একটি জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। এটি জ্ঞাত্য হতে পারে না। কারণ এটি চেতন নয়। আবার এটি জ্ঞানের বিষয়ও হতে পারে না। কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় অদ্বৈতবাদীদের মতে একান্ত বিরুদ্ধ বলে একত্র অবস্থান করে না।

শঙ্করপন্থীরা বলেন, এই দোষ জ্ঞানের বিষয়ই বটে। এই বিষয় একান্ত মিথ্যা বলে পরমার্থত জ্ঞানের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার প্রসঙ্গই উঠতে পারে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্তই তো থাকে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান সাক্ষী—ভাস্বর বলে জ্ঞানের বিষয়।

৪। **অনির্বচনীয়ানুপপত্তি** : শঙ্করপন্থীরা অজ্ঞানকে সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। রামানুজ বলেন, জাগতিক বস্তু হয় সৎ, নয় অসৎ, হবেই হবে। এমন কোনো বিষয়ই নেই, যা সৎও নয়, অসৎও নয়, অনির্বচনীয়। সুতরাং অনির্বচনীয় অজ্ঞান অদ্বৈতবাদীদের এক অসম্ভব কল্পনা।

শঙ্করপন্থীরা বলেন, অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। অনির্বচনীয় বস্তুর অস্তিত্ব আমরা ভ্রান্তজ্ঞানের ক্ষেত্রে হামেশাই দেখতে পাই। অন্ধকারে দড়িকে যখন সাপ হিসাবে দেখি তখন সাপের প্রকৃতি কী? নিশ্চয়ই অসৎ নয়। বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ জিনিস তো কখনোই প্রতিভাত হয় না। অথচ সাপ যে প্রতিভাত হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এই সাপ অসৎ নয়, কিন্তু তা বলে সৎও নয়। যা সৎ তা কখনোই এমন হতে পারে না। অথচ আলো নিয়ে এলে দড়িকে অন্ধকারে যে সাপ দেখি তা আর থাকে না। সুতরাং অন্ধকারে দড়িকে প্রতিভাত সাপ অবশ্যই সৎও নয়, অসৎও নয়, একে অনির্বচনীয় ছাড়া আর কী বলা যাবে?

৫। **প্রমাণানুপপত্তি** : অদ্বৈতবাদীরা অজ্ঞানের ভাবস্বরূপত্ব সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রমাণের উল্লেখ করেছেন। রামানুজ বলেন, এ সমস্ত প্রমাণ অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধন করে না। আমরা এখানে একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়েই আলোচনা করব। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভবের ক্ষেত্রে অজ্ঞান বিষয়ে অনুভব হয়। অজ্ঞান যদি জ্ঞানাভাব হয়, তবে অনুভবরূপ জ্ঞান এবং জ্ঞানাভাবের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে বলতে হবে। কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব বিরুদ্ধ বলে একসঙ্গে থাকতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব না বলে ভাবরূপ বলতে হবে।

রামানুজ বলেন, অজ্ঞানকে ভাবরূপ বললেও অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় না। অদ্বৈতবাদীরা অজ্ঞানকে ভাবরূপ বললেও নিশ্চয়ই জ্ঞানবিরোধী বলবেন এবং তা বললে জ্ঞান ও অজ্ঞান একসঙ্গে থাকতে পারবে না। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান বৃত্তিজ্ঞানের বিরোধী হলেও সাক্ষীচৈতন্যের বিরোধী নয়। বস্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রূপে সাক্ষীচৈতন্যেরই বিষয় হয়ে থাকে। অজ্ঞান সাক্ষীচৈতন্যের বিষয়রূপেই প্রকাশিত হয়।

৬। **নিবর্তকানুপপত্তি** : শঙ্কর বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান থেকেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। রামানুজ উপনিষদ এবং গীতা থেকে বিভিন্ন বচন উদ্ধার করে বলেন, সগুণব্রহ্মের উপাসনাত্মক জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক বা মুক্তির নিদান হতে পারে না। শঙ্করপন্থীরা এই অনুপপত্তির বিরুদ্ধে বলেন, উপনিষদে এবং গীতায় সগুণ ব্রহ্মের কথা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই এদের প্রধান তাৎপর্য। সাধক সহজে নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি করতে পারেন না। সেইজন্য সগুণ ব্রহ্মের কথা বলে তাঁকে উচ্চস্তরের জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। অনেক অদ্বৈতবাদীর মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের অনুগ্রহেই সাধকের অদ্বৈত বাসনা জন্মে। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য সগুণ ব্রহ্মের আলোচনা ও আরাধনা নিষ্প্রয়োজন নয়।

৭। **নিবর্ত্যা**নুপপত্তি : রামানুজ বলেন, অজ্ঞানের নিবর্তক অদ্বৈত দর্শন যথাযথভাবে নির্দেশ করতে পারেনি বলে অজ্ঞান নিবৃত্তি অসম্ভব। শঙ্করপন্থীরা এর জবাবে বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানই তো অজ্ঞানের যথার্থ নিবর্তক। সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে না, এ প্রসঙ্গ অবান্তর।

৪। রামানুজ দর্শনে জীব, বন্ধন ও মুক্তির ধারণা

রামানুজের মতে জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা। তার দেহ ও আত্মা উভয়ই সত্য। দেহ ব্রহ্মের অচিৎ অংশের পরিণাম। বলাবাহুল্য, এই দেহ সসীম। আত্মা নিত্য, সৃষ্ট নয়। আত্মাও ব্রহ্মেরই অংশ। দেহ যেমন ব্রহ্মের অচিৎ অংশজাত, আত্মা তেমনি ব্রহ্মের চিৎ অংশ। সুতরাং আত্মা অসীম নয়। উপনিষদে বলা হয় আত্মার সর্বব্যাপিতা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না, আত্মা সর্বব্যাপী বলতে আত্মা এমনই সূক্ষ্ম যে, এটি যেকোনো অচেতন পদার্থে প্রবেশক্ষম, বুঝতে হবে। রামানুজের মতে, আত্মা অণুপরিমাণ। চৈতন্য আত্মার কোনো আকস্মিক ও আগন্তুক গুণ নয়। নৈয়ায়িকেরা আত্মার চৈতন্যগুণ যে দেহসংযুক্তির উপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। অদ্বৈতবাদীরা চৈতন্যকে আত্মার স্বরূপ বলেছেন একথা প্রমাণ হয়নি। জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় অযুক্ত। শুধু চৈতন্য বলে কিছু থাকতে পারে না। চৈতন্য সবসময়ই কোনো না কোনো লোকের কোনো না কোনো বিষয়ে চৈতন্য। আসলে চৈতন্য আত্মার নিত্যগুণ, সর্বাবস্থাতেই আত্মায় চৈতন্যের অবস্থান। রামানুজের মতে, চৈতন্য ধর্মভূতজ্ঞান। সুষুপ্তিতে এমনকি মুক্ত অবস্থাতেও আত্মা 'অহম' রূপে প্রতিভাত হয়। রামানুজের মতে আত্মা এবং অহম সমার্থক।

রামানুজ বলেন, উপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মার যে অভেদের কথা বলা হয়েছে, তা একান্ত অভেদ নয়, বিশিষ্ট অভেদ। সসীম জীবাত্মা কি অসীম পরমাত্মার সঙ্গে একান্ত অভিন্ন হতে পারে? জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্মের চিৎ অংশ। অংশ ও অংশী কখনোই এক হতে পারে না। তবে অংশের যেমন অংশী থাকে, গুণের যেমন দ্রব্য থাকে, দেহের যেমন আত্মা থেকে অপৃথকসিদ্ধি থাকতে পারে না, তেমনি জীবাত্মার পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে অপৃথকসিদ্ধি সম্ভব নয়। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অভেদের কথা বলার কোনো মানে হয় না। আবার দুটি সম্পূর্ণ অভিন্ন জিনিসের অভেদের কথা বলারও কোনো প্রয়োজন হয় না। একই জিনিসের দুটি ভিন্ন রূপের অভেদের কথাই সঙ্গতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। 'এই সেই দেবদত্ত'—এই বাক্যে একই দেবদত্তের বিভিন্ন সময়ে আবির্ভাব যে একই ব্যক্তির আবির্ভাব একথাই বোঝানো হয়েছে। উপনিষদের বাক্য 'তত্ত্বমসি' (সেই ব্রহ্মই তুমি) এইভাবে বুঝতে হবে। 'তৎ' বলতে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্ম এবং 'ত্বম' বলতে অচিৎ বিশিষ্ট জীব শরীরক ব্রহ্ম বোঝায়। সুতরাং তৎ ও ত্বম্—এর অভেদ আসলে কতকগুলি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং অন্য কতকগুলি গুণবিশিষ্ট দ্রব্যেরই অভেদ। অর্থাৎ বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট একই দ্রব্যের অভেদ বা বিশিষ্ট দ্রব্য বোঝায়।

রামানুজ দর্শন এইজন্যেই বিশিষ্টাদ্বৈত বা বিশিষ্টের অদ্বৈত বা অভেদ নামে পরিচিত। জীব ব্রহ্মের অংশরূপে বা শরীররূপে ব্রহ্মের সঙ্গে অপৃথকসিদ্ধি সম্বন্ধে আবদ্ধ। রামানুজ বলেন, তৎ ও ত্বম্ পদের পূর্বে আলোচিত অর্থ গ্রহণ করলে শঙ্করের মত লক্ষ না করার আবশ্যক হয় না। শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করেই তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। যেখানে মুখ্যার্থেই কাজ চলে সেখানে লক্ষণা কাজ অনাবশ্যক। তিনি আরও বলেন, 'তত্ত্বমসি' বাক্যের এরকম ব্যাখ্যা করলে (অর্থাৎ তৎ বলতে শরীর এবং ত্বম্ বলতে শরীর বোঝালে) নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য রক্ষা হয়। অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা' (তৈঃ আরণ্যক, প্রঃ ৩, অনুঃ ১১, পং ২১)। সর্বজীবের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁদের শাসন করে থাকেন; 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা, অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবী—মন্তরো যময়তি, সতে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ (বৃঃ উঃ ৩/৭/৩), পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করে তাকে সংযত করেন, তিনিই তোমায় অন্তর্যামী অমৃতরূপী আত্মা; 'যঃ আত্মনি তিষ্ঠন আত্মনোহস্তরঃ যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো, যময়াতি, সতে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। (বৃঃ উঃ মাঠ্যন্দিনী শাখা ৫/৭/২২)। যিনি আত্মাকে ভিতরে উপবৃষ্ট হয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই অমৃত অমৃত অন্তরযামী তোমার আত্মা। রামানুজ আরো বলেন, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৬/৩/২), 'অনেন জীবেনাত্মানানুপ্রবিশ্য নামঃরূপ ব্যাকরবানি প্রতিপাদন করেছে যে জীবের মধ্যে পরমাত্মারূপে ব্রহ্মের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত ভূতবর্গের বাস্তবসিদ্ধি এবং এই প্রবেশের দ্বারাই নাম ও রূপের ব্যবহার সিদ্ধ হয়। তিনি এমনও বলেছেন যে, 'সৎ চ তৎ চ অভবৎ' এই বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, ব্রহ্মই সমগ্র চিৎ ও অচিৎ বস্তুর আত্মা এবং চিৎ—অচিৎময় সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এই শরীরাত্মরূপ সম্বন্ধের জন্যই ওই সমস্ত বস্তুরই তাদাত্ম্য নির্দেশ করা হয়। রামানুজের সিদ্ধান্ত এই যে, স্বয়ং শ্রুতি বাহুমুখে ব্রহ্মকে শরীরী এবং চিদচিদ্বিশিষ্ট জগৎকে তাঁর শরীর বলে উপদেশ করেছেন।

রামানুজের মতে কর্মের জন্যই আত্মার দেহ—বন্ধন। কর্মানুসারে আত্মা বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। আত্মা দেহযুক্ত হলেই তার চৈতন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং দেহের দ্বারা সীমিত হয়। একটি ক্ষুদ্র দীপ যেমন সমগ্র ঘরকেই আলোকিত করে, তেমনি আত্মা অণুপরিমাণ হলেও দেহের সমস্ত অংশকে চেতন করে তোলে। তখন আত্মা নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। আত্মা ও অনাত্মার এই একীকরণের নাম অহংকার। শরীরে অহং বৃদ্ধি অজ্ঞানতার জন্যই হয়ে থাকে। রামানুজ কখনো সকাম কর্মকেই অজ্ঞান বলেছেন। বন্ধন থেকে মুক্তি কর্ম এবং জ্ঞানের ফল। বর্ণাশ্রম অনুসারে বেদ বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্ত যাগযজ্ঞ কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন তা উদযাপন করাই রামানুজের মতে কর্ম। সমস্ত ফলবাসনা পরিত্যাগ করে এই সমস্ত কর্ম করাই প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। নিষ্কামভাবে কর্তব্য করলে জ্ঞানলাভের পথে অন্ধকার অতীত কর্মের সঞ্চিত ফল নষ্ট হয়। যথাযথভাবে যাগযজ্ঞ উদযাপনের জন্য মীমাংসা দর্শন আলোচনা করা দরকার। সেইজন্য রামানুজ মীমাংসা দর্শন পাঠ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পক্ষে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন। মীমাংসা দর্শন পাঠ করে যাগযজ্ঞ করার পর এরা মুক্তি দিতে পারে না, এ বোধ জাগ্রত হয়। তখন মুমূক্ষু বেদান্ত পাঠ করেন। বেদান্ত পাঠ করে তিনি জানতে পারেন, ব্রহ্ম এই বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষক এবং সংহারক। তাঁর নিজের আত্মা এবং দেহ অগ্নি নয়। আত্মা অন্তর্যামী, নিয়ামক ঈশ্বরের অংশ বিশেষ। তিনি আরো বোঝেন, শুধু বেদান্তপাঠ থেকে মুক্তি হয় না। ঈশ্বরের কৃপা হলেই মুক্তিলাভ সম্ভব।

জ্ঞান থেকেই যে মুক্তি হয়, উপনিষদ একথা ঠিকই বলেছেন। তবে এই জ্ঞান শাস্ত্রের আক্ষরিক জ্ঞান নয়। যদি তাই হত, তবে যেকোনো লোক বেদান্ত পাঠ করলেই তো মুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু তা কখনোই সম্ভব নয়। সেইজন্যেই রামানুজ বলেন, মুক্তিলাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, স্মৃতি, ধ্যান, উপাসনা বা ভক্তি বোঝায়। পরম প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের নিত্য ধ্যান অভ্যাস করা মুক্তিলাভের সহায়ক। ঈশ্বরের নিত্য ধ্যান বা ভক্তি অভ্যাসের ফলেই ঈশ্বর দর্শন বা সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকার দেহধারণের জন্য সমস্ত কর্ম এবং অজ্ঞান বিনষ্ট করে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করেন, তিনি চিরকালের জন্য দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং তার পুর্নজন্ম হয় না। এই তো মুক্তি। অবশ্য এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শুধু মানবিক

চেষ্টায় মুক্তিলাভ সম্ভব নয়; ঈশ্বরের কৃপা না হলে কিছুই হবে না। ঈশ্বরের নিত্য ধ্যান এবং উপাসনা করলে ঈশ্বর জীবের প্রতি তুষ্ট হয়ে তাঁকে সম্যকজ্ঞান প্রদান করেন। ঈশ্বরের এই কৃপা মিললেই মুক্তি মেলে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন, ঈশ্বর তাঁকে কৃপা করে দুঃখবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। রামানুজ—দর্শনে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকে আর্ত—প্রপত্তি বলে। রামানুজ জীবমুক্তিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, দেহ মানেই বন্ধন। সুতরাং দেহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। মুক্তি মানেই বিদেহ মুক্তি। রামানুজ বলেন, মুক্ত আত্মা কখনোই ঈশ্বর হয়ে যেতে পারে না। অংশ কি কখনও অংশী হতে পারে? মুক্ত আত্মা সমস্ত দোষমুক্ত চৈতন্যের অধিকারী হন বলে এই দিক থেকে ব্রহ্ম—প্রকার বা ব্রহ্মসদৃশ হয়ে যান। উপনিষদে 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মেব ভবতি' বলতে এই ব্রহ্ম প্রকারতা লাভই বোঝায়।

মন্তব্য

যুক্তির দিক থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ ব্যাপারে রামানুজ দর্শনে কিছু কিছু অসঙ্গতি থাকলেও আর্তপ্রপত্তিতে মুক্তির কথা বলে রামানুজ সাধারণ লোকের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হয়েছেন। বিশ্বের অন্তর্যামী নিয়ন্ত্রক সমস্ত সগুণের আধার ঈশ্বরের কামনা; তাঁর প্রেমরূপ ও কৃপাকণা বিতরণ, মুক্তিতে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন না হয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গলাভ প্রভৃতি রামানুজ মত জনসাধারণের খুবই প্রিয়। সাধারণ লোক যুক্তির চেয়ে ভক্তিতেই মজে বেশি। এই জন্যেই রামানুজের ভক্তিবাদ বা বৈষ্ণবদর্শন তাদের এত আদরের ধন।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মুখ্যত যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান—প্রধান দর্শন। রামানুজের বিশিষ্টদ্বৈতবাদ মুখ্যত হৃদয়ভিত্তিক ভক্তিমূলক ধর্ম। শঙ্করের আবেদন মুখ্যত মানুষের বুদ্ধির দরবারে, রামানুজের আবেদন হৃদয়ের দ্বারে। অসাধারণদের প্রিয় শঙ্কর, রামানুজ প্রিয় সাধারণের। দুয়েরই দরকার আছে। কারণ, সমাজ সাধারণ ও অসাধারণ সকলেরই।

সাধারণ ও অসাধারণ সকলেই এই সমাজের এই সম্পদ। যুক্তি এবং ভক্তি উভয়ই সমাজের উন্নতির পথে পাথেয় হয়ে থাকে।